ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা

এস. এম. মুশরিফ
সাবেক আই. জি. পুলিশ, মহারাষ্ট্র

লেখক পরিচিতি

এস. এম. মুশরিফ মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ।তিনি 'আব্দুল করিম তেলগি'-র জাল ষ্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারী উদঘাটন করে খ্যাতি লাভ করেছেন। মুশরিফ ১৯৭৫ সালে মহারাষ্ট্র পুলিশের কারা ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। পুলিশ বিভাগে যুক্ত হন ১৯৮১ সালে। তিনি ৩টি জেলার এসএসপি, ডিসিপি মুম্বাই শহর, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পুনে, কমিশনার মুম্বাই রেলওয়ে, আইজি নাগপুর বিভাগে কাজ করেছেন। এছাড়াও রাজ্য সিআইডি এবং দুর্নীতি বিরোধী সংস্থায় কাজ করেছেন। বিভিন্ন পদে থাকার সময় তিনি অনেক সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। একজন নিরপেক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মুশরিফ। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৪ সালে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক লাভ করেছেন। ২০০৫ সালের অক্টোবরে স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার পর থেকে দুর্নীতি দমন, তথ্য অধিকার আন্দোলন সহ নানা সামাজিক কাজে যুক্ত হয়েছেন। সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জাতিবিরোধী কার্যকলাপ উন্মোচনে কলম ধরেছেন।

ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা

মূল

এস এম মুশরিফ

সাবেক আইজিপি, মহারাষ্ট্র পুলিশ

রূপান্তর

অনির্বাণ

সম্পাদনা

আহমদ মুসা

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

facebook.com/projonmopublication

www.projonmo.pub

ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা

প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২১

প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Bharote Sontrasbader Asol Cehara, Transformed by S M Mushrif, Edited by Ahmod Musa
Published by Projonmo Publication

ISBN 978-984-94393-6-3

উৎসর্গ

দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসবাদের শিকার এবং
সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে যারা কর্মরত

সূচিপত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার জীবনের একটা দীর্ঘ সময় পুলিশে চাকরি আর বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের অভিজ্ঞতা থেকেই মূলত এই বইটি লেখা। বইটি আমার অনেক গবেষণার ফসল! বিগত কয়েক বছরে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যা যা ছাপা হয়েছে, এই বই মূলত তার ওপর ভিত্তি করেই লেখা। বইয়ের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, পুলিশের চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর বছরের পর বছর একটা প্রশ্ন আমাকে ভাবিয়েছে। আর সেটা হলো ভারতের এই সাম্প্রদায়িকতা। এ নিয়ে অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। আর দ্বিতীয়ত, জাতীয়তা বিরোধী শক্তির সন্ত্রাসী চক্রান্তের আসল মুখোশ খুলে দিতে, প্রয়াত হেমন্ত কারকারে যে শক্তিশালী কাজগুলো করে গিয়েছেন, তা ইতিহাসে নথিবদ্ধ করে যাওয়া!

ভারতের অন্যান্য জায়গায় যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আমি একটা উজ্জ্বল অসাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছি। এ ব্যাপারটাও আমাকে এই বইটি লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমি বড় হয়েছি মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর জেলায় কাগল এলাকায়। গ্রাম্য পরিবেশে কিছুটা শহুরে ভাব ছিল সেখানে! কাছেই ছিল জাতীয় সড়ক আর জেলা প্রশাসনের বেশিরভাগ অফিস।

১৯৬০ ও ১৯৭০ সালের কথা। সেসময় আমি ছাত্র ছিলাম। দেশজুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হচ্ছিল। মহারাষ্ট্রসহ মধ্য ও উত্তরের রাজ্যগুলোতে এই কাজগুলো বেশি হতো। কিন্তু কোলহাপুর জেলা ছিল অন্যরকম। বেশিরভাগ জায়গা-ই যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জ্বলছে, কোলহাপুর তখনও শান্তি আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মরুদ্যান। এজন্য কোলহাপুর স্টেটের মহারাজা ছত্রপতি শাহুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তার দূরদৃষ্টি আর সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে প্রগতিশীল ভাবনাই কোলহাপুরকে আলাদা করে তুলেছিল। তিনিই ভারতের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যিনি ১৯০২ সালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ৫০ শতাংশ সরকারি পদ বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন এবং এজন্য তিনি কোনও জাতপাত বা ধর্মকে টেনে আনেননি। সে কারণেই জেলার পরিবেশে এতটাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি ছিল, যে আমার প্রজন্মের কাউকেই সেখানে দাঙ্গার আঁচ গায়ে লাগাতে হয়নি।

আমি সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে পুলিশের চাকরিতে যোগ দেই ১৯৭৬ সালে। ১৯৮১ সালে যোগ দেই আইপিএস-এ। ২০০৫ সালে যখন আমি আইজিপি রেঞ্জে ছিলাম, তখন স্বেচ্ছায় অবসর নেই। তারপরই শুরু করি বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম। এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি বেশিরভাগ সময়ে সরাসরি প্রশাসনিক স্তর থেকে আসা কাজগুলোই পেয়েছি। আমাকে সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীল ও অতিসংবেদনশীল জেলা ও শহরেই যেহেতু বেশিরভাগ সময় কাজ করতে হয়েছে, তাই আমি জানি সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলো ঠিক কোথায়। যেহেতু আমি কোলহাপুরের মতো প্রগতিশীল এলাকা থেকে এসেছি, তাই আমাকে যখন সাম্প্রদায়িকভাবে বিষাক্ত জায়গাগুলোতে ট্রান্সফার করা হতো, তখন আমি শুরুতে বেশ ঘাবড়ে যেতাম। আর সেসকল জায়গায় যেভাবে সমাজের একটা শ্রেণি, সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মিথ্যা বলে দাঙ্গায় প্ররোচিত করত, তাতে আমি রীতিমতো ভয়ে ভয়ে থাকতাম। পরে অবশ্য পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। পেশাদারিত্বের সাথেই তার মোকাবেলা করতে শিখে গিয়েছিলাম। সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীল এলাকায় মুসলিম পুলিশ অফিসার হিসেবে কাজ করা খুব কঠিন ছিল আমার জন্য, কিন্তু আমি বরাবরই আমার কাজে সফল হয়েছি। আমি খুব ভালো করেই জানতাম কীভাবে পরিস্থিতি হাতের মুঠোয় আনতে হয়, এবং আমি সেটাই করতাম। সেই অভিজ্ঞতাগুলোই আমাকে এই বিষয়ে গবেষণা করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

আমার কর্ম জীবনে পুলিশ অফিসার হিসেবে আমি একটু অন্যভাবে চিন্তা করতাম। সাম্প্রদায়িক অশান্তি থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটত, তা আমি আইনের মধ্যে থেকে তো তদন্ত করতামই, এছাড়াও দাঙ্গাবাজদের মানসিকতার প্রেক্ষিতেও চিন্তাভাবনা করতাম। মধ্যযুগীয় ইতিহাস বা সমাজতত্ত্বের দিক থেকেও আমি এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি।

আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে এই যে ঘন ঘন দাঙ্গা হয়, এগুলো যে কোন নির্দিষ্ট ভুল বুঝাবুঝি থেকে হয়, এমনটা কিন্তু নয়। আবার হঠাৎ করেই আচমকা কোন ঘটনা ঘটে গিয়ে হাতাহাতি হলো, তাও নয়।

আসলে সমাজে সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাষ্প ছড়ায়, হিন্দু সংগঠনের ছদ্মবেশে থাকা কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের সুপরিকল্পিত ও টানা উস্কানি! মধ্যযুগীয় ইতিহাসের সঙ্গে আমি এর সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। কিন্তু আমি যখন সাম্প্রদায়িক হিংসার ইতিহাস দেখলাম, বিশেষত বিংশ শতাব্দীর হিংসার যে সব ঘটনা, সেই জায়গা থেকে আমি দেখলাম ১৮৯৩ সাল থেকে এই সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা শুরু হয়েছে। গোটা বিশ শতক ধরে তা [illegible] বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা ২০০২ সালের

গুজরাটের ঘটনা। আমরা খুব পরিষ্কারভাবেই বলতে পারি এই ঘটনাগুলোই ছিল সাম্প্রদায়িক হিংসার প্রতিফলনের প্রথমপর্ব।

একুশ শতকের শুরুতে দেশজুড়ে পরপর বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। আইবি-র কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঠিকমতো না জেনে সে সব ঘটনা ফলাও করে প্রচার করতে থাকে গণমাধ্যমগুলো। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই আইবি অনাহূতের মতো ঘটনার তদন্ত শুরু করে দেয়। একই পাশে গোল দেওয়ার মতো ২০০৬—এর নান্দের বোমা হামলা, মুম্বাইয়ের তখনকার এটিএস প্রধানের ২০০৮-এর মালেগাঁও বোমা হামলার সৎ ও স্বচ্ছ তদন্ত, প্রয়াত হেমন্ত কারকারের তদন্তে দেশজোড়া সন্ত্রাসী জালের পর্দাফাঁস, মালেগাঁও বোমা হামলার তদন্তে বাধা, ২৬/১১ মুম্বাই হামলায় আইবি ইচ্ছা করেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেমালুম চেপে গিয়েছিল, মুম্বাই হামলাটা হয়েছিল ঠিক সে কারণেই। এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারের কাপুরুষোচিত ও নিষ্ঠুর হত্যা, হেমন্ত কারকারের জায়গায় বিতর্কিত অফিসার কে পি রঘুবংশীকে তড়িঘড়ি করে নিয়োগ করা, মুম্বাই হামলায় সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেন অধ্যায়ের সন্দেহজনক তদন্ত, যা করেছিল আইবি এবং এফবিআই। মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ যেখানে ছিল হাতের পুতুল মাত্র। এরকম নানান ঘটনা চলতেই থাকছিল।

১৮৯৩ সালের প্রথম পূর্বপরিকল্পিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা থেকে শুরু করে ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বাই হামলা। ওপরের বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমার মনে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছিল। এই বইতে আমি সেই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

- মধ্যযুগ থেকে শুরু করে তার পরেও দীর্ঘকাল মুসলমান ও ব্রাহ্মণদের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিল। তা সত্ত্বেও কেনো ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (যারা ব্রাহ্মণদের স্বার্থই মূলত দেখে থাকে) ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম বিদ্বেষী আবহাওয়া তৈরি করে ১৮৯৩ সাল থেকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধাতে শুরু করল?
- আরএসএস নিজের হাজারো শাখা সংগঠনের মাধ্যমে গোটা দেশজুড়ে খোলাখুলি ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী বিষ ঢালতে শুরু করেছিল। কেনো আইবি, আরএসএস-এর মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোর পৈশাচিক সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কাজকর্ম নিয়ে সরকারকে অন্ধকারে রেখেছিল?
- যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গোটা দেশ জুড়েই প্রায় ৬০ বছর ধরে চলছে, তখন আইবি কেনো সরকারকে সঠিক সময়ে ঠিকমতো তথ্য ও সুপরামর্শ দিয়ে এই বিষয়টা নিয়ন্ত্রণে আনালো না?

- একুশ শতকের শুরুতে কেনো তথাকথিত 'ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠী'র জুজু দেখিয়ে ধর্মীয় স্থাপনা ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গাসহ ভিভিআইপি-দের সুরক্ষার নামে আইবি গুজব ছড়াতে শুরু করল?
- বেশ কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন তাদের সদস্যদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছিল। অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক জোগাড় করেছিল। বোমা বানাচ্ছিল, এমনকি বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলাও করছিল। এসকল বিষয়ে সরকারকে কেনো কিছুই বলেনি আইবি?
- "অভিনব ভারত" এর কার্যকলাপ ও তার "হিন্দু রাষ্ট্র" স্থাপনের যে পরিকল্পনা, সেই সম্পর্কে কেন সরকারকে অন্ধকারে রেখেছে আইবি।
- আইবির মূল দায়িত্ব গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা। তা সত্ত্বেও কেনো তারা প্রায় প্রত্যেকটা বোমা হামলা ও জঙ্গি হামলার তদন্তে জবরদস্তি করে নিজেরা নাক গলাতে শুরু করেছিল?
- মুম্বাই হামলা নিয়ে নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কেনো চেপে গিয়েছিল আইবি? এই তথ্য মুম্বাই পুলিশ আর পশ্চিম নৌ কমান্ডের জন্য খুব জরুরি ছিল। তাদের কাছে কেনো এগুলো গোপন করল আইবি?
- মুম্বাই হামলার পাঁচ দিন আগে ৩৫টি মোবাইল নম্বর হাতে এসেছিল। সেই মোবাইলগুলো সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। সব কিছু জানার পরেও সেসব নম্বরগুলোর ওপর কেনো নজরদারি চালায়নি আইবি?
- হেমন্ত কারকারের মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এটিএস প্রধান পদে কে পি রঘুবংশীর মতো বহু বিতর্কিত একজন অফিসারকে কেনো তড়িঘড়ি করে নিয়োগ করা হলো?
- কেনো মুম্বাই হামলার তদন্তের দায়িত্ব শুরু থেকেই অলিখিতভাবে আইবি নিজেদের হাতে নিয়ে নিল? আর আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে এফবিআই-এর মতো বিদেশি সংস্থাকে কেনো নাক গলাতে দেওয়া হলো?

আমার গবেষণা বলছে ওপরের সব ঘটনাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই খেলার আসল কারিগর ব্রাহ্মণদের একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী—ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। রয়েছে কিছু অব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রাধান্য দেওয়া আইবি এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন এক শ্রেণির গণমাধ্যম। তাদের মূল লক্ষ্যটাই হলো ভারতীয় সমাজের নিয়ন্ত্রণ যাতে পুরোটাই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে নিয়ে নেয়া যায়। প্রথমে তাদের লক্ষ্য ছিল, সাধারণ হিন্দুদের দাঙ্গায় ভিড়িয়ে দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ নেয়া। কিন্তু মুসলিম বিদ্বেষী প্রচার থেকে তারা এতটাই ভালো প্রতিক্রিয়া পেতে

লাগল, যে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত কার জন্য উঠেপড়ে লাগল। এবং এরপরেও তারা রামজন্মভূমির মতো ইস্যু তুলে ধরে তারা একটা সাম্প্রদায়িক হুজুগ বজায় রাখার জোরদার চেষ্টা চালিয়ে গেল। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর শেষ পর্যন্ত তারা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে গেল। স্বাধীনতা পরবর্তী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে বাবরি মসজিদ ধ্বংস একটা চরমসীমা।

ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণের পরে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরও বাড়তে থাকলো। কিন্তু এদের মধ্যে যারা কট্টরপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদী, তারা অব্রাহ্মণ্যবাদীদের ক্ষমতার ভাগ দিতে রাজি ছিল না। তারা বিশ্বাস করত ব্রাহ্মণ্যবাদের যে মূল এজেন্ডা সেটা অব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছিল। এরপর তারা সাংবিধানিক ভাবে গঠিত সরকার ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে, হিন্দুরাষ্ট্রের নামে আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র শুরু করল। মুসলিমদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, আইবি-তে থাকা সমমনস্কদের নিয়ে দেশে ধারাবাহিক বোমা হামলার পরিকল্পনা করল তারা।

তারপর একশ্রেণির গণমাধ্যম হইচই শুরু করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা শুরু করে। এই সব পরিকল্পনাই দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ক্ষমতার পথ সুগম করে দেয়। কিন্তু ভারতের জন্য সৌভাগ্যজনক ও তাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক, মহারাষ্ট্র এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে, ২০০৮ সালে মালেগাঁও বোমা হামলার তদন্ত যেভাবে করেছিলেন, তাতে তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল। তাদের স্বপ্নও অধরা থেকে গেল। কারকারে তদন্তের অর্ধেকটা পথ এগিয়েছিলেন, তারপরেই মুম্বাই হামলার ঘটনা! স্বাভাবিকভাবে সেই তদন্তের বিষয়টি বড় ধাক্কা খেল। রহস্যজনক পরিস্থিতিতে হেমন্ত কারকারে মুম্বাই হামলায় খুন হয়ে গেলেন! মুম্বাই হামলার ঘটনা খুব সহজেই এড়ানো যেত। কিন্তু এ সম্পর্কে যা তথ্য আইবি-র হাতে এসেছিল ইচ্ছাকৃতভাবেই তার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তারা চেপে গিয়েছিল। আইবি-র এই ভয়ঙ্কর মানসিকতা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল, কারকারের মৃত্যুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এটিএস প্রধান হিসেবে সাম্প্রদায়িক, বিতর্কিত অফিসার কে পি রঘুবংশীর নিয়োগ। মুম্বাই হামলার সিএসটি-সিএএমএ রঙ্গভবন লেনের যে অধ্যায়, তাতে মূল সন্দেহভাজন কোনও সন্ত্রাসী নয়, বরং স্বয়ং আইবি। এই রঘুবংশীই তড়িঘড়ি করে ২০০৮ মালেগাঁও বোমা হামলার তদন্ত ভার হাতে নেন এবং দ্রুততার সঙ্গে সেই তদন্ত শেষও করেন।

এই বইতে আমি উল্লেখিত ঘটনাগুলো সময়ানুসারে ব্যাখ্যা করেছি। গণমাধ্যমের রিপোর্ট আর অন্যান্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমি আমার একটা যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার টেনেছি। আমার যা অনুমান, তা হলো–প্রত্যেকটা বোমা হামলার পর যেভাবে শয়ে শয়ে মুসলিম যুবকরা গ্রেফতার হন, এত গ্রেফতারের

পরেও বোমা হামলার ঘটনা থামে না। কিন্তু ২০০৮ মালেগাঁও বোমা হামলার পর যখন আসল সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হলো তখন বোমা হামলার ঘটনা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল।

আমি জানি না সাধারণ মানুষ আমার এই বইকে কীভাবে নেবেন, বিশেষ করে মুম্বাই হামলা সংক্রান্ত যে অধ্যায় সেটা! কারণ ঘটনার পর নয় মাসেরও বেশি সময় ধরে ভুল আর বানানো মিথ্যা তথ্য সাধারণ মানুষের সামনে প্রচার করা হচ্ছিল। বিশেষ করে আইবি আর মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ, সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের অধ্যায়টি গণমাধ্যমকে দিয়ে যেভাবে সাজিয়েছিল। আমি নিশ্চিত, যদি আপনি এই বই একটু ভালো করে খুঁটিয়ে পড়েন, তাহলে আমার দেওয়া ব্যাখ্যা ও তথ্য, পুলিশের থেকে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য। আমি এটা বলছি না, যে কোনও কিছু খতিয়ে না দেখে অন্ধের মতো আমার এই বইকে বিশ্বাস করতে হবে! তবে এই নতুন কিছু তথ্য-ঘটনা সামনে আনার পর আমার একটাই ইচ্ছে, গোটা বিষয়টি কোনো একটি স্বাধীন সংস্থা বা কোনো উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করে তদন্ত করানো হোক। একই দাবি তুলেছেন অন্যরাও। এদের মধ্যে রয়েছেন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদভানিও। ৭ নম্বর অধ্যায়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিষয়ে যদি বলি, তাহলে তারা তিন ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। মানে যেভাবে তারা কাজ করে থাকে আর কী—হতে পারে তারা এই ব্যাপারগুলোকে পাত্তাই দিবে না, (কিন্তু বিষয়টা বেশ সংবেদনশীল হওয়ার কারণে পাত্তা না দেওয়ার বিষয়টি খুব একটা সম্ভব নয়) অথবা এই বইটি থেকেই তারা অপ্রাসঙ্গিক আবেগপূর্ণ কোনো বিষয় তুলে এনে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবে কিংবা সাধারণ হিন্দুদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নামতে উস্কানি দেবে আর যথারীতি তারা নিজেরা পর্দার আড়ালেই থেকে যাবে। ঠিক একই কাজ তারা ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরের বই, "দ্য রিডলস অব হিন্দুজম" এর ক্ষেত্রেও করেছিল! আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, বইটা পুরোপুরি না পড়ে কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া জানাবেন না। কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী প্ররোচনায় পা দেবেন না। না হলে যে উদ্দেশ্যে আমার এই বই লেখা, সেটাই বৃথা হয়ে যাবে।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

২০০৯ এর অক্টোবরে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তার তিন মাস পরই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। আগের তথ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে এই বইতে যা দাবি করা হয়েছিল, গত কয়েকমাসের ঘটা ঘটনাগুলো পূর্বের দাবিগুলোকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে।

যে ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিতে এই বইটির নির্ভরযোগ্যতা আরও বেশি শক্তিশালী হয়েছে, সেগুলো হলো, ১. গোয়াতে দিওয়ালির সময় বোমা হামলা করে মুসলিমদের ওপর নতুন করে চাপ তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা করা। কারকারে পূর্ববর্তী সময়ে যেমন সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ছিল, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ঠিক তেমনটাই চেয়েছিল। ২. প্রধান কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা নিয়ে প্রহসন শুরু করে মহারাষ্ট্র সরকার। প্রথমেই নিশ্চিত করা হয়, প্রধান কমিটির রিপোর্টের আসল কপি যেন কারও কাছে না থাকে। তারপর রিপোর্টের কিছু সাদামাটা অংশ দিয়ে মনগড়া একটা রিপোর্ট তৈরি করে বিধানসভায় পেশ করা হয়। তারপর দেখা গেল রিপোর্ট থেকে বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য বেমালুম উধাও করে ফেলা হয়েছে। ৩. প্রকাশিত হয় *To The Last Bullet* নামে একটি বই। বইটি লিখেছেন শহিদ পুলিশ কর্মকর্তা অশোক কামতের স্ত্রী ভিনীতা কামত। ২৬/১১-র রাতে কামা হাসপাতাল চত্বরে যা ঘটেছিল, তার জের টেনে তিনি তার স্বামীর সাহসিকতার নিদর্শন দেখিয়েছেন। এছাড়াও বইটিতে তিনি তার স্বামীর সাহসী জীবনের অনেক কথাই তুলে ধরেছেন।

দুই ও তিন নম্বর পয়েন্টে যে ঘটনাগুলোর কথা উল্লেখ করা হলো, সে ঘটনাগুলো আরও বিস্তারিত ভাবে এই বইতেই আমি উল্লেখ করেছি। "এমন কিছু ঘটনা, যা তত্ত্বকে নিশ্চিত করে" শীর্ষক শিরোনামে এই সংস্করণেই ৬ নম্বর অধ্যায়ে তা রয়েছে। ভিনীতা কামতে বেশ কিছু ওয়ারলেস রেকর্ডের উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়াও বইতে আরও বেশ কিছু তথ্য প্রমাণও পেশ করেছিলেন। আমি এ বইতে যা লিখেছি, ভিনীতা কামতের দেওয়া তথ্যের সাথে তা মিলিয়ে দেখলে আমার দেয়া তথ্য আরও শক্তপোক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস। যাই হোক, গোয়াতে বোমা হামলার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যে ব্যর্থ চেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এই বইতে বিস্তারিত তেমন কিছু ছিল না। সে ঘটনা ঠিক কী, তা এখানে উল্লেখ করলাম:

২০০৮ সালে অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দিকে মালেগাঁও বোমা হামলার ঘটনায় ১১ জন ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করার পর দেশে বোমা হামলার ঘটনা একদম থেমে যায়। তখনকার ঘটে যাওয়া ঘটনার যে বিষয়গুলো এ বইতে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো প্রমাণ হয়ে যায়। কী তুলে ধরা হয়েছে? আইবি-তে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিগুলোর সরাসরি সম্মতিতে, বাহ্মণ্যবাদী সংস্থাগুলোই বোমা হামলার জন্য দায়ী। এই বোমা হামলা নিয়ে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম সম্পর্কে একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব দাঁড় করানোর চেষ্টা চালানো হয়। অজানা, অচেনা, মনগড়া একটা "মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের" ওপর দায় চাপানো হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জঘন্য বিষাক্ত পরিকল্পনা থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা চলে খুব জোরেশোরে। তখন যে প্রায় একবছর দেশে একটাও বোমা হামলার ঘটনা ঘটেনি, সে সময়টা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে বেশ দুশ্চিন্তার ছিল। কারণ দিন যত অতিবাহিত হচ্ছিল, সাধারণ মানুষ মোটামুটি ভাবে বুঝে যাচ্ছিল আসলে গত পাঁচ/ছয় বছর ধরে যে বোমা হামলাগুলো হচ্ছিল, তা আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদেরই কারসাজি। খুব ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটানোর জন্য রীতিমতো অস্থির হয়ে যাচ্ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। এমন কিছু একটা ঘটাতে হবে, যা হেমন্ত কারকারের পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে দেশটাকে ঠেলে দিতে পারে।

২৬/১১-র ঘটনা থেকে জনগণের দৃষ্টি সরানোর জন্য ২০০৯ এর ১৬ অক্টোবর দিওয়ালির সময় গোয়ার মারগাঁও-এ বোমা হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন, "সনাতন সংস্থা"। দিওয়ালি উপলক্ষ্যে সেখানে হিন্দুদের বেশ বড়সড় জনসমাগম হয়েছিল। কিন্তু দেশের ভাগ্য ভালো আর তাদের কপাল খারাপ। সেখানে একটি বোমা রাখার সময়েই বিস্ফোরণ ঘটে। সনাতন সংস্থার দুজন কর্মী সেখানে নিহত হয়। পরে দুটি সক্রিয় বোমা সেখান থেকে নিস্ক্রিয় করে পুলিশ। *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, *সকাল,* পুনে ও *পুধারি,* পুনে ১৮ অক্টোবর ২০০৯)। এই ঘটনায় মুসলিমদের ফাঁসানোর জন্য ঘটনাস্থলে উর্দুতে 'খান মার্কেট' লেখা একটি প্লাস্টিক ব্যাগ ফেলে রাখা হয়। আরও রাখা হয় একটি আতরের বোতল। (*দ্য সানডে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ৮ নভেম্বর ২০০৯)। এখানে তাদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুদেরকে এটাই বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল যে, "হিন্দুদের উৎসবে অসংখ্য নিরাপরাধ হিন্দুকে মারবার পরিকল্পনা করেছিল মুসলিমরা।" বিস্ফোরণটা ঠিকঠাক না হওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয়নি। যদি বিস্ফোরণটা ঠিকঠাক হতো, তাহলে তার জের ধরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সারাদেশে শ'খানেক মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করা হতো। তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ওপর চলত নির্যাতনের স্টিম রোলার। আইবি তখন তাদের বিরুদ্ধে ফাইল ভর্তি তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করত, "মুসলিম সন্ত্রাসবাদের"

ভূত জেগে উঠত আবার। ভাগ্য ভালো সেরকমটা হয়নি। এ হামলার তদন্ত করতে গিয়ে 'সনাতন সংস্থা'র পাশাপাশি মালেগাঁও বোমা হামলায় অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট পুরোহিত ও প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের 'অভিনব ভারতে'র যোগসাজশ খুঁজে পেয়েছিল গোয়া পুলিশ। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ২১ ডিসেম্বর ২০০৯)।

দেশে এসকল হামলার পেছনে যে সকল ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীগুলোর হাত রয়েছে, তারাই আবার ব্রাহ্মণ্যবাদী মিডিয়ার সাহায্যে মুসলিমদের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে মুসলিমদের নিয়ে একটা ভুল ধারণা তৈরি করে দেয়। এই বইতে সেটাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। গোয়ার ঘটনা এই বইয়ের বিষয়বস্তুকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

১. হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

সাধারণ হিন্দুদের (বহুজন) ওপর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খবরদারির নতুন ফন্দি

কেউ মানতেও পারেন আবার নাও মানতে পারেন, কিন্তু ভারতের এই সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষের একটা ধারণা হলো, দেশের বেশিরভাগ মুসলিমদের দেশাত্মবোধ মোটেই নেই, তারা পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকে, তথাকথিত 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদী'দের প্রতি সহানুভূতিশীল, আর সেই কারণেই দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রবল দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু জাগরণের সমর্থক। যে জাগরণ মুসলিমদের চরম বিরোধিতা করবে, ইসলামের 'বিপদ' থেকে হিন্দুদের সতর্ক করবে। ভারতীয় মুসলিমদের বিরোধিতায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দালালি করার আরেকটা কারণ হলো, ৭০০ বছরের বেশি সময় ধরে মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসকদের অত্যাচার। অন্তত মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে তেমনটাই তো অভিযোগ ওঠে।

ওপরের যুক্তি-তর্কে কতটা সত্যতা আছে তা নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমাদের জানা দরকার, ব্রাহ্মণ্যবাদী ঠিক কারা। কারাই বা হিন্দু ধর্ম ও দেশের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের ফানুস ওড়ায়। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা হলো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরই একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। আরেক দল আছে, যারা অব্রাহ্মণ কিন্তু তাদের মগজ ধোলাই হয়ে গেছে এই ভাবনাতে, যে ব্রাহ্মণরাই জাতিগত ভাবে শ্রেষ্ঠ, প্রায় দৈব, তারাই ভারতীয় সমাজের অঘোষিত, অবিরাম শাসনকর্তা। এবার লাখ টাকার প্রশ্ন হলো, আদৌ ব্রাহ্মণরা কি মুসলিম বিরোধী? যদি সেটাই হয়ে থাকে, তাহলে এই বিরোধিতার শুরুটা কবে থেকে? ইতিহাস বলে ব্রাহ্মণরা কোনোদিনও মুসলিম বিরোধী ছিল না। কিন্তু ১৮৯৩ সালের পর আচমকাই তারা মুসলিম বিরোধী বনে যায়। সেই বছরটাই ভারতের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসের সূচনাপর্ব। মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পরশপাথরে আসুন, সেই ঘটনার ব্যাখ্যা খোঁজা যাক। এটা ঐতিহাসিক তথ্য, ভারতে ৭০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম শাসকদের শাসন চলেছে। আবার এটাও সত্যি, সেই সময়টাতে ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল নিরঙ্কুশ। অন্তত এখনকার থেকে তো সেই প্রাধান্য ছিল অনেক বেশিই।

বেশিরভাগ হিন্দুরাই ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবিত হতো, চালিত হতো। ব্রাহ্মণরা তাদের যা করতে বলতেন, তারা সেটাই করত। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তো এক বছরের জন্যও দেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল না। সেই জায়গা থেকে তারা কি মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধাচারণ করত? মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরকম একটিও নিদর্শন নেই, যে মুসলিম শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্রাহ্মণরা বিশাল হিন্দু জাগরণ ঘটিয়ে ফেলেছিলেন, কিংবা তলে তলে বড়সড় কোনো আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিলেন। তার চেয়ে বরং এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে, যে মুসলিম শাসকদের শাসন যাতে সহজ হয় সে কারণে ব্রাহ্মণরাই তাদের অনেক সাহায্য করেছিল, প্রশাসনিক কাজকর্মে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। টিপু সুলতানের মূল উপদেষ্টা ও প্রশাসকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ; এমনকি ঔরঙ্গজেবের দরবারে (সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার উদাহরণ হিসেবে বর্তমান ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যার নাম বেশ অসাম্প্রদায়িক ভাবেই নিয়ে থাকে) ৫০ শতাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। বরং এটা বলাই যায় যে ৭০০ বছর ধরে মুসলিমরা ভরতবর্ষের বুকে নিশ্চিন্তে রাজত্ব করতে পেরেছিল শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের সমর্থন নিয়েই। যেখানে আকবর এবং ঔরঙ্গজেব, এই দুজনের শাসনকাল প্রত্যেকের ৫০ বছর ধরে। মধ্যযুগে মুসলিমদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সম্পর্ক ছিল বেশ আন্তরিক। অথচ এই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে প্রাক্তন আরএসএস প্রধান এম এস গোলওয়ালকর, তার বই 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড' বইটিতে দাবি করেছেন, "যখন মুসলমানরা হিন্দুস্তানের মাটিতে প্রথম পা দিল, তখন থেকে এখন পর্যন্ত, সেই সব লুটেরাদের হাত থেকে বাঁচতে লড়াই করে যেতে হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্রকে"। 'হিন্দুরাষ্ট্রে'র মধ্যে থেকে তিনি যদি ব্রাহ্মণদের বাদ না দেন, তাহলে তাহলে তার এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এমনকি পুনেতে ব্রাহ্মণ পেশোয়াদের শাসনকাল থেকে শাসনকালের শেষ ১৮১৮ সাল পর্যন্ত, হিন্দু-মুসলিম ঝামেলার একটিও নিদর্শন নেই। অথচ তখন ৩০ শতাংশেরও বেশি মুসলিম জনসংখ্যা ছিল। পেশোয়াদের সময় যেখানে হিন্দু দলিতদের থুতু ফেলার জন্য নিজেদের গলায় মাটির পাত্র ঝুলিয়ে রাখতে হতো, এবং পেছনে ঝাঁটা ঝুলিয়ে রাখতে হতো যাতে তাদের 'অপবিত্র' পায়ের ছাপ মুছে যায়, সেখানে মুসলিমরা যথেষ্ট সম্মান পেতেন। তার চেয়েও বড় কথা, ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে সাধারণ হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। এবং তারাই কোনো রকমে টিকে থাকা মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে তাদের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে, ১৯ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ছিল বেশ আন্তরিক। সমস্যা শুরু হলো ১৮৯৩ সালে, প্রথমবার যখন দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে থাকল, যা

দেশভাগের কারণ, এবং যা এখনও চলছে। এই ঘটনা কি তাহলে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটানো হয়েছিল?

১৮৯৩ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস বুঝতে গেলে, শেষ কয়েকটা বছরে যা কিছুটা রঙচড়ানো, কিছুটা সত্যিও বটে, আমাদের সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস জানতে হবে। যে আন্দোলন ব্রাহ্মণ আধিপত্যের সমাজ বদলের চেষ্টা চালিয়েছিল। ১৯ শতকের শেষে যে আন্দোলন ছড়িয়েছিল গোটা দেশে, বিশেষত মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশে।

সংস্কারমূলক আন্দোলন থেকে সাধারণ হিন্দুদের মন ঘোরাতে মুসলিমদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ব্রাহ্মণরা স্মরণাতীত কাল থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সমাজের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে আসছে। অতীতে তাদের জায়গা যখনই নড়বড়ে হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখনই তারা হাজারো ফন্দি ফিকির বের করেছে। তা সে ভারতের মুসলিম বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খুন করে কিংবা বের করে দেওয়াই হোক, জাতিভেদ প্রথার আমদানি করেই হোক, নিজেদের লেখা শাস্ত্রে নিজেদেরকেই ঈশ্বরতুল্য জায়গায় নিয়ে যাওয়াই হোক, বর্ণবৈষম্যকে শক্তপোক্ত করতে মনুস্মৃতি রচনা করে সেটাকে দৈব একটা উচ্চতায় তুলে দেওয়া, সমাজে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ছড়ানো, বাইরে থেকে লোক এনে ক্ষত্রিয় রাজাদের দেখনদারি প্রত্যক্ষ করানো কিংবা স্বার্থপরের মতো ভুল আর বিকৃত ইতিহাস তৈরি করেই হোক। পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপক্ষকে হঠিয়ে সমাজে ব্রাহ্মণরা তাদের উচ্চতা বজায় রেখে গেছে।

এই একই কায়দায় তারা মুঘল ও ব্রিটিশ আমলেও কর্তৃত্ব করে গিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, পুনের (মহারাষ্ট্র) জ্যোতি রাও ফুলে, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার পর্দা ফাঁস করে দেন। এই জ্যোতি রাও ফুলে-ই সেই সময়ে প্রথমবার 'মহাত্মা' সম্বোধিত হয়েছিলেন। তিনি সাধারণ হিন্দু, মহিলা ও পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য স্কুল খুললেন। এরা তখনও পর্যন্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। তিনি বই লিখলেন, গান লিখলেন, লিখলেন নাটক। তার মধ্যে দিয়েই সাধারণ হিন্দুদের সচেতন করার চেষ্টা চালালেন। তিনি বোঝালেন কেমন করে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা দিনের পর দিন সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে এসেছে। বোঝালেন, কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, মহিলা ও পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর যন্ত্রণার জন্য, কীভাবে দায়ী এই ব্রাহ্মব্যবাদীরাই। জানালেন, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে কীভাবে সবাইকে বঞ্চিত করেছে। তিনি আরও জানালেন, ওই সব ক্ষেত্রে বাকি জাতিদের পিছিয়ে থাকার বিনিময়ে

কীভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তার এই জানানো-বোঝানো, সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলল।

জ্যোতি রাও ফুলে-র এই আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে কোলহাপুরের (মহারাষ্ট্র) মহারাজা শাহুজী এবং বরোদার (এখন গুজরাট) মহারাজা শয়াজীরাও গায়কোয়াড়, শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের মধ্যেই যে জাগরণ আনলেন তা নয়, জ্যোতি রাও ফুলে-র শিক্ষাকে আদর্শ করে, ব্রাহ্মণবাদীদের বাদ দিয়ে তারা নিজেদের রাজ্যে বেশ কিছু সামাজিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালালেন। ঠিক একই সময়ে সমাজ সংস্কারক রামস্বামী পেরিয়ার, নারায়ণ গুরু তাদের আন্দোলন শুরু করলেন দক্ষিণে। ১৯ শতকের শেষেই এই আন্দোলন হইচই ফেলল মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের কিছু রাজ্যে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেশেও। পরিস্থিতি যেদিকে গেল, তা ব্রাহ্মণবাদীদের কাছে বেশ ভাবনার বিষয় ছিল। তারা ভয় পেল, যদি এই আন্দোলন গোটা দেশে জাঁকিয়ে বসে, এবং সাধারণ মানুষ এটা ভাবতে শুরু করে দেয় যে তাদের দুঃখ দুর্দশার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই দায়ী, তাহলে তো তারা ছেড়ে কথা বলবে না। বিশেষ করে ব্রিটিশরা যদি দেশ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে তো হয়েই গেল, বদলা তারা নেবেই। সে তখনই হোক বা পরে। তাই ব্রাহ্মণবাদী নেতা ও বুদ্ধিজীবিরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করল। সাধারণ মানুষ যাতে তাদের অত্যাচার ভুলে যায়, সেই চেষ্টা চলতে লাগল। পাশাপাশি সমাজে তাদের খবরদারিও জারি রইল। পুনের কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতা একটা দারুণ পরিকল্পনা করে ফেললেন। সেটা হলো, হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ তৈরি করে নিজেদের মধ্যেই লাগিয়ে দাও। সাধারণ হিন্দুরা ওই সব সংস্কারপন্থী আন্দোলন দুদিনে ভুলে যাবে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অবিসংবাদিত ভাবে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করল। প্রথম পরীক্ষাটি হলো ১৮৯৩ সালে মুম্বাইতে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের খেপিয়ে তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হলো। এরপর ব্রাহ্মণ্যদবাদীরা আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। খোলাখুলি ভাবে গণহত্যার প্ররোচনা দিলেন এম এস গোলওয়ালকর, তাই বই 'উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড' বইতে। যেখানে নাৎসি জার্মানির উদাহরণ দিয়ে তিনি তার পরিকল্পনা নির্ধারণ করলেন, "দেশের জাত ও সংস্কৃতির পবিত্রতা বজায় রাখতে জার্মানি, ইহুদি তাড়িয়ে শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। জাতিসত্তার গর্ব কাকে বলে জার্মানি দেখিয়েছিল...হিন্দুস্থান এর থেকে শিক্ষা নিক।" সেই ১৮৯৩ সাল থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের দেশে শুরু হলো ধারাবাহিক ভাবে, যা আজ ও চলছে। এটা আর কিছুই নয়, সামাজিক নীতি নির্ধারণে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষপাতিত্ব ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা

থেকে সাধারণ হিন্দুদের নজর ঘোরাতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। এর আসল লক্ষ্য ছিল সাধারণ হিন্দুরা। মুসলিমরা নেহাত টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যদিও ধারাবাহিকভাবেই মোটামুটি ১৮৯৩ সালের পর থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে শুরু করে দিয়েছিল, তবু তাদের কাজকর্ম খুব একটা গোছানো ও সংগঠিত ছিল না। এই পরিকল্পনা আরেকটু সংগঠিত ভাবে, নিয়মিত ভাবে করার জন্য এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য তৈরি হলো আরএসএস ১৯২৫ সালে। লক্ষ্যে পৌঁছতে আরএসএস দুটি প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দিল, সংবাদমাধ্যম, আর গোয়েন্দা দফতর। যে দুটি জিনিস সাধারণ মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করতে পারে, পাল্টেও দিতে পারে। ১৯৪৭ সালে যখন ভারত স্বাধীন হলো, তখন আরএসএস এই দুটি জিনিসের ওপর বেশ ভালোরকম নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেল। স্বাধীনতার পরে মিডিয়া ও গোয়েন্দা দফতরের ওপর আরএসএস প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেল, আর তার মাধ্যমেই ছড়াতে লাগল সাম্প্রদায়িকতার বিষ। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিল তারা। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরেই তারা নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ফেলল। এখানে শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যম ও গোয়েন্দা দফতরের বিষয় দুটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। জেনে নেওয়া যাক বছরের পর বছর ধরে তারা কীরকম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কীভাবে আরএসএসের মধ্যে থাকা মানুষেরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

২. ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম

সংবাদমাধ্যম ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে বেশ শক্তিশালী অস্ত্র, যেটা তারা বেশ ভালোরকমই ব্যবহার করেছে। শুরুতেই সংবাদমাধ্যমের প্রায় পুরোটা নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে চলে এসেছিল, এবং যেভাবে সেই ক্ষমতা তারা ধরে রেখেছিল, তা বেশ ঈর্ষণীয়। সংবাদমাধ্যমে তারা প্রায় সর্বত্র বিরাজমান ছিল। তবে এটা ঠিকমতো বলা যাবে না যে এরা ঠিক কতটা, কীভাবে, ঠিক কখন সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলোতে জাঁকিয়ে বসেছিল। তারা অনেকটা ইলেকট্রনের মতো, দেখতে পাবেন না, কিন্তু বুঝতে পারবেন, তারা আছে সবখানেই। কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া যদি আমরা কোনো খবরের কাগজ পড়ি, আমরা অনায়াসে বুঝতে পারব কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী আদৃশ্য শক্তিই সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। একই জিনিস এখন সত্য, টিভি চ্যানেলগুলোর ক্ষেত্রেও। এই শক্তিশালী অস্ত্রটি দিয়েই তারা সরকার, নেতা, সরকারি কর্মী, পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করে, তা সে যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না কেনো।

সংবাদমাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই রমরমার কিন্তু বেশ যুক্তিপূর্ণ কারণ আছে। স্মরণাতীত কাল থেকেই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে, স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিকতাও পুরোপুরি তাদের দখলেই ছিল। তবে ভালো দিনগুলোতে কিন্তু সাধারণ মানুষকে ভাবায় এমন সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যুকে সংবাদমাধ্যমেই তুলে ধরেছিল এই ব্রাহ্মণরাই। মানুষের কথা যাতে উঠে আসে, সংবাদমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণরাই তা সবার কাছে পৌঁছে দিত। শাসকদের বিচারহীনতা ও অত্যাচারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তারা আওয়াজ ওঠাতো, ঢাল হিসেবে কাজ করত।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সংবাদমাধ্যমকে নেহাতই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করা শুরু করল। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা থেকে সাধারণ হিন্দুদের নজর ঘোরাতেই মুসলিমদের সাথে তাদের লাগিয়ে দেওয়া হলো—পাশাপাশি প্রচার হতে লাগল ব্রাহ্মণ্যবাদের। এভাবেই তারা দেশের সাধারণ মানুষকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে, ভুল তথ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করে ফেলল।

স্বাধীনতার পর আঞ্চলিক সংবাদপত্রের ওপর একচেটিয়া দখল নিল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তখন থেকেই ভিন জাতের, মতাদর্শের, অন্য সম্প্রদায়ের

সাংবাদিকরা কাজের জগতে এলেন। তবে তারা কিন্তু বেশ সংখ্যালঘু ছিলেন এবং অবশ্যই নিজেদের জাহির করতে পারতেন না। তারা খুব ভালোভাবেই জানতেন, যে গোটা ব্যবস্থাটার মাথায় বসে আছে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা, তাই টিকে থাকার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জুতোতেই পা গলাতে বাধ্য হলেন। যদি কেউ একটু অন্য পথে চলতেন, বা অন্য কথা বলতেন, মূল সংবাদমাধ্যমের জগত থেকেই তাদের কায়দা করে ছেঁটে ফেলা হতো। যাইহোক সংস্কারপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ, সংখ্যালঘু ও সাধারণ মানুষের তখনও কিছুটা সান্তনা ছিল। যদিও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদমাধ্যমের নিয়ন্ত্রক ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই ছিল, তবুও ইংরেজি সংবাদপত্রগুলো কিন্তু তখনও অনেকটাই তাদের বাইরে ছিল। ফলে তারা অনেক বেশি পক্ষপাতমুক্ত ও স্বাধীন ছিল। এই পরিস্থিতি অনেকদিন ধরেই ছিল, কারণ সেই সব সাংবাদপত্রের সম্পাদক তাদের কাগজ প্রকাশ করতেন মেট্রোপলিটন শহরগুলো থেকে। এখনকার ইংরেজি সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের নিয়ন্ত্রণও চলে গেছে ব্রাহ্মণ্যবাদীদেরই হাতে। প্রায় সব সংবাদমাধ্যমেই তাদের দখলদারী থাকার ফলে এখন সাধারণ মানুষ হোক, সরকারের ওপরতলা থেকে নীচের তলা কিংবা ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের পথ পরিষ্কার করতে তাদের চাপ দেয় এমনকি ব্ল্যাকমেইল পর্যন্ত করে থাকে।

৩. ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে আইবি–র যোগসাজশ

আইবি-র ওপর আরএসএস-এর সহজ দখলদারি

আইবি হলো ভারত সরকারের প্রাথমিক গোয়েন্দা বিভাগ। সরকারের চোখ আর কান হলো আইবি। একদম শুরু থেকেই এই সংস্থায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অনুপ্রবেশ চালায়। স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যেই সংস্থার প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে আসে তাদের হাতে। বুদ্ধি ও উদ্যোগ থাকলে সাম্প্রদায়িক শক্তি কীভাবে সরকারি সংস্থাগুলোকে নিজেদের পকেটে পুরে ফেলে, এটা হলো তার আদর্শ উদাহরণ। এই কাজটা তারা কীভাবে করল, সেটা কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার। আইবি-তে মূলত দুই ধরনের অফিসার ও কর্মী রয়েছেন; এদের মধ্যে কয়েকজন স্থায়ী এবং কয়েকজন, বিশেষ করে মাঝামাঝি ও উচ্চপদে, তারা রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন। শুরুতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আইবি-তে ঢুকে সে সংস্থার দখল নিয়েছিল বেশিরভাগ স্থায়ী পদের কর্মচারী হিসেবে। ঠিক সেই সময় আরএসএস-এর মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন তরুণ, চঞ্চল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আইবি-তে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আইপিএস অফিসার হিসেবে নিয়োগ করতে শুরু করল। মারাঠি পত্রিকা *'বহুজন সংঘর্ষ'*-এ (৩০ এপ্রিল ২০০৭) প্রতিবেদন বেরিয়েছিল,

> আইবি-তে আরএসএস অনুগতদের যোগদানের পর, তারা যোগ্য অফিসারদের দিকে নজর দিল। সেই কারণেই আরএসএসপন্থী কিছু আইপিএস অফিসার আইবি-তে গেলেন, এবং সেখানেই ১০-২০ বছর ধরে থেকে গেলেন; কেউ কেউ তো তাদের কর্মজীবনের বাকি সময়টাও সেখানেই থেকে গেলেন। মহারাষ্ট্রের ভিজি বৈদ্য অবসরের পরেও আইবি-তে থেকে যান, পদোন্নতি হয়ে ডিআইবি হন। আর সবথেকে মজার ব্যাপার হলো, তিনি যখন আইবি প্রধান ছিলেন তখন তার ভাই এম জি বৈদ্য মহারাষ্ট্রের আরএসএস প্রধান ছিলেন, বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে আসা আইবি-র অফিসারদের তালিকা যদি একটু ভালো করে খতিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এরা বেশিরভাগই হয় আরএসএসপন্থী, নয়তো কোনো না কোনো ভাবে তাদের সঙ্গে আরএসএস-র যোগ রয়েছে, নয়তো এদের কাছে কোথাও থেকে আরএসএস-এর নির্দেশ আসছে। আরএসএস-এর গুরুভাইদের মাধ্যমেই তারা 'র' ও আইবি-তে কাজ পেয়েছে। এবং কাজ পেয়ে আরএসএস-এর নীতি আদর্শই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। খাতায়

কলমে আরএসএস নয় এমন অফিসারদেরও আইবি-র ডেপুটেশনে পাঠানো হয়। তবে তাদের দিনের পর দিন কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেই ফেলে রাখা হয়।

আরএসএস-এর ভাবনা বয়ে বেড়ায় আইবি

পরোক্ষ ভাবে আইবি-র দখল যখন আরএসএস-এর হাতে চলেই গেল, তখন তাদের শাখা সংগঠনের মতোই কাজ করা শুরু করল আইবি। আরএসএস-র ভাবনা ঘাড়ে করে চলতে থাকল তারা। মিথ্যেকে সত্যি বলে চালানোর নীতির ওপর দাঁড়িয়ে বছর খানেকের মধ্যেই আরএসএস-কে জাতীয়তাবাদী সংগঠন হিসেবে খাড়া করল আইবি। মাহাত্ম্য প্রচার হলো আরএসএস-এর। একইসঙ্গে বামপন্থীদের বহিরাগত আর মুসলিমদের মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী ও জাতীয়তা বিরোধী সম্প্রদায় হিসেবে তুলে ধরা হলো। এজন্য আইবি বেশ কিছু নীতি মেনে চলেছিল—

- আরএসএস এবং তার শাখা সংগঠনগুলোর সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম নিয়ে আইবি সরকারকে আগাগোড়াই অন্ধকারে রেখেছিল। ধীরে ধীরে আরএসএস প্রচুর বিদেশি অনুদান পেতে লাগল, সংবাদপত্র ও টিভি ছাড়াও সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোতে অনুপ্রবেশ ঘটাতে লাগল তারা। সবথেকে উল্লেখযোগ্য, গোটা ভারতে ছড়িয়ে থাকা তাদের হাজার হাজার 'শাখা'র মাধ্যমে দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো শরু হয়ে গেল। অথচ আইবি আরএসএস-কে একটা জাতীয়তাবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবেই দেখিয়েছিল। গত বেশ কিছু বছর ধরে আইবি সরকারকে যে যে রিপোর্ট দিয়েছিল, সেগুলো একটু খাতিয়ে দেখলেই এসব বোঝা যাবে।
- বামপন্থী বা ধর্মনিপেক্ষ দলগুলো, তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম সংগঠনগুলোও যা ছিল, তাদের ক্ষেত্রে আইবি একদম অন্য নীতি নিয়েছিল। ওই দলগুলো সম্পর্কে ভুলভাল তথ্য সরকারের কাছে ফলাও করে দিতে লাগল আইবি। অথচ সেই দলগুলো আরএসএস ও তার শাখা সংগঠনগুলোর মতো অত ক্ষতিকর ছিল না। এর পরের সরকারগুলো, যারা কিনা আইবি-র ওপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল, ওই সব তথ্যেই ভরসা করতে শুরু করল তারা। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী দলগুলোকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে

দিল। একঘরে করে দিল। এমনকি আইন মাফিক কাজকর্মেও চলল বাধা দান।

আইবি আরএসএস-এর থেকেও বেশি ব্রাহ্মণ্যবাদী

তবে কয়েক বছর পর, ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আরএসএস ও তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপিকে বেশ কিছু আপস করে যেতে হলো। বিশেষ করে যেভাবে তরুন প্রজন্ম রাজনীতিতে উঠে আসতে লাগল তাতে এই কাজ কিছুটা থমকে গেল। তবে আইবি-তে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সেই চাপ ছিল না। সঙ্ঘ পরিবারের আসল উদ্দেশ্যের প্রতি তারা অবিচলই থেকে গেল। তারা দিনের পর দিন আরও বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও নিবেদিতপ্রাণ হতে লাগল। সরকারের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে, আমলাতন্ত্রের সম্ভ্রম আদায় করে আইবি আরও বেশি দুঃসাহসিক কাজ করতে উৎসাহ পেয়ে গেল। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যবাদের আসল লড়াকু বনে গেল আইবি। আরএসএস চেতনাকে তারাই বাঁচিয়ে রেখে দিল। আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদী অফিসাররা যদি আদর্শে অবিচল না থাকত, তাহলে হয়তো এতদিনে আরএসএসের উদ্যোগ উধাও হয়ে যেত। সমাজের রাশ হাতে নিতে যে জাল ছড়ানোর দরকার ছিল, সেটাও আর হতো না। আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদী অফিসারদের জন্যই কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে। আরএসএস এবং আইবি-কে যে কোনভাবেই আলাদা করা যায় না, নীচের উদাহরণই তার প্রমাণ: সংসদ হামলার ঘটনায় অধ্যাপক এস এ আর গিলানি হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট, দু জায়গাতেই নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। গিলানি ২২ নভেম্বর ২০০৮ তেহেলকাতে লিখেছিলেন, "গোয়েন্দা সংস্থাকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাদের সামনে বসে আমার কখনই মনে হয়নি, আমি একটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকারি অফিসে রয়েছি। বরং মনে হয়েছিল, এটা আরএসএস-এর সদর দফতর।"

আইবি এবং র-এর মধ্যে কোন তুলনা চলে না

আইবি-র সাথে এক সারিতে 'র'-কে আনতে আমি রাজি নই। দুই সংস্থার মধ্যে গুণগতমানে পার্থক্য রয়েছে। কেনো নয়? তার কারণ হলো—

- ভারতের স্বাধীনতার ২০ বছর পর 'র' এর জন্ম হয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির হাত ধরে। সে কারণে আইবি-র মতো 'র' এতটা ব্রাহ্মণ্যবাদী হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এখানেও চেষ্টা অনেক হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারার অনেক অফিসারই 'র'-তে

রয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা একটা বদ্ধ জায়গা হওয়ার ফলে আরএসএস তাতে অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেনি।

- সবথেকে বড় কথা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, শ্রীলঙ্কার মতো বিদেশি দেশগুলোকে নিয়েই যেহেতু 'র'-কে কাজ করতে হয়, সে কারণে দেশের ভেতরের কোনো ঘটনাকে তাদেরকে ততটা প্রভাবিত করতে পারে না। ফলে দেশের ভেতরে আইবি-র যা রমরমা অবস্থা, 'র'-এর তেমনটা নেই।
- বছরের পর ধরে এই দুই সংস্থার মধ্যে কর্মগত একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে। এবং বর্তমানে তা তুঙ্গে উঠেছে। ফলে একে অন্যকে খাটো করতে, দুই সংস্থাই কোনো সুযোগই হাতছাড়া করে না। এইসব কারণেই, 'র'-তে বেশ কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী অফিসার থাকা সত্ত্বেও আরএসএস ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন এই 'র'-কে ঠিক নিজের বলে মনে করতে পারেনি। এর উপর ভরসা রাখা সম্ভব হয়নি। তবে ঘটনাবিশেষে কিছু ক্ষেত্রে তারা 'র'-কেও ব্যবহার করতে ছাড়েনি। ফলে যেটা হলো, ধীরে ধীরে আইবি একাই দেশে সবথেকে শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে মাথাচড়া দিয়ে উঠল।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আইবি-নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতাশালী

পরবর্তী সরকার রাজনীতি আর সরকারি কাজকর্ম নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিল যে তারা প্রথমে খেয়ালই করেনি যে আইবি আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতেই প্রায় চলে গেছে। পরে যখন সরকার বুঝতে পারল, তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। আইবি তখন একটা সমান্তরাল ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, এতটাই শক্তপোক্ত যে কোনো সরকারের পক্ষেই তাকে ভাঙা প্রায় অসম্ভব। অগত্যা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো গতি ছিল না। খাতায় কলমে অবশ্য আইবি প্রধান নিয়োগে সরকারেরই ক্ষমতা ছিল, তবে সেই নিয়োগে পছন্দের কোনো জায়গা-ই ছিল না। বিদায়ী আইবি প্রধানই তার জায়গায় কাউকে একটা বসিয়ে দিয়ে যাবেন, আর সরকার বিনা প্রশ্নে তাঁকে মেনে নেবে, এমনটাই নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অতীতে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, 'সেই ট্রাডিশনই সমানে চলছে'। এমনকি যদি কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী নন এমন কাউকে সরকার আইবি-র মাথায় বসায়, তাহলেও অবস্থা যে খুব একটা পাল্টায় তেমনটা নয়। আইবি-তে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এতটাই সংহত যে, কোনো বাইরের লোক এসে চলতি ব্যবস্থা পাল্টে দেবেন, সেটা হওয়ার জো নেই। আর যদি তিনি একগুঁয়ে আর এই কাজে সততা দেখাতে যান, তাহলে

এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হবে, যাতে তার আর সরকার, দুইয়েরই মুখ পুড়বে। অগত্যা সরতে হবে তাঁকে।

রাজ্য-কেন্দ্র ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে কীভাবে আইবি নিয়ন্ত্রণ করে

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাজের দিন শুরু হয় আইবি-র ডিরেক্টরের মুখ দেখে। রোজ ১৫ থেকে ২০ মিনিট প্রধানমন্ত্রীকে তার সাথে বসতে হয়। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের হালহাকিকত কেমন গেল, ভবিষ্যতেই বা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে কেমন যেতে পারে, তা জানানো হয়। বাইরের দেশের কিছু গোপন তথ্যও থাকে তাতে। রোজ নিয়ম করে ডিআইবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও এই সব তথ্য দেন। কখনও কখনও বিশেষ কোনো তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর সাথেও তাঁকে বসতে হয়।

ডিআইবি-র সাথে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিয়ম করে এই বসাটাকেই ব্যবহার করে আসছে আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী। এবং কায়দা করে আইবি, নিজেদের কীভাবে সরকার ও প্রশাসনের বাকি অংশের থেকে আলাদা করে ফেলল দেখুন—

- 'টপ সিক্রেট ইনফরমেশন' ও সিক্রেট অপারেশনের অজুহাত দেখানো হলো। আইবি কী কাজ করছে, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, বিদেশমন্ত্রক বা প্রতিরক্ষামন্ত্রক, নিজেদের মধ্যে কিন্তু কোনো আলোচনা বা তথ্য দেওয়া নেওয়া করে না।
- রাজ্য, স্বায়ত্বশাসনে থাকা সংস্থা, আমলা, পুলিশ থেকে শুরু করে বিচার বিভাগকেও আইবি একটা ধারণা তৈরি করিয়ে দিল যে, তারা যে কাজটা করে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অনুমোদন নিয়েই, এবং তা সর্ম্পূণভাবে দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানের স্বার্থে।
- 'কভার্ট অপারেশন', সিক্রেট অপারেশন', 'কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন', 'অ্যান্টি টেররিস্ট অপারেশন', 'ইন্টারনাল সিকিউরিটি', ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস', এরকম কিছু কিছু শব্দবন্ধ বারবার সামনে রাখা হলো। আর তার জেরে নিজেদের কাজকর্মকে গোপন করে ফেলল তারা। রয়ে গেল অস্বচ্ছতা।

এই সব কান্ডের পর নানান মন্ত্রক, দফতর, আমলা, পুলিশ সবাই আইবি-র আদেশ মেনে চলতে শুরু করল। তারা মনে করতে লাগল, এই নির্দেশ আসছে খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে। আইবি-র মতলবটা কী, তারা সেটা জানার চেষ্টা করল না, 'টপ সিক্রেট' ফাঁস হয়ে যাবে, এই ভয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতর,

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বা অন্য কোথাও খোঁজ নিয়ে আইবি-র সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টাও করল না। এই আদেশ না মানলে, বা আইবি-কে পাল্টা প্রশ্ন করলে আইবি যদি সরকারি গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩-এ তাদের ফাঁসিয়ে দেয়, এই ভয়টাও কাজ করেছিল। এভাবেই আইবি-র গোপন কাজকর্ম কারোর হস্তক্ষেপ ও বাধা ছাড়াই অনায়াসে চলতে থাকল। 'টপ সিক্রেট' বিষয় হওয়ার ফলে যেহেতু জানাশোনার জায়গাটা খুব একটা অনায়াস ব্যাপার ছিল না, তাই কেউই জানতে পারত না, আইবি-র কাজকর্মে আদৌ প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন রয়েছে কিনা। সত্যি কথা বলতে কী, এর কিছু কিছু তো খোদ প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও জানত না। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে আইবি-র গোপন কাজকর্মের ওপর এতটাই গোপনীতার চাদর চড়ল যে সন্দেহ, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্টমন্ত্রীও তাতে নজরদারির চেষ্টা করলে ব্যর্থ হতেন।

আইবি-র ধৃষ্টতা

আইবি কতটা সাম্প্রদায়িক, তা ভালোরকম বোঝা যায় একটি তথ্যে। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত আইবি-তে একজনও মুসলিম পুলিশ অফিসার ছিলেন না। ১৯৯৩ সালের পর নেহাতই খাতায় কলমে দেখানোর জন্য কয়েকজন মুসলিম অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এটা যে কেউ ভেবে নিতেই পারেন, যে তাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহারটা করা হতো। কতটা তাদের ওপর ভরসা করা হতো। আইবি-র ধৃষ্টতা এমন ছিল, যে তৎকালীন মুসলমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীকেও তারা জবাবদিহি করত না—যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই তাদের উর্ধ্বতন ছিলেন। মুসলিম ইন্ডিয়ার ২০০৮-এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি কে এস সুব্রামানিয়াম বলেছিলেন "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক প্রাক্তন সচিব, ওই পদে মুসলিম হিসেবে যিনি প্রথম, আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন আইবি তাদের রিপোর্ট তার কাছে দেখাচ্ছে না। অথচ তিনিই সেই সংগঠনের উর্ধ্বতন ছিলেন..."

মুফতি মোহাম্মদ সাঈদ যখন কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে ছিলেন তখন আইবি তার সাথে কেমন ব্যবহার করত কে জানে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং–এর সময়ে এই অবজ্ঞা করে তারা খুব যে একটা পার পেতে পারত তা নিশ্চয়ই নয়। কারণ ভিপি সিং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ঠিকুজি কুষ্ঠী চিনতেন হাতের তালুর মতো। ভি পি সিং-এর আমলে আইবি বেশ একটু নীচু হয়েই ছিল। কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর ফের স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠেছিল তারা।

আইবি-র ফাঁদে সরকার

মারাঠি পাক্ষিক সংবাদপত্র *বহুজন সংঘর্ষ*-এর (৩০ মে ২০০৮) প্রতিবেদন ছিল,

এরকমটা কেনো হলো যে আইবি, পাকিস্তানের আইএসআই-এর মতো হয়ে গেল? তারা সরকারকে নির্দেশ দিতে শুরু করল, নেতাদের ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করল! এটা হয়েছিল ১৯৯০ সালের শুরুতে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গোপনে কিছু সংবেদনশীল ঘটনার তদন্ত চালাতে আইবি-কে অনুমতি দিয়েছিল। যার কোনো সরকারি খতিয়ান থাকবে না। কয়েকজনের ফোন কলের ওপর নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছিল। আইবি সরকারকে বুঝিয়েছিল, প্রথাগত ভাবে তদন্ত চালাতে গেলে তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ফোন কলের ওপর নজরদারি যেভাবে চালানো হয়, সেভাবেও যদি আইবি কাজ করতে যায়, তাহলেও জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে গোপনে ফোন কলের ওপর নজরদারি চালানোর মতো জায়গায় নিজেদেরকে নিয়ে যায় আইবি। টেলিফোন বিভাগে সমমনস্ক অফিসারদের নিয়োগ করে এই প্রথা চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকে আইবি। এটা জানা নেই যে পরের সরকারের কাছ থেকে এই নিয়ে আইবি কোনো অনুমতি নিয়েছিল কিনা। অথবা পরের সরকার আদৌ বিষয়টি জানত কিনা। তবে বলা হয়, এই প্রথাটা বর্তমানেও জারি রয়েছে। সরকারের এই বোধটা তখন আসেননি, যে এই ধরনের অনুমতি দেওয়া মানে আইবি-র হাতে ভয়ঙ্কর অস্ত্র তুলে দেওয়া, যার কোপ একসময় তাদের ঘাড়েও পড়তে পারে। টেলিফোন বিভাগে আরএসএসপন্থী অফিসার নিয়োগ করে এই প্রথাটাকে আইবি অত্যান্ত বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে চলে গেল। আইবি-র হাতে যে কারোর ফোন কল রেকর্ড করার ক্ষমতা এসে গেল। যা দিয়ে যে কাউকেই ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করল আইবি। সরকার পড়ল নিজের খোঁড়া গর্তেই।

তাছাড়া তথ্য হাসিল করার জন্য সরকাররের কাছে আর কোনো বিকল্পও ছিল না, ফলে বেদবাক্যের মতো কোনো রকম যাচাই না করেই তারা আইবি-র কথা বিশ্বাস করে ফেলত। এভাবেই সরকার আইবি-কে সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বজ্ঞ বলে ধরে নিল। অথচ এটা বুঝতে পারল না, যে এভাবে চলতে থাকলে একসময় আইবি মহাশক্তিধর হয়ে দাঁড়াবে, এবং দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লোককেই তারা আঙুলের ইশারায় নাচাবে। এভাবেই কয়েক বছরের মধ্যে আইবি ভয়ংকর দৈত্যের মতো বনে গেল, যে কিনা নিজের মালিককেই গিলে ফেলতে পারে। ঠিক পাকিস্তানের আইএসআই-এর মতো।

আরএসএস ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্থাগুলো শক্তিশালী হয়ে গেল

সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ এবং আইবি-এই দুই শক্তিশালী অস্ত্র হাতে পেয়ে, দেশে কলেবরে বাড়তে লাগল আরএসএস-এর। এবং খুব কম সময়ের মধ্যেই তাদের ৪৪ হাজার শাখা, ৩০ হাজার শহর ও শহরতলী এলাকায় ছড়িয়ে গেল। ঠিক কতজন তাদের কর্মী ছিল সেটা জানা নেই। তাদের সত্তর থেকে আশি লক্ষ সদস্য হয়ে যেতেই পারে। প্রখ্যাত লেখক অরুন্ধতী রায়, আউটলুক ম্যাগাজিনে (২২ ডিসেম্বর ২০০৮) '৯ কখনই ১১ নয় এবং নভেম্বর কখনই সেপ্টেম্বর নয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, আরএসএস-এর ৪৫ হাজার শাখা আর সত্তর লক্ষ সদস্য দেশে ঘৃণার আবহাওয়া তৈরি করছে। আরএসএসের বেশ কিছু শাখা সংগঠন রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি সংগঠনের লক্ষ্য শুনলে মনে হয়, তারা কোনো ভাবেই ক্ষতিকর হতে পারে না।

আরএসএস-এর শাখা সংগঠন ও তাদের কাজকর্মের লক্ষ্য

১) হিন্দু জাগরণ মঞ্চ-কৃষিজীবী শাখা

২) বজরং দল-প্রতিবাদী শাখা

৩) ভারতীয় জনতা পার্টি-রাজনৈতিক শাখা

৪) এবিভিপি-ছাত্র শাখা

৫) বিদ্যা ভারতী-১৩ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৭০ হাজার শিক্ষক ও ১ কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি ছাত্র নিয়ে শিক্ষা সংগঠন

৬) অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত-ক্রেতা আন্দোলন

৭) বনবাসী কল্যাণ আশ্রম উন্নয়ন

৮) অখিল ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ-সাহিত্য

৯) প্রজ্ঞা ভারতী-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন

১০) দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট

১১) ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনালয়-ঐতিহাসিক গবেষণা

১২) সংস্কৃত ভারতী-ভাষা

১৩) সেবা ভারতী-বস্তিবাসীদের উন্নয়ন

১৪) হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠান

১৫) স্বামী বিবেকানন্দ মেডিক্যাল মিশন-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

১৬) ন্যাশনাল মেডিকস অর্গানাইজেশন

১৭) ভারতীয় কুষ্ঠ নিবাধণ সঙ্ঘ-কুষ্ঠরোগীদের সেবাকেন্দ্র

১৮) সাহাকার ভারতী-সমবায় আন্দোলন
১৯) ভারত প্রকাশন-খবরের কাগজ ও অন্যান্য কাগজপত্র
২০) সুরুচি প্রকাশন-প্রকাশক ও মুদ্রক
২১) কোকহিত প্রকাশন-প্রকাশন ও মুদ্রক
২২) জ্ঞানগঙ্গা প্রকাশন-প্রকাশন ও মুদ্রক
২৩) অর্চনা প্রকাশন-প্রকাশন ও মুদ্রক
২৪) ভারতীয় বিচার সাধনা-প্রকাশন ও মুদ্রক
২৫) সাধনা পুস্তক-প্রকাশন ও মুদ্রক
২৬) আকাশবাণী সাধনা-প্রকাশন ও মুদ্রক
২৭) সামাজিক সম্রাসতা মঞ্চ-সামাজিক একত্রীকরণ মঞ্চ
২৮) বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-ধর্মীয় শাখা
২৯) বিবেকানন্দ কেন্দ্র-দর্শনতত্ত্বের শাখা
তালিকা চলতেই থাকবে...

আরএসএস আর তার ভিএইচপি, বজরঙ্গ দল ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মতো হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক শাখাগুলো দেশকে 'হিন্দুরাষ্ট্রে' পাল্টে ফেলার ব্যাপারে স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার করেছে। তবে তাদের আসল উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র গঠন। ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব কায়েম করা। এই কর্তৃত্ব শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষেত্রেই বলবৎ করতে চায় তারা। যেরকমটা আগেও বলা হয়েছিল সংস্কারপন্থী আন্দোলন থেকে সাধারণ হিন্দুদের নজর ঘোরানোর চেষ্টা চলছিল। নজর ঘোরানোর চেষ্টা চলছিল, শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধারণ হিন্দু ও দলিতদের ওপর ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির অত্যাচারের থেকে। তারা হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরি করেছিল। অন্যান্য হিন্দু ও দলিতদের মধ্যে তৈরি করেছিল অসাম্য, অবজ্ঞা। আরএসএস শাখা সংগঠনগুলোতে ছোটোবেলা থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সদস্যদের মাথা খাওয়া চলতে থাকে। সাধারণ হিন্দু ছেলেমেয়ে ধরে ধরে সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে তাদের মন বিষিয়ে দেওয়া হতে থাকে। ভারতের একটা বিকৃত আর সাজানো ইতিহাস তুলে ধরে, ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করানো হতে থেকে। দেশের কোনো কোনো জায়গায় খ্রিস্টানদের সম্পর্কেও চলে এরকম অপপ্রচার। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোতে তারা কোনো রকম সুযোগ হাতছাড়া করে না। ধর্মীয় উৎসবের ভিড় বা শোভাযাত্রা হলো তাদের সবথেকে বড় সুযোগ তৈরির জায়গা।

শুধু তরুণ সদস্যরাই কেনো, কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন ইতিহাসবিদ, লেখক, নাট্যকার, সাংবাদিক এমনকি সরকারি কর্মীদের অনেকেই আরএসএসের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন। তারা খুব যত্ন করেই যার যার নিজের জায়গা থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ঐতিহ্যকে তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বিষিয়ে দিতে ওস্তাদ। মুসলিম বিরোধী আবহাওয়া তৈরি করতে কট্টর সঙ্ঘবাদীরা কোনো সুযোগই ছাড়ে না। তা সে বাড়ি হোক, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হোক এমনকি পথ চলতে চলতেই হোক না কেনো।

সমাজে আরএসএস ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোর টানা সাম্প্রদায়িক ভাইরাস ছড়ানোর ফলেই পরিস্থিতি এতটা উত্তপ্ত হয়েছে, যে একটা ছোট উস্কানিতেই সাম্প্রদায়িক বিপর্যয় নেমে আসে। এরপর দাঙ্গা যার আগুনে পোড়ে মুসলিম, সাধারণ হিন্দু ও দলিতরা। অবর্ণনীয় যন্ত্রণা নেমে আসে তাদের পরিবারের ওপর। আদালত-পুলিশের চক্করে পড়ে তাদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের কাজের জায়গা নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে কট্টরপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা, যারা এই ধরনের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধানোর কারিগর, তাদের কিন্তু এসবে কিছুই যায় আসে না। দাঙ্গা বাধিয়েই তারা সরে পড়ে। থেকে যান সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান ছেলেরা। তারাই বছরের পর বছর পুলিশ-আদালতের ফাঁদে পড়ে যায়। এভাবেই সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানদের, নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতে আরএসএস ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলো বেশ সফল হয়েছে।

১৮৯৩ সাল থেকে ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস এত বড় ও জটিল যে এতটা বিশদে লেখার জায়গা এই বইতে অন্তত নেই। কিন্তু ছোট করে বললে, আমরা এটা মানতে বাধ্য হচ্ছি যে এই ধরনের শয়তানি পরিকল্পনার মধ্যে দিয়েই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক কিছু হস্তগত করে ফেলেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—ভোটে জেতার জাদুকাঠি

এমনকি এই খেলা যারা খেলতে শুরু করেছিল তারা অতীতে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, যে একসময় এটাই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিকে বেশ ভালোরকম রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারে। ভোটে জেতার জাদুকাঠি হয়ে উঠতে পারে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী আন্দোলনের পাল্টা কাজ হিসেবেই যে শুধু এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কাজে লেগেছে তা নয়, কাজে এসেছে ভোটে জেতার জাদুকাঠি হিসেবেও। এমনকি কোনো বিশেষ অঞ্চলে যদি সংস্কারপন্থী আন্দোলন আশি শতাংশও কাজ করে থাকে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কাজে লাগিয়ে তা

তলানিতে ফেলতে পারে সঙ্ঘ পরিবার। সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ হিন্দু যুবকরা সবকিছু ভুলে যান। 'হিন্দু' সংগঠনের আড়ালে থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির পিছনে পিছনে ছুটতে থাকেন তারা। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে এই ব্যাপারটিকে বেশ বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগিয়েছে আরএসএস। আরএসএস সদস্যরা যেমন লক্ষ্যে অবিচল ও অনুগত, ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর সদস্যরা সেরকম হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে আদর্শিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে সেই জাদুকাঠিটা ঘুরিয়ে বেশ কিছু রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে ফেলে বিজেপি। এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মহা নাটকের পর কেন্দ্রের তখতও দখল করে তারাই। কিন্তু এই পরিস্থিতি বেশিদিন টেকেনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির ভূমিকা ও উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের সন্দেহ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিশেষ করে গুজরাট দাঙ্গার পর সঙ্ঘীদের মুখোশ জঘন্যভাবে খুলে যায়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে, মুসলিমদের ওপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য তারা প্রাণপণে বিকল্প কোনো পথ খুঁজতে থাকে।

বদলে যাওয়ার মুহূর্ত

সাম্প্রাদায়িকতা থেকে 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ'—এর ভূত

গুজরাট হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করা হয়েছিল বিশ্বজুড়ে। আরএসএস ও বিজেপির ভাবমূর্তি সার্বিকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বোধ হয়েছিল, গত পাঁচ দশক ধরে তাদের জাদুকাঠি—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আর ইচ্ছেমতো সুফল দেবে না, রাজনৈতিক লাভ দেবে না, উলটো বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে যেটুকু ফায়দা তোলা গেছে, সেটাও বরবাদ হয়ে যাবে। সুতরাং তারা ঠিক করল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর বদলে, মুসলিম সন্ত্রাসবাদের ভূত খাড়া করবে। বদলে যাওয়ার সেই মুহূর্তে তারা আইবি ও সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে জমি তৈরির কাজ শুরু করে দিল।

ভারতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের ভূত খাড়া করতে আইবি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুসলিমদের ওপর চাপ দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যখন সন্ত্রাসবাদকে নতুন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করল, তখন 'জেনারেল ইন্টেলিজেন্সের' নামে আইবি গুজব ছড়ানোর কাজ শুরু করে দিল। ভিভিআইপি, গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা, ধর্মীয় স্থানে সন্ত্রাসবাদী হামলার জুজু দেখিয়ে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করল, দেশে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী রমরমা বাড়ছে। অথচ গোয়েন্দা তথ্যের ক্ষেত্রে 'জেনারেল ইন্টেলিজেন্স' বলে কিছু হয়ই না। ইন্টেলিজেন্স মানে কী? গোয়েন্দাদের হাতে আসা নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, যা কিনা

কোনো মতেই জনসমক্ষে আনা যাবে না, যা গোপন রাখতে হবে। যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে এবং অবশ্যই সেই কাজ সফলভাবেই করতে হবে। অথচ আইবি সঙ্ঘ পরিবারের ছাতার তলায় থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই পুলিশের মাধ্যমে ইন্টেলিজেন্সের নামে ভুয়া খবর দিয়ে উত্তেজনা ছড়াতে লাগল। মাঠে নেমে পড়লো কিছু সংবাদমাধ্যম। মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো হলো, মুসলিমদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। আপাতভাবে গত তিন বছর ধরে টানা যে সব খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, তার কয়েকটা নমুনা দেখে নেওয়া যাক:

১. "মাদ্রাসাগুলোকে অপব্যবহার করছে সন্ত্রাসবাদীরা: আইবি" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১৩ জুন ২০০৬)
২. "গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরগুলোই সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য" (মারাঠি দৈনিক *মহাসত্তা,* কোলহাপুর, ২১ জুন ২০০৬)
৩. "পুনেয় গণেশ উৎসবে বিস্ফোরণের ছক" (মারাঠি দৈনিক *সকাল,* পুনে ২৬ জুলাই ২০০৬)
৪. "দিল্লি ও মুম্বাইয়ে আল-কায়েদার হানার সম্ভাবনা, স্বাধীনতা দিবসে সন্ত্রাসবাদী হামলার সতর্কতা আমেরিকার" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১২ আগষ্ট ২০০৬)। (আইবি এই তথ্যটি সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করেছিল বটে, কিন্তু পরের দিনই আমেরিকা এই বিষয়টি অস্বীকার করে।)
৫. "দিল্লিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাড়ি বোমারুরা, ব্রিটেনে হামলার ছক জয়েশ নেতার" (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৩ আগস্ট ২০০৬)। (*নিউ ইয়র্ক টাইমস* ব্রিটেনে হামলার ছকের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে জানায়, গোটাটাই স্যাঁতস্যাঁতে পটকার মতো বিষয়: *ডেইলি সকাল,* ৩১ আগস্ট ২০০৬)
৬. "সাতজন মানববোমা বিস্ফোরণের জন্য তৈরি: এটিএস প্রধান" (মারাঠি দৈনিক *পুধারি* ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬)
৭. "মুম্বাইয়ের গণেশ বিসর্জনের সময় পুলিশের পোশাক পরে নাশকতা চালাতে পারে জঙ্গিরা" (*পুধারি,* কোহলাপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬, 'গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর' বলে সংবাদটি প্রকাশিত হয়)
৮. "পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার সম্ভবনা: প্রধানমন্ত্রী" গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর বলে জানানো হয় (৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬-এর প্রায় সবকটি সংবাদপত্রেই প্রকাশিত)

৯. "সবকিছু এখনও শেষ হয়নি, সতর্কতা এটিএস প্রধানের; দেশের বিভিন্ন জায়গায় হামলার ছক কষছে লশকর" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৪ অক্টোবর ২০০৬)

১০. "নিউক্লিয়ার ঘাঁটিগুলোতে হামলার আশঙ্কা-দাবি শিবরাজ পাতিলের, 'গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর' বলে জানানো হয়" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৩ নভেম্বর ২০০৬)

১১. রাজ্যের ডিজিপি, আইজিপি-দের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর সামনে আইবি প্রধান ইএসএল নরসিংহমের দাবি, যারা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে (পড়ুন নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যা করছে) তাদের আইনি বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত রাখা হোক। আইনি অনাক্রম্যতা দেওয়া হোক তাদের। (*দৈনিক সকাল,* পুনে এবং প্রায় প্রত্যেকটি প্রথম সারির সংবাদপত্রে প্রকাশিত, ২৪ নভেম্বর ২০০৬)

১২. মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন ডিজিপি, যিনি আরএসএসপন্থী বলেও পরিচিত, শ্রী অরবিন্দ ইনামদার আইবি প্রধানের দাবিকে সমর্থন করেন। সন্ত্রাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে POTA-র মতো আইন আনার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। (*দৈনিক সকাল,* পুনে, ২ ডিসেম্বর ২০০৬)

১৩. "আল-কায়েদার নজরে গোয়ার পর্যটকরা" (*সকাল,* পুনে, ১৫ ডিসেম্বর ২০০৬, 'গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর')

১৪. "সনিয়ার ওপর হামলার ছক আল-কায়েদার, পাকিস্তানের আইএসআই-এর মদত" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২২ ডিসেম্বর ২০০৬ স্বারাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে পাওয়া খবর)

১৫. "২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর হাই অ্যালার্ট জারি," মুম্বাইয়ে বড়দিনের সময় প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে সন্ত্রসবাদী হামলার আশঙ্কা। মুম্বাইয়ের সবকটি থানাতেই সতর্কতা জারি মুম্বাই পুলিশ কমিশনারের। দুবাইয়ের একটি ফাইভ স্টার হোটেলে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদের কথোপকথন শুনে ফেলেন একজন হোটেলকর্মী। তাই ফোনের জেরেই সতর্কতা জারি। (*মিড ডে মুম্বাই* ২০ ডিসেম্বর ২০০৬)

১৬. রিমোটের খেলনা প্লেনের মাধ্যমে নেতাদের ওপর হামলার আশঙ্কা। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখন্ডের ভোট প্রচারের সময়েই হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা। নিশানায় রয়েছেন সনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধিও। সন্ত্রাসবাদীদের কথোপকথন শুনেই গোয়েন্দা দফতর এই তথ্য প্রকাশ করেছে। (*পুধারি,* ২২ জানুয়ারি ২০০৭)

১৭. "ভারতীয় ক্রিকেট টিমের উপর সন্ত্রাসী হানার আশঙ্কা। শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী ও দ্রাবিড়কেই নিশানা করছে সন্ত্রাসীরা।" এটাও সন্ত্রাসবাদীদের কথোপকথন রেকর্ড করে জানতে পেরেছিল গোয়েন্দারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সচিব শ্রী দুজ্জল ওড়িশার মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করেন। (*পুধারি*, ২৩ জানুয়ারি ২০০৭)। এই খবর সংক্রান্ত প্রতিবেদনেই পুনের *সকাল* ২০০৭-এর ২৩ জানুয়ারী জানায়, এই খবর তারা পেয়েছে *টাইমস নাও* চ্যানেলের কাছ থেকে। *টাইমস নাও* কোথা থেকে খবর পেয়েছে? 'গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর'।

১৮. "মালেগাঁও-এর মতোই সমঝোতায় টাইমার" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ প্রকাশিত খবর, পাতিয়ালায় গুজরাট পুলিশ ক্যাম্পিং করছিল তারাই, যদিও এই ঘটনার তদন্তে ছিলেন না, দাবি করেছে সন্ত্রাসী হানার জন্য দায়ী লশকর-ই-তৈয়বা ও সিমি।)

১৯. "সন্ত্রাসবাদীদের কাছে রাসায়নিক বোমা, অক্টোবরেই হামলার আশঙ্কা" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর)

২০. "স্টক মার্কের্টে টাকা খাটাচ্ছে সন্ত্রাসী সংগঠন: জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

২১. "সন্ত্রাসীদের নতুন অস্ত্র, লিকুইড বোমা" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২৭ মে ২০০৭ গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর)।

২২. "হুজির নজরে এবার গুজরাট?" (*সকাল* পুনে ২৮ মে ২০০৭, গোয়েন্দাসূত্রে পাওয়া খবর)

২৩. "ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আল-কায়েদা সহাযোগিদের" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৯ জুন ২০০৭, এবং সকাল পুনে, ৯ জুন ২০০৭) (এই খবর আইবি ছড়িয়েছিল সিএনএস নামে একটি সংবাদসংস্থার কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠি আর সিডির ওপর ভিত্তি করে। আল-কায়েদা-ই-হিন্দ নামে একটি অখ্যাত গোষ্ঠীর কাছ থেকে শ্রীনগরে মিলেছিল এগুলো।)

২৪. "রাজ্যগুলোকে সতর্কবার্তা কেন্দ্রের" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭, এবং সকাল, পুনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭) (পরে বলা হয়েছিল, কোনো নির্দিষ্ট তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই সতর্কবার্তা

আদৌ জারি করা হয়নি। সামনেই জন্মাষ্টমী আর গণেশ পুজো, সে কথা মাথায় রেখেই এই সতর্কতা।)

২৫. "নজরে সিরডি-ত্রিম্বকেশ্বর" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭, স্পেশাল আইজিপি নাসিক রেঞ্জকে উল্লেখ করে এই খবর। তিনি আবার এই খবর পেয়েছিলেন আইবি রিপোর্ট দেখে)

২৬. "হায়দ্রাবাদ, মম্বাইয়ে জারি লাল সতর্কতা। আত্মঘাতী হামলার আশঙ্কা।" (*সকাল,* পুনে ৬ অক্টোবর ২০০৭, গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর)

২৭. "রাহুল গান্ধীর জন্য গ্রেনেডের মালার পরিকল্পনা জইশের, খবর পুলিশ সূত্রে" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২৩ নভেম্বর ২০০৭ এবং সকাল পুনে, ২৩ নভেম্বর ২০০৭, আইবি ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী)

২৮. "মহন্ত নিত্যগোপাল দাসকে আল-কায়েদার হুমকি" (*নব ভরত,* মুম্বাই, ২৩ নভেম্বর ২০০৭) পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, মহন্তের কাছে আল-কায়েদার তরফ থেকে হুমকির চিঠি এসেছিল। তাতে লেখা ছিল, "শিষ্যসমেত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন, নয়তো প্রাণের মায়া ত্যাগ করুন।" পরের দিনই জানা গিয়েছিল মহন্তের নিরাপত্তা যাতে বাড়ানো হয় সে কারণে তারই এক শিষ্য সন্তোষ জয়সওয়াল ওই চিঠিটি লিখেছিল। (*আজ কা আনন্দ,* পুনে ২৪ নভেম্বর ২০০৭)

২৯. "ত্রাণ কাজ চালানোর নামে বাংলাদেশে লোক জোগাড় করছে লশকর।" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২৭ নভেম্বর ২০০৭, গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর)

৩০. "আইএসআই-এর সাহায্যে চলা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের আখড়া উত্তরপ্রদেশ: কেন্দ্র" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২৬ নভেম্বর ২০০৭, রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য দেয় কেন্দ্র। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর।)

৩১. "নাশকতার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি দিল্লিতে" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ৪ ডিসেম্বর ২০০৭ এবং সকাল, পুনে ৪ ডিসেম্বর, ২০০৭ এক পুলিশকর্তার বয়ানে খবর, যিনি আবার গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েছেন।)

৩২. "সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় কোন মায়াবতী? (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৭) এই খবর পড়লেই বোঝা যাবে, আইবি

গুজব ছড়িয়েছে। তাদের বক্তব্য ছিল, মায়াবতীকে মুসলমানদের বিরোধিতা করার জন্য উষ্কানি দিয়েছিল আইবি।

৩৩. "গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল ধৃত সন্ত্রাসীদের।" (মারাঠি দৈনিক *লোকমত,* পুনে ১ জানুয়ারি, ২০০৮, তার আগের মাসেই উত্তরপ্রদেশে একটি বিষ্ফোরণের ঘটনায় ধৃত পাঁচ সন্ত্রাসবাদীকে জেরা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে। যে পুলিশ অফিসার জেরা করেছেন, তার কাছ থেকেই মিলেছে তথ্য।)

৩৪. "আদভানি ও মোদিকে খুন করার সুপারি নিয়েছে দাউদ" (*সকাল,* পুনে, এবং *দৈনিক সামনা,* পুনে ২০০৮ সালের ৩০ জানুয়ারিতে দুটি সংবাদ পত্রেই এই খবর বেরোয়। 'র'-কে উদ্ধৃত করে *স্টার নিউজে*-র খবরের ওপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।)

৩৫. "আমেরিকায় হামলার ছক কষেছিল সন্দেহভাজন—ভারতের সঙ্গে অনেক কিছু করার আছে—মনে করছে সন্ত্রাসবাদী নেতারা" (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, কর্ণাটকের দেবাংগিরির পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য। বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদীদের জেরা করে এই তথ্য মিলেছে বলে দাবি।)

৩৬. "গোয়ায় পর্যটনস্থলগুলোতে কর্ণাটকের সন্ত্রাসবাদীদের বিষ্ফোরণের ছক"—(*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ধৃত সন্ত্রাসবাদীদের জেরা করে কর্ণাটক পুলিশের পাওয়া তথ্য।)

ক) "এসটিএফের জালে ৬ লশকর জঙ্গি—নজরে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

খ) "বেঁচে গেল মুম্বাই" (*পুধারি,* পুনে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

৩৭. কর্ণাটকের ডিজিপি বিক্রম সিং-এর সাংবাদিক সম্মেলনের ওপর ভিত্তি করে এই দুটি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। তার দাবি, সন্ত্রাসবাদীরা বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ, চার্চগেট স্টেশন ও একটি বিখ্যাত মন্দিরে হামলার পরিকল্পনা করেছিল।

৩৮. "মুম্বাইয়ে হামলার ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ফাহিম আনসারি"—(*সকাল,* পুনে, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, তথ্য উত্তরপ্রদেশ পুলিশ)

৩৯. "মুম্বাইয়ের ১৩টি জায়গায় বিষ্ফোরণের চক্রান্ত" (*পুধারি,* পুনে, সন্দেহভাজনদের গ্রেফতারির পর মুম্বাই পুলিশ থেকে পাওয়া তথ্য)

৪০. "আরডিএক্স গুজবের পর জম্মু-কাশ্মীর সভা বাতিল সানিয়ার" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এবং পুধারি পুনে, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)। পরের দিনই জানা যায়, খবর ভুয়া। *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, এই সংক্রান্ত প্রতিবেদনে লেখে, 'আরডিএক্স নিয়ে সিআরপিএফ-এর ভুলভাল তথ্য সানিয়ার জম্মু কাশ্মীরের সভা বানচাল করে দেয়'। কিন্তু ততক্ষণে যা হাওয়ার তা হয়ে গেছে। কিন্তু সানিয়া গান্ধির গুরুত্বপূর্ণ জনসভা বাতিলের দায় ঠিক কার? সিআরপিএফ যারা ভুল দাবি করেছিল? নাকি আইবি, যারা খবর যাচাই না করেই বৈঠকের অনুমতি খারিজ করে দিয়েছিল?

৪১. "ডি কোম্পানি, এখন লস্করের অংশ" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৮ মার্চ, ২০০৮ এবং পুধারি ২৯ মার্চ, ২০০৮, গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর)

৪২. "সিমির ৩২ জন মহিলা সন্ত্রাসবাদী মুম্বাইতে সক্রিয়" দৈনিক *পুধারি*, পুনে ২১ মে ২০০৮ মুম্বাই পুলিশ সূত্রে খবর)

৪৩. "নজরে জগন্নাথের মন্দির" (*সকাল*, পুনে, ⁚ মে ২০০৮, গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবর)

৪৪. "২০২৫ সাল পর্যন্ত আইএসআই হামলার সতর্কতা জারি" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৯ জুন ২০০৮, গোয়েন্দা দফতরের গোপন অভ্যন্তরীণ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। গোয়েন্দা দফতরের পাঁচজন অধিকারিকের একটি কমিটি এই রিপোর্টটি তৈরি করেছিলেন।)

৪৫. "আরও সন্ত্রাসবাদী হানার আশঙ্কা করছে পুলিশ" ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের বেশ কয়েকজন শীর্ষনেতা গ্রেফতার, যদিও এখনও সক্রিয় স্লিপার সেল (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮, গোয়েন্দাদের অনুমান থেকে প্রাপ্ত তথ্য)

৪৬. "গোয়া গ্লোবাল টেরর নেটওয়ার্কে আল-কায়েদা, সিমির নজর। বাগা বিচে হামলার ছক" (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ১২ অক্টোবর ২০০৮, গোয়েন্দা ও পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্য)

ক) "শচীন টেন্ডুলকারকে অপহরণের ছক" (*সকাল*, কোলহাপুর, ৩ নভেম্বর ২০০৮, নাগপুর পুলিশ সূত্রে তথ্য)

খ) "টেন্ডুলকারকে অপহরণের ছক জইশের, খবরের সত্যতা মানতে নারাজ গোয়েন্দা সংস্থা" (*পুধারি*, কোলহাপুর, ৪ নভেম্বর ২০০৮, নাগপুরের পুলিশ কমিশনারের কাছে মেলা তথ্য অনুযায়ী)

গ) "আইশের হাতে শচীনের বিপদ" *দৈনিক তরুণ ভারত*, কোলহাপুর, ৪ নভেম্বর ২০০৮, নাগপুরের পুলিশ কমিশনারের কাছে থেকে পাওয়া তথ্য। আইবি এই তথ্য অস্বীকার করে। কমিশনার জানান, তাঁকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ফোন করা হয়েছিল।

৪৭. "হুমকি নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা, পাকিস্তানের জেহাদি সন্ত্রাসীরা ছড়াচ্ছে গোটা ভারতেই" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, দিল্লি, ৩১ মার্চ ২০০৯)

৪৮. "সমুদ্রে সতর্কতা, কেরালায় সন্ত্রাসী হানার আশঙ্কা" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ৩১ মার্চ ২০০৯)

৪৯. "বরুণকে খুন করার পরিকল্পনা ছোট শাকিলের" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, দিল্লি, ১ এপ্রিল ২০০৯, লক্ষ্ণৌতে আইবির তরফে মেলা তথ্য)

৫০. "লক্ষ্য সেনা প্রধান বরুণ নয়" (*হিন্দুস্তান টাইমস*, ১ এপ্রিল ২০০৯)

৫১. "সন্ত্রাসবাদী হামলায় তৈরি প্রশিক্ষিত পাইলট—ঝুঁকি নিতে চাইছি না, সতর্ক গোয়েন্দা সংস্থা" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২ এপ্রিল, ২০০৯)

৫২. "১১ জন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো-ভোটের আগে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার সতর্কতা আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে"। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৮ এপ্রিল ২০০৯)

আমার হাতে যে খবরের কাগজগুলো আসে, উপরের উদাহরণগুলো সেখান থেকেই নেওয়া। ওই বিশেষ দিনগুলোতে হয়তো দেশের অন্যান্য খবরের কাগজেও একই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এই লম্বা তালিকা দেওয়ার কারণ হলো, আমি দেখাতে চেয়েছি কীভাবে আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ধারাবাহিকভাবে গুজব প্রকাশ করে যায়। কীভাবে তারা সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, বরুণ গান্ধি, মায়াবতী, লালকৃষ্ণ আদভানি, নরেন্দ্র মোদি কিংবা এগারোটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ওপর জাল ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী, রাহুল দ্রাবিড়ের মতো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বরা যেমন আছেন, তেমনি দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ও মন্দিরগুলোকেও হাতের থাবার মধ্যে এনে ফেলেছে আইবি। এর একটাই লক্ষ, মুসলিমদের নিয়ে সমাজের সব স্তরে একটা খারাপ ধারণা তৈরি করতে থাকা।

এর থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, মুসলিম বিরোধী পরিবেশ তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়ে আইবি ও অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থা, আরএসএসের আঙুলি হেলনেই চলে। অর্থহীন মুসলিম সন্ত্রাসবাদের জুজু দেখিয়ে ভিত্তিহীন গুজব

ছাড়ানো হতে থাকে। যদি সত্যিই সন্ত্রাসবাদের কোনো ইস্যু থাকত, ওপরের এত উদাহরণের একটিও কি বাস্তবে ঘটত না? কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি।

খবরের কাগজে প্রকাশ পাওয়ার পর একটাই যা ভালো জিনিস হয়েছে, তা হলো ৫২ নম্বরে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রশিক্ষিত পাইলটের যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে, সেটি নিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম নড়েচড়ে বসেছিলেন। তদন্ত করিয়েছিলেন। এবং ২০০৯ সালের ২ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এরকম কোনো ভয়ের কারণ নেই। কোনো বিমান অপহরণ বা কোনো বিমানবন্দরে সতর্কতা জারির মতোও কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকাটা জরুরি। একইসঙ্গে মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে এরকম ভিত্তিহীন খবর যাতে তারা না ছাপে। মন্ত্রীর এই তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে নিশ্চয়ই স্বাগত, কিন্তু তাঁকে তো এটাও জানতে হতো, এই ধরনের খবর তার নিজের গোয়েন্দা সংস্থা, আইবি-র হাত ধরেই বাজারে ছড়ায়। কড়া ভাবে বুঝিয়ে দিতে হতো, যে এই ধরনের খবর আইবি-র তরফে কেউ যদি ছড়ায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিরাপত্তা বাড়ল—মুসলিম সন্ত্রাসী তত্ত্ব ছড়াল

এই সব খবরের প্রভাব, শুধুমাত্র যে খবরের কাগজের পাঠকের ওপরেই পড়ল তা নয়, এর বিস্তৃতি আরও অনেক বেশি। ধারাবাহিক এই সব গুজবে যেটা হলো, এয়ারপোর্ট রেলওয়ে স্টেশন, ধর্মীয় স্থান ও অন্যান্য জায়গাতো বটেই, ভিভিআইপি-দেরও নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হলো। তা দেখে চোরাগোপ্তা আতঙ্ক বজায় থেকে গেল সাধারণ মানুষের মধ্যে। অস্তিত্বহীন 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদী'দের অভিশম্পাত করতে করতে মুসলিমদের সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা তৈরি হয়ে গেল, অনিচ্ছাকৃত ভাবেই। এটাই সবথেকে দুঃখজনক বিষয়। কিন্তু আসল পরিকল্পনা তো এটাই ছিল।

ভুয়া হামলা ও এনকাউন্টার

মনগড়া সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে গুজব ছড়ানো কিন্তু আইবি বন্ধ করল না। তাতে যাতে বিশ্বাস জন্মায়, তার জন্য ভুয়া সন্ত্রসবাদী হামলার ঘটনা ঘটানো হতে থাকল। ভুয়া এনকাউন্টার শুরু হলো। আর তাতে বেশিরভাগ 'সন্ত্রাসবাদী'ই পুলিশের গুলিতে মরতে লাগল। পরে বলা হলো, তারা প্রত্যেকেই 'মুসলিম' এবং

তারা কোনো না কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বাস্তবে যেটা হয়, কোনো হামলার ঘটনা ঘটলে একজন বা দুজন হামলাকারীকে জীবিত অবস্থায় ধরার চেষ্টা চলে। এবং তা হয়ও। আসলে জীবিত কোনো সন্ত্রাসবাদীকে ধরা সম্ভব হলে, তার কাছ থেকে সংগঠন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে তদন্তকারীদের সুবিধা হয়। কিন্তু এবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সবাইকে নিকেশ করা হচ্ছিল। ফলে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। ঘটনাটা যাতে আরেকটু বাস্তবোচিত হয়, সে জন্য নিহত 'সন্ত্রাসী'দের কাছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক ছিল বলে দেখানো চলছিল। কিন্তু তাতেও এই ঘটনা সত্যি প্রমাণিত হয় না। কারণ আইবি হোক বা 'র', ওই সব অস্ত্র তাদের জিম্মাতেও ছিল। আসলে এই ধরনের ভুয়া হামলা, মুখোমুখি সংঘর্ষ দেখিয়ে, মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে সাধারণ হিন্দুদের মন বিষিয়ে দিতে চাইছিল আইবি এবং 'র'। যাতে সমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতিপত্তিটা জিইয়ে থাকে। তারা সরকারকে কোনো বিশদ তদন্ত করতে দিল না। যদি তদন্ত হতো তাহলে তাদের মুখোশটা খুলে যেতে পারত।

জনশ্রুতির সন্ত্রাসবাদ

আইবি-র মাধ্যমে তথ্য পেয়ে, কোনো রকম সত্যতা যাচাই ছাড়াই যেসব সন্ত্রাসবাদী হামলার আশঙ্কার খবরাখবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছিল, তাতে একটা শয়তানসম 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদে'র ছবি সবার সামনে ফুটে উঠছিল। তথাকথিত 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ' কি এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল? নাকি আদৌ তার কোনো অস্তিত্ব রয়েছে? মনস্তত্ব, প্রণালী বা পদ্ধতি বিদ্যা এবং বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস খতিয়ে দেখলে উত্তরটা হবে, 'না'।

গত কয়েক দশকের সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস এক ঝলকে দেখলে আমরা দেখতে পাব, বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদীরা তাদেরকেই নিষ্কৃতি দেয়নি, যারা তাদের মতামতের বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে চাপার চেষ্টা করেছে, তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। নীচে কয়েকটা উদারহণ রইল—

১. মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে ১৫ এপ্রিল, ১৮৬৫ সালে হত্যা করা হয়েছিল। একটি সংগঠন, আমেরিকার দক্ষিণের রাজ্যগুলো নিয়ে আলাদা একটি দেশের দাবি করে আসছিল। লিঙ্কন আপত্তি তুলেছিলেন। আততায়ী সেই সংগঠনেরই সদস্য ছিল।
২. আস্ট্রো-হাঙ্গেরি সম্রাজ্যের উত্তরাধীকারী আর্চডিউক ফ্র্যাঞ্জ ফার্দিনান্দ খুন হোন সরাজেভোতে ১৯১৪ সালের ২৮ জুনে। আস্ট্রো-হাঙ্গেরি সম্রাজ্য

থেকে বেরিয়ে বসনিয়া বৃহত্তর সার্বিয়ার অংশ হোক, এই দাবি তুলছিল ব্ল্যাক হ্যান্ড নামে একটি সার্বিয়ার সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। ফার্দিনান্দ খুন হোন তাদেরই হাতে। এই ঘটনাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিল।

৩. ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির হত্যা আরও রহস্যে মোড়া। এখন অনুমান করা হয়, তিনি হয়তো মার্কিন মাফিয়াদের হাতে খুন হয়েছিলেন। তিনি যেভাবে কড়া মাফিয়া বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন, তার থেকেই এই খুন বলে অনুমান করে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ।

৪. কালো চামড়ার মানুষদের বিরুদ্ধে নিপীড়ন ও বণ্যবৈষম্যের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়াই করে গেছেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার। তার মৃত্যু রহস্যও কাটেনি। লুথার কিং-কে হত্যায় অভিযুক্ত জেমস আর্ল রে-র দাবি, তিনি সাদা চামড়ার বর্ণবাদী দলের মামুলি সদস্য মাত্র। বৃহৎ ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক মাত্র।

৫. পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো খুন হোন ২০০৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর। অনুমান করা হয়, শিয়া বিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লশকর-ই জাঙ্গভির হাতেই খুন হয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ ছিল, ভুট্টোর আচারণ ছিল ইসলাম বিরোধী।

বিপক্ষকে হঠিয়ে দেওয়ার সন্ত্রাসবাদীদের এই যে প্রবণতা, তার জন্য আমাদের বেশি পেছনে তাকানোর দরকার নেই। শুধু ভারতেই গত ষাট বছরে জনপ্রিয় তিন নেতাকে খুন করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে নির্মমভাবে খুন করেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী সন্ত্রাসবাদীরা। তিনি নাকি পাকিস্তানকে একটু বেশি পছন্দ করতেন বলে অভিযোগ ছিল। কিন্তু আসলে তাঁকে অন্য কারণে হত্যা করা হয়েছিল। গান্ধিজি আসলে স্বাধীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজতন্ত্র মেনে নিতে রাজি হননি। হত্যা, সেই কারণেই। ব্লু স্টার অপারেশন সংগঠিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে হত্যা করেছিল খালিস্তানি জঙ্গিরা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল এলটিটিই। এলটিটিই-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারকে সাহায্য করার জন্য সেনা পাঠিয়েছিলেন তিনি। রাজীব হত্যা, তারই বদলা।

এই সব ঘটনা থেকে আমরা একটা যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কোনো নেতাই যদি বিরোধিতা করেন, আসল সন্ত্রাসবাদীরা তাদের ছেড়ে কথা বলে না। কিন্তু ভারতে বহু আলোচিত 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদে'র ক্ষেত্রে শোনা যায়

না। ভারতে আগে ও বর্তমানে যে সব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীরা আছে, আইবি ও সংবাদমাধ্যমের দৌলতে বহুচর্চিত 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদী'রা তার থেকেও মারাত্মক। অন্তত এই ছবিই তো ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে এই সন্ত্রাসবাদের যারা বিরোধিতা করে, তারা তো অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর থেকেও বেশি হইচই করে। যুক্তি বলে, তাদের বিপক্ষে কেউ কথা বললে, সমালোচনা করলে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের রেহাই দেয় না। প্রচুর ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা অনেক দিন ধরে মুসলিম ও 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদে'র বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আসছেন। কিন্তু তাদের ওপর হামলা দূরের কথা, হামলার চেষ্টার কথাও শোনা যায়নি।

তর্কের খাতিরে এটা বলা যেতেই পারে যে ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতাদের গায়ে হয়তো নিরাপত্তজনিত করণে হাত দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিংবা মুসলিম বিরোধী রক্তক্ষয়ী হিন্দু আন্দোলনের ভয়েও হয়তো তারা পিছিয়ে আসতে পারে। কিন্তু দুটো যুক্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ অতীতে নেতাদের হত্যা এটা প্রমাণ করে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদীরা চাইলে যে কোনো নিরাপত্তা বলয়ই ভেদ করে যেতে পারে। লক্ষ্যে পৌছনোয় তাদের আটকানো প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, জিহাদি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসীর রাজা আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আবেগ বা সমবেদনার কোনো জায়গাই তো রাখেনি। তাদের বিকৃত নীতি আদর্শের কারণে ভারতের হাজার হাজার মুসলমান হত্যা করতে 'জিহাদি সন্ত্রাসী'দের এতটুকুও বাধবে না। কিন্তু আসল ঘটনাটা হলো, ওই 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ' নামক শয়তানটার বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই। এটা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বেশ ভালো করেই জানে। আর জানে বলেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা নিশ্চিন্তে ঘুরে ঘুরে বিষোদগার করে বেড়ায়।

ভারতের মুসলমানরা কি সন্ত্রাসবাদী?

ভারতে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের কোনো বলতে ইতিহাস সত্যিই কিছু নেই। যা আছে, তা হলো ব্রিটিশ আমলে কিছু হিন্দু ও মুসলমান বিপ্লবী ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদেরকে 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে তাকমা দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

যাইহোক সম্প্রতি তিনটি ঘটনা এমন রয়েছে, যাতে মুসলিমদের যোগাযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে। ১৯৯৩ সালের মুম্বাই বিস্ফোরণ, ১৯৯৮ সালের কোয়ম্বাটোর বিস্ফোরণ, এবং ২০০১ সালে কান্দাহারে বিমান অপহরণের ঘটনা। এরমধ্যে শুধুমাত্র কান্দাহার বিমান অপহরণের ঘটনাকে শুধুমাত্র

'সন্ত্রাসবাদী' কাজ হিসেবে আখ্যা দেওয়া যাতে পারে। ১৯৯৩ সালের মুম্বাই বিস্ফোরণ কিছু মুসলিম ক্রিমিনালের কাজ। বাবরি মসজিদ পরবর্তী দাঙ্গায় মুসলিম নিধনের প্রতিশোধ থেকে তারা এ কাজ করেছে। ১৯৯৮ সালের কোয়েম্বাটোর বিস্ফোরণ মুসলিম গ্যাংস্টারের কাজ। সঙ্ঘ পরিবারের মুসলিম বিরোধী কাজকর্মের পাল্টা হিসেবে এই বিস্ফোরণ। কিন্তু এই দুটি ঘটনাকে কখনই 'সন্ত্রাসবাদী' কাজকর্মের তালিকায় ফেলা যায় না।

জনশ্রুতির 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদ' আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি-র একটা চাল মাত্র। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আসল সন্ত্রাসবাদকে আড়াল করার একটা পরিকল্পনা। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে আছে নানা ভাবে, নানা স্তরে এবং দেশের নানান জায়গায়। প্রমাণ হিসেবে নীচের প্রতিবেদনগুলোর দিকে চোখ রাখা যাক।

আরএসএস, ভিএইচপি ও বজরং দলের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

১. **মার্চ ২০০১:** পুনেতে সদস্যদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল বজরং দল। অনেক কিছু নিয়েই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তারমধ্যে ছিল জিলেটিন স্টিক-ও। প্রশিক্ষণ শিবিরে রাজ্যস্তরের ৪০ থেকে ৫০ জন সদস্য অংশ নিয়েছিল। নান্দেড়ের হিমাংশু পানসে (২০০৬ এপ্রিলে যে বোমা তৈরি করার সময় মারা গিয়েছিল) ছিল তাদের গ্রুপ লিডার। প্রশিক্ষণ শিবিরের নেতৃত্বে ছিল মিলিন্দ পানসের। মিলিন্দ বজরং দলের সারা ভারতীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা শাখার প্রধান (২০০৬ নান্দেঢ় বিস্ফোরণকাণ্ডে যা প্রমাণিত হয়েছে)।

২. **২০০১:** নাগপুরের ভনসালা সেনা স্কুল চত্বরে আরএসএস-বজরং দলের সদস্যরা ৪০ দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল। গোটা দেশ থেকে ১১৫ জন সদস্য প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিল, এদের মধ্যে ৫৪ জনই ছিল মহারাষ্ট্রের। কীভাবে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে, বোমা তৈরি করে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, সেসবই শেখানো হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত সেনা আধিকারিক ও আইবির উচ্চপদস্থ কর্তারাই ছিলেন এসবের প্রশিক্ষক। (২০০৬ নান্দেঢ় বিস্ফোরণকাণ্ড ও ২০০৮ মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ড থেকে এই সব তথ্য মিলেছে)।

৩. **২০০৩:** পুনের সিংঘার রোডের ওপর আকাঙ্ক্ষা রিসোর্টে যে প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে বোমা তৈরি ও বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল সদস্যরা। জনা পঞ্চাশেক যুবক ছিলেন সেই শিবিরে। মিঠুন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তি সেখানে শুধু প্রশিক্ষণই দেয়নি, শেষ দিনে সদস্যদের হাতে বড় মাত্রায় বিস্ফোরকও তুলে

দেওয়ার ব্যবস্থা করে সে। প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিল অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত সেনা আধিকারিক, রাকেশ ধাওয়াড়ে নামে পুনের এক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, শরদ কুন্তে ও ড. দেও নামে কেমিস্ট্রির দুই অধ্যাপক (তথ্যসূত্র, নান্দঢ় ও মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট)।

৪. **১৫ মে ২০০২:** পুনেতে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ১৫৩ জন সদস্যকে নিয়ে সঙ্ঘ পরিবারের ২১ দিনের অভিযোজন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তালাবন্ধ দরজার পেছনে খাঁকি হাফপ্যান্ট পরিয়ে 'হিন্দুরাষ্ট্রে'র পাঠ দেওয়া হয়েছিল। লেজিম, লাঠি, যোগ, খো খো, কাবাডি ও সংস্কৃত শেখানো হয়েছিল। আচমকা কেউ প্রশিক্ষণ শিবিরে চলে আসবেন, কিংবা বেরিয়ে যাবেন, তাতে কড়াকড়ি ছিল। একই সময় দেশের ৭১টি জায়গায় একই ধরনের শিবির চলেছিল। মহারাষ্ট্রের লাতুরে বর্ষীয়ান নাগরিকদের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন ৪৫ থকে ৬০ বছর বয়সীরাও (পুনে নি *উজলাইন দ্য এক্সপ্রেস* ১৫ মে ২০০২) ।

৫. **৩১ মে ২০০২:** আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে ১৫০ জন্য সদস্যকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে, সপ্তাহখানেকের প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছিল বজরং দল। কখনও যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে যুবকরা কীভাবে লড়াইয়ে নেমে পড়বে তা নিয়েই ছিল প্রশিক্ষণ (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৩১ মে ২০০২)।

৬. **১৮ মে ২০০৩:** ক্যারাটে, জুডো, ছুরি আর তলোয়ার নিয়ে কীভাবে লড়াই করবে মেয়েরা ২০০৩ সালের ১৭ মে মুম্বাইতে তাই নিয়েই ছিল বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রশিক্ষণ শিবির। অংশ নিয়েছিলেন সংগঠনের মহিলা সদস্যরা। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ১ মে ২০০৩)

৭. **৩১ মে ২০০৩:** বন্দুক দিয়ে কীভাবে গুলি ভরা হয়, কীভাবে নিখুঁত নিশানা নিদির্ষ্ট করতে হয়, কিংবা মার্শাল আর্ট। ২৫ মে কানপুরের প্রশিক্ষণ শিবিরে ছিল ৭০জন মহিলা অংশ নেন। দেশজোড়া মহিলা প্রশিক্ষণ শিবিরেরই অংশ ছিল কানপুরের সেই শিবির। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলাতে চলেছিল প্রশিক্ষণ শিবির। সেসব জায়গায় নিয়োজিত হয়েছিল যথারীতি অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিকরা ও জুডো শিক্ষকরা। গোটা দেশে ৭৩টি শহরে চলেছিল এইরকম শিবির (*সানডে এক্সপ্রেস*, পুনে, ১ জুন ২০০৩)

৮. **১৮ মে ২০০১:** আওরঙ্গাবাদের নাগেশ্বরওয়াড়ি গণেশ মন্দিরে পাইপ বোমা বিস্ফোরণ। (*লোকমত*, অওরঙ্গাবাদ, ২ মে ২০০৬)।

৯. **১৭ নভেম্বর, ২০০২:** আওরঙ্গাবাদের নিরাল বাগে খাদকেশ্বর মাহাত মন্দির ও ভিএইচপি অফিসের কাছে পাইপ বোমা বিস্ফোরণ। (লোকসত্তার ওয়েবসাইট, ২৪ মে ২০০৬ এবং লোকমত, অওরঙ্গাবাদ ১৭ নভেম্বর) ২০০৬, ৬ এপ্রিল নান্দেড় বোমা বিস্ফোরণে দুজন আরএসএস ও বজরং দলের কর্মী মারা গিয়েছিল। বোমা তৈরি করার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে পাইপ বোমার হদিস পেয়েছিল পুলিশ। তাদের বোমার সঙ্গে অওরঙ্গাবাদের বোমারও বেশ মিল পাওয়া গিয়েছিল (*লোকমত*, অওরঙ্গাবাদ, ২৪ মে ২০০৬)।

১০. **১ জুন, ২০০৬:** নাগপুরে আরএসএস সদর দফতরে হামলার চেষ্টা। পুলিশের গুলিতে ৩ পাকিস্তানি জঙ্গি খতম। (অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি বিজি কোলসে পাতিলের নেতৃত্বে তদন্তকারী দল সিদ্ধান্তে আসে, পুলিশের এনকাউন্টারটি ভুয়া। ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি রাখা হয়। এই ঘটনার পেছনে আইবি-র হাত রয়েছে। জানা ছিল আর এসএস-এরও)।

১১. **নভেম্বর ২০০৩:** পরভানি জেলার মুহাম্মাদিয়া মসজিদে বোমা ছোঁড়া হয়।

১২. **আগস্ট ২০০৪:** পরভানির পূর্ণায় মীরাজুল উলম মসজিদে বোমা ছোঁড়া হয়।

১৩. **আগস্ট ২০০৪:** জালনার কাদরিয়া মসজিদে বোমা ছোঁড়া হয়।

১৪. **৬ এপ্রিল, ২০০৬:** নান্দেড়ে বিস্ফোরণ। বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে আরএসএস, ভিএইচপি, বজরং দলের ২ জন সদস্যের মৃত্যু হয় এবং তিনজন আহত হয়।

১৫. **১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭:** নান্দেড়ে একটি রহস্যজনক বিস্ফোরণে পান্ডুরং ভগবান অমিলকান্থাওয়ান (২৮) নামে একজনের মৃত্যু হয়, দয়ানেশ্বর মানিকরাও গোনেওয়ার (৪০) নামে আরেকজন গুরুতর জখম হয়। দুজনেই বজরং দলের সদস্য বলে সন্দেহ (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)।

১৬. **সেপ্টেম্বর ২০০৭:** 'জিহাদ-ই-ইসলামি' নামে একটি সংগঠনের নাম করে চিঠি পাঠিয়ে ভয় দেখিয়ে, টাকা তোলার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করে উত্তরপ্রদেশের রামপুর পুলিশ। কিন্তু ওই তিনজনের কেউই মুসলিম ছিল না। রাজপাল শর্মা, ডোরি লাল ও ধরম পাল নামে তাদের শনাক্ত করা হয়। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ অক্টোবর, ২০০৭)

১৭. **২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৭:** মুম্বাইতে ক্রিকেটারদের বিজয় মিছিল ছিল। ক্রিকেটারদের আসার আগে শহরে ছয়টি বোমা উদ্ধার হয়েছিল। রাজীব গোবিন্দ সিং এবং সুমিত্রা বাদল রয় নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে কম মাত্রা সম্পন্ন বিস্ফোরক মিলেছিল। অবশ্য তা দিয়ে জনা ছয়েক লোককে তো মারাই যেত। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭)। (ভাবলেও ভয় লাগে, যে অভিযুক্তরা যদি বিজয় মিছিলে সত্যি সত্যি বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যেত! যদি ওই দুই ব্যক্তি মুসলিম হতো, তাহলে পুলিশ, সংবাদমাধ্যম বা জনসাধারণের কেমন প্রতিক্রিয়া হতো?

১৮. **১২ ডিসেম্বর, ২০০৬:** নাসিকের কাছে একটি গাড়ি থেকে ৫০টি ডিটোনেটর, ১১ বাক্স জিলেটিন স্টিক, ৫ টিন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে বজরং দলের যোগসাজশ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। (*সাপ্তাহিক শোধন,* মুম্বাই ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

১৯. **২০০৬:** আহমেদনগর জেলার একটি গ্রামের বাসিন্দা শঙ্কর সেলকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল আরডিএক্স। পরে ওই ব্যক্তি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে মারা যায়। (মারাঠি *সাপ্তাহিক শোধন,* মুম্বাই, ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

২০. **২০০৬:** আহমেদনগরের পাথারি এলাকার একটি চিনি তৈরির কারখানা থেকে বড়মাত্রায় বিস্ফোরক উদ্ধার করে পুলিশ (*শোধন,* মুম্বাই ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

২১. **১৪ অক্টোবর ২০০৬:** অওরঙ্গাবাদের চিকলথানা এলাকার আদগাঁও-এর পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে সাড়ে চার কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ১৮৬টি জিলেটিন স্টিক, ৫৬৬টি ডেটোনেটর উদ্ধার করে পুলিশ। (*শোধন,* মুম্বাই ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

২২. **২০০৬:** অওরঙ্গাবাদ-মুম্বাই হাইওয়ের একটি ক্লাবে লক্ষণ জয়বন্ত নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং ১৮টি জিলেটিন স্কিট উদ্ধার করে পুলিশ। (*শোধন,* মুম্বাই, ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

২৩. **১১ অক্টোবর ২০০৭:** মহারাষ্ট্রের ইয়েভতমাল জেলায় শক্তিশালী বিস্ফোরণের খবর মেলে। ড. বাফনা নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। নিহত

ব্যক্তির সঙ্গে আরএসএস-এর যোগাযোগ রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। (*শোধন*, মুম্বাই ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

২৪. **২০০৭:** লাতুরে সাত যুবকের কাছ থেকে ১৪ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও জিলেটিন স্টিক উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের নাম হলো—বিকাশ মাওয়াদ, কৈলাশ, ভিনোদ, ধনঞ্জয়, নীতীশ, মহেশ এবং গণেশ (*শোধন*, মুম্বাই, ৪-১০ জুলাই ২০০৮)

২৫. **১৫ অক্টোবর ২০০৭:** দিওয়ালির সময়ে ওয়ারধা এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তির কাছে উপহার হিসেবে বেশ কিছু বোমা পাঠানো হয়। ঘটনার জেরে ৪ যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১. চিন্টু ওরফে মহেশ থাডওয়ানি, ২. জীতেশ প্রধান, ৩. প্রকাশ বালভে এবং ৪. অজয় জীবতোডে। এই ঘটনার যে মাস্টার মাইন্ড, সেই বান্দু তেলগোটে ওরফে লাদেন এখনও পলাতক (*দৈনিক ভাস্কর*, ৩ নভেম্বর, ২০০৭)

২৬. **২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৮:** মুম্বাই থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে পানভেল এলাকায় যোধা আকবর মুভি চলার সময় সিনেরাজ সিনেমা নামে একটি হলে বোমা রাখা হয়। (*কমিউনালিজম কমব্যাট*, মুম্বাই, জুলাই-অগাস্ট ২০০৮)

২৭. **৩১ অক্টোবর ২০০৮:** পুলিশের বোম্ব ডিটেকশন ও ডিসপোজাল স্কোয়াড (বিডিডিএস) নবী মুম্বাইয়ের ভাসি এলাকার একটি অডিটোরিয়ামে প্লাস্টিক ব্যাগে রাখা বোমা নিষ্ক্রিয় করে। পরে জানা যায়, ওটি একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের কীর্তি (*কমিউনালিজম কমব্যাট*, মুম্বাই, জুলাই-অগাস্ট ২০০৮)

২৮. **৪ জুন, ২০০৮:** থানের গড়কড়ি রঙ্গনাথন থিয়েটারে বোমা বিস্ফোরণ। ওই থিয়েটারে মারাঠি নাটক 'আমহি-পাচপুতে' মঞ্চস্থ হওয়ার কথা ছিল। সাতজন আহত হয়। পুলিশ জানতে পারে, গুরুকৃপা প্রতিষ্ঠান, সনাতন সংস্থা এবং হিন্দু জনকাগৃতি সমিতির মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের হাত রয়েছে এর পেছনে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোই ভাসি ও পানভেলে বিস্ফোরক রেখেছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এর অনুসন্ধানে জানা যায় এই গোষ্ঠীগুলোর জাল ছড়ানো মহারাষ্ট্র ও গোয়া থেকে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত। এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল *কমিউনালিজম কমব্যাটে*, মুম্বাই, জুলাই-অগাস্ট ২০০৮)। তদন্তের সময়ে ধৃতদের জেরা করে পেন ও সাতারা এলাকা থেকে পুলিশ প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার করেছিল।

২৯. **২৪ জানিয়ারি, ২০০৮:** তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেদি জেলার তিনকাশিতে আরএসএস অফিসে বিস্ফোরণ। বিশদ তদন্তের পর সঙ্ঘ পরিবারের শাখা সংগঠনের আট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, ২০০৭ সালের জুলাই থেকে ১৪টি পাইপ বোমা জড়ো করা হয়েছিল। ধৃতরা স্বীকার করে, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরির লক্ষ্যেই এই কাজ তারা করেছে। (*দ্য মিলি গেজেট,* ১৬-২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)।

৩০. **এপ্রিল ২০০৮:** জলগাঁও জেলার চোপড়া তালুকে আমেরতি গ্রামে একটি ছোটোখাটো দাঙ্গার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, কীভাবে বিশাল পরিমাণ পিস্তল, চপার, তলোয়ারের মতো আগ্নেয়াস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল। পুলিশ আরও জানতে পারে, সাম্প্রদায়িক একটি দলের সদস্য, শেট্টি ফিতেওয়ালা নামে সামন্তনগরের এক বাসিন্দা স্থানীয় যুবকের উস্কানিমূলক ছবি, সিডি দেখিয়ে প্ররোচিত করেছিল। তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। (*দ্য মিলি গেজেট,* ১৬-৩১ মে ২০০৮)।

৩১. **১৭ এপ্রিল ২০০৮:** একটি বেসরকারি হাসপাতালের প্যাথলজি ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়ে পাঁচটি তাজা আরডিএক্স বিস্ফোরক, তিনটি ব্যবহৃত আরডিএক্স বিস্ফোরক, একটি পিস্তল, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, দুটি মোবাইল ফোন নকল ৫০০ টাকার চারটি নোট, ৫ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করে। গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে। নীতীশ আশিরে, সাহেবরাও ধ্রুবে এবং জীতেন্দ্র ক্ষেমা বেনামি সংগঠনের সদস্য (*দ্য মিলি গেজেট,* ১-১৫ মে ২০০৮)।

৩২. **জুন-জুলাই ২০০৮:** স্থানীয় ঠাকুর দাওয়ারা মন্দির ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের জন্য বারাবাকি পুলিশ গ্রেফতার করে আরএসএস সদস্য সূরয নারায়ণ তন্ডেনকে। (*দ্য মিলি গেজেট,* ১৬-৩১ জুলাই ২০০৮)।

৩৩. **অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৭:** থানের বিস্ফোরণ, ভাসি ও পানভেলে বোমা রাখার ঘটনায় তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, গত বছর দিওয়ালির সময় কোনো একটা গ্যাং রত্নগিরি-পানভেল রোডের ধারে রত্নগিরিতে, একটি মুসলিম কবরস্থানে বোমা রেখেছিল। তবে ভাগ্যক্রমে সেটি ফাটেনি। (*দ্য মিলি গেজেট,* ১৬-৩১ জুলাই ২০০৮)।

৩৪. **৪ এপ্রিল ২০০৮:** ২০০৮-এর ১০ এপ্রিল কোলহাপুর জেলার আজারার কাছে পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করে। অলিভার বারদেসকর এবং দত্ত শঙ্কর পাচাওয়াদেকর। ধৃতেরা বাইকে করে ১৫টি হাতবোমা, অস্ত্র

ও বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল (দৈনিক *পুধারী*, কেলহাপুর, ১১ এপ্রিল ২০০৮)।

৩৫. **জুলাই অগাস্ট ২০০৮:** আরএসএস এর শাখা সংগঠন রাষ্ট্রীয় হিন্দু সেনার একজন প্রমোদ মুতালিক বেঙ্গালুরু'র ১৫০ জন সহ কর্ণাটকের ৭০০ জন ছিলেন। রাজ্য থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতেই এই টিম সে নিজেই তৈরি করে বলে দাবি ছিল মুতালিকের। (*পুনে মিরর*, ২৩ অগাস্ট ২০০৮)

প্রমোদ মুতালিক শ্রীরাম সেনরও নেতা ছিল। তার দাবি, তিনি আত্মঘাতী স্কোয়াড তৈরি করে ফেলেছেন। আর তাতে রয়েছে ১১৩২ জন হিন্দু আত্মঘাতী বোমারু। এই মোরারুদের প্রশিক্ষণ দিতে শিমোগা, বেলগাঁও, ম্যাঙ্গালোরে গোপন প্রশিক্ষণ শিবিরও তৈরি করেছে শ্রী রাম সেনে। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

৩৬. **২ অগাস্ট ২০০৮:** উত্তরপ্রদেশের পৈজাবাদ পুলিশ সাধুর বেশ ধরে থাকা এক সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করে। সে আদালতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। তার ঝোলায় ছিল বোমা। পরে জানা যায় তার নাম নানকাও দাস (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

৩৭. **২৪ অগাস্ট, ২০০৮:** উত্তরপ্রদেশের কানপুরে বিষ্ফোরক বানানোর সময় মৃত্যু হয় রাজীব মিশ্র ও ভূপিন্দর সিং নামে বজরং দলের দুই সদস্যের। বড়সড় বিষ্ফোরণের ছক ছিল বলে সাংবাদিকদের জানান কানপুর জোনের আইজিপি। বিস্ফোরক ছাড়াও একটি ডাইরি ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ফিরোজাবাদের একটি ম্যাপ উদ্ধার করা হয়েছিল ঘটনাস্থল থেকে। (*আউটলুক*, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮; *কমিউনালিজম কমব্যাট*, সেপ্টেম্বর ২০০৮)। বিষ্ফোরণের তদন্তে নেমে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এসটিএফ জানতে পারে, বিষ্ফোরণের আগে নিহতেরা মুম্বাইয়ের দুটি মোবাইল ফোনে কয়েকবার কথা বলে। তদন্তে জানা যায় ভুয়া নামে সিমকার্ড দুটি ব্যবহার করা হচ্ছিল। সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে পুলিশ কল রেকর্ডও জোগাড় করার চেষ্টা করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মিশ্রর বাড়ি থেকে যে পরিমাণ বিষ্ফোরক উদ্ধার হয়েছিল, তাতে গুজরাট বা বেঙ্গালুরুর মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ২৯ অক্টোবর ২০০৮)।

৩৮. **২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮:** ম্যাঙ্গালোরের (কর্ণাটক) দক্ষিণ কান্নডা ক্রাইম ব্রাঞ্চ দুরেশ কামাথ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে

অভিযোগ সে পুত্তুর এলাকায় একটি বেসরকারি কমপ্লেক্সে বেআইনি ভাবে প্রচুর পরিমাণে জিলেটিন, স্টিক, ডিটোনেটর ও অন্যান্য বিস্ফোরক জমা করছিল। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ অক্টোবর ২০০৮)

৩৯. **৩ অক্টোবর, ২০০৮:** দশেরা উপলক্ষ্যে ২০০৮-এর অক্টোবরে তালেগাঁও ধাবাড়ে (পুনে) এলকার দুর্গা মাতা দৌড়ের (মিছিল) আয়োজন করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল। সেই মিছিলে লাঠি, তলোয়ার, পতাকা হাতে অংশ নিয়েছিল যুবকরা। দৈনিক *লোকমত* (*হ্যালো পুনে*), পুনে ৮ অক্টোবর ২০০৮)।

৪০. **২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮:** মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও এবং গুজরাটের মোদাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় যথাক্রমে ছয় ও একজনের মৃত্যু হয়। মৃতেরা প্রত্যেকেই মুসলিম। ঘটনার পেছনে হাত ছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের। এই উগ্রপন্থী সংগঠনের সাথে বিজেপির ছাত্র শাখা এবিবিপিভি-র যোগাযোগ রয়েছে। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ২৩ অক্টোবর ২০০৮)।

পরে তদন্তে জানা যায়, এর সাথে যোগ রয়েছে অভিনব ভরত নামে একটি হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন ও কয়েকজন ধর্মগুরু ও সেনা আধিকারিকের। অনুমান, এই গোষ্ঠীই সমঝোতা এক্সপ্রেস, আজমির দরগা ও অন্যান্য জায়গায় বিস্ফোরণে দায়ী।

এই ঘটনার জেরে বেশ কিছু উত্তেজনাকর তথ্য সামনে আসে। ২০০২ সালে দেশজোড়া বিস্ফোরণের ছক কষেছিল অভিনব ভারত নামে সন্ত্রাসী সংগঠনটি। ২০০২-এর ডিসেম্বরে ভূপাল রেলওয়ে স্টেশনে আইইডি উদ্ধার করে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। ঠিক এক বছর পর ভূপালের লম্বা খেরা এলাকায় দ্বিতীয় আইইডি উদ্ধার হয়। তবলীগ জামাতের বার্ষিক সম্মেলনে আসা অতিথি অভ্যাগতদের লক্ষ্য করেই বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সম্মেলনে প্রায় লাখ পাঁচেক মুসলিম আসেন। রামনারায়ণ কলসংগ্রাম ও সুনীল যোশী এই ঘটনায় যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। মহারাষ্ট্র এটিএসের দাবি, অভিনব ভারতের বেশ উঁচু পদেই এঁরা রয়েছেন। বেশ কিছু বজরং দলের সদস্যদের সঙ্গে এদেরও জেরা করা হয়। (*হিন্দু*, দিল্লি, ২০ নভেম্বর, ২০০৮)।

তবে এই সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পরে কী করা হয়, তদন্তেই বা শেষ পর্যন্ত কী উঠে আসে, তা জানা নেই। সম্ভবত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া

হয়েছিল। তা না হলে তারা মালেগাঁও, মোদাসা, আজমির, সমঝোতা এক্সপ্রেস, মক্কা মসজিদের মতো বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাল কী করে।

৪১. **১০ নভেম্বর ২০০৮:** কেরালার কান্নৌরে বোমা তৈরি করতে দুই আরএসএস সদস্যের মৃত্যু। পরের দিন এলাকা তল্লাশি করতে গিয়ে বিজেপি নেতা প্রকাশনের বাড়ি থেকে ১৮টি হাতবোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলের ২০০ মিটার দূরেই ছিল প্রকাশনের বাড়ি। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১১ নভেম্বর ২০০৮ এবং *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৩ নভেম্বর ২০০৮)

৪২. **৯ নভেম্বর ২০০৮:** গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মহারাষ্ট্রের জালনা জেলার বাদনাপুর তহসিলে মনজারগাঁও-এ ৭টি হাতবোমা উদ্ধার করে পুলিশ। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১১ নভেম্বর ২০০৮)

৪৩. **১১ নভেম্বর ২০০৮:** ২০০৮ সালের ১১ নভেম্বর উলফা চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া অভিযোগ তোলে, অক্টোবরে আসামে তিরিশটি বিস্ফোরণ এবং বোড়ো অঞ্চলে উপজাতি হিংসা বাধানোর পেছনে আরএসএস-এর হাত রয়েছে। দুটি ঘটনায় ১৪০ জনের প্রাণ গিয়েছিল (৮৫ জন বিস্ফোরণে, ৫৫ জন হিংসায়)। তার আরও দাবি ছিল, আরএসএস-এর বিস্ফোরণে জড়িত থাকার পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে উলফার হাতে। কয়েক মাস আগে তাদের মুখপাত্র ফ্রিডম-এ উলফা জানিয়েছিল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরণ চালানোর জন্য আরএসএস-এর তরফে নির্দেশ এসে গেছে। কিন্তু সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। (*ডিএনএ অনলাইন নিউজ*, ১১ নভেম্বর ২০০৮)।

৪৪. **১০ ডিসেম্বর ২০০৮:** জামনগরের কাছে খাম্বালিয়া এলাকায় নেহাত সন্দেহের বাশে মহেশ পরব ও অনিল জগতা নামে দুই মহারাষ্ট্রীয় যুবককে গ্রেফতার করে গুজরাট পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দুটি ল্যাপটপ, চারটে মোবাইল ফোন, একটি বাইক, জামনগর এয়ারপোর্ট, সৌরাস্ট্র অঞ্চল, আত্তারি সীমান্ত, রাজস্থান ও গুজরাটের কিছু এলাকার ম্যাপ উদ্ধার করা হয়। রিলায়েন্স ও এসার সংস্থার ম্যাপও মিলে তাদের কাছ থেকে। তাদেরকে এটিএস-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। (*পুধারি*, ১০ ডিসেম্বর ২০০৮)

৪৫. ২৭ **ডিসেম্বর ২০০৮:** সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুবকদের নিয়ে একটি তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে বজরং দল। কোনো রকম পুলিশ অনুমতি ছাড়াই ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর সে ক্যাম্প চলে। যুবকদের লাঠি চালানো, তলোয়ার, এয়ার রাইফেল চালানো শেখানো হয়। সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলাগুলোতে কেমন করে ইসলামিক জেহাদ যুক্ত, সেই সব কথাও মথায় ঢোকানো হয় তাদের। মুম্বাইয়ের ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীরা সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিয়েছিল (*দ্য মিলি গেজেট*, ১৬-৩১ জানুয়ারি, ২০০৯)

৪৬. **১২ জানুয়ারি ২০০৯:** নাগরাজ জামবাগি নামে কর্ণাটকের একজন ডাকাত স্বীকারোক্তি দেয়, তার সাথে হিন্দু উগ্রপন্থী সংগঠনের যোগাযোগ আছে। ২০০৮ এর ১০মে হুবলি জেলা কোর্টে বোমাবাজির ঘটনাতেও তার যুক্ত থাকার কথা জানায় সে। রাজ্য গোয়েন্দা দফতর সূত্রে খবর, জামবাগি ও তার দুই সঙ্গী রমেশ পাওয়ার এবং লিঙ্গরাস লালগার মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। বিস্ফোরণ হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে। যেখানে ঠিক দুই দিন পরেই সফদর নাগোরি সহ সিমি নেতাদের শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তাছাড়া সেই সময় কর্ণাটকে প্রথম দফার ভোটও ছিল। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই এই ঘটনার পেছনে সিমিকে অভিযুক্ত বানিয়ে দেওয়া হয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৩ জানুয়ারি ২০০৯)

৪৭. **৪ এপ্রিল ২০০৯:** মহারাষ্ট্রের বির জেলার অনামী গ্রাম ঘটসাভালিতে বিস্ফোরণ হয়। গ্রামে মাত্র ১ হাজার মানুষের মধ্যে মুসলিম ৭০ থেকে ৮০ জন। বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগে অশোক লানডে, ময়ূর লানডে এবং তুলসীরাম লানডেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেরার মুখে তারা জানায়, এলাকায় কোনো মসজিদ পছন্দ ছিল না তাদের, সেই কারণেই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা। (মারাঠি *সাপ্তাহিক শোধন*, ২৯ মে-৪ জুন ২০০৯) এই বিস্ফোরণের জেরে হয়তো বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু যে কারণে এই কাজ করা হলো, তা বিপজ্জনক।

মুসলিম সন্ত্রাসবাদের মতো অলীক ব্যাপার স্যাপারের ভূত না দেখিয়ে যদি আইবি ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসবাদীদের দিকে নজর দিত তাহলে হয়তো এই এত বিস্ফোরণের ঘটনা এড়ানো যেত, হাজার হাজার মানুষের প্রাণও বাঁচত। কিন্তু আইবি তাদের প্রভুদের কথামতোই এই সব ঘটনাকে এড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে, পরোক্ষ ভাবে এরাই ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে এবং মুসলিম যুবকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিতে গিয়ে, কীভাবে এই সব বিস্ফোরণের ঘটনায় আইবি অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করে তাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে, তা বোঝা যাবে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের ঘটনা খতিয়ে দেখলে। পরবর্তী অধ্যায়ে রইল আইবি-র সেকল কুকীর্তির কথা।

৪. বিস্ফোরণের কিছু তদন্ত

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বাঁচাতে এবং মুসলিমদের ওপর দোষ চাপাতে আইবি-র অযৌক্তিক ও ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ

গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে যখন দেশে মাঝেমধ্যেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছিল, আইবি শুধু তাদের নিজের যে কাজ, গোপন তথ্য সংগ্রহ, সেটাই শুধু করছিল তা কিন্তু নয়। তার থেকে বরং বেশিরভাগটাই তারা বিস্ফোরণের তদন্তে নাক গলাচ্ছিল। ঠিকমতো তথ্য দিয়ে বিস্ফোরণ আটকানো বা সময় মতো আইবি-র হস্তক্ষেপে দুর্ঘটনা এড়ানোর মতো একটিও ঘটনা অতীতে চোখে পড়েনি। সেই জায়গায়, প্রায় প্রত্যেকটি বিস্ফোরণের পরেই আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিকারিকরা তদন্তে হস্তক্ষেপ করত, এবং অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থা ও স্থানীয় পুলিশকে নিজেদের ধারণা মানতে বাধ্য করত। এজন্য তথ্য প্রমাণ নিজে হাতে তৈরি করত আইবি।

বিস্ফোরণের যে ঘটনাগুলোর তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বলে দাবি করা হয়, তার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আইবি-র সন্দেহজনক ভূমিকা থেকে থেকে। সেই সব ঘটনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল তা একটু খুটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে প্রায় প্রত্যেকটি জায়গায় আইবি-র তদন্তের একটা ধারা রয়েছে। নিচের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে তা বোঝা যাবে।

একদম শুরু থেকেই কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা সংগঠনের ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়া

অভিজ্ঞতা বলে, শেষ কয়েক বছরে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায়, কারো মৃত্যু হওয়ার আগে কিংবা আহতের ক্ষত শুকোনোর আগেই স্রেফ অনুমানের বশে তদন্তকারী সংস্থাগুলো দায় চাপিয়ে দিয়ে থাকে লশকর, হুজি, সিমি অথবা নতুন আমদানি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ওপর। অথবা দায় চাপানো হয় নেহাতই অজানা অচেনা কোনো মুসলিম সংগঠনের ওপর। আর এই ভাবনা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে থাকা সংবাদমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে এইভাবেই মুসলিমদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরি করে দিয়ে মুসলিম-বিরোধী পরিবেশ তৈরি করাই উদ্দেশ্য আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির।

যদিও এই দৌড়ে স্থানীয় পুলিশ, তাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডও থাকে, কিন্তু তাদের রিং মাস্টার সব কিছু নিজের মতো করে পাল্টে

দেয়। এমনকি স্থানীয় পুলিশ থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন আমলা এবং সরকারকেও আইবি তাদের আঙুলে নাচায়। তারা বোঝায়, প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, যে কোনো বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তই আইবি-র কোলের শিশু। এবং তারা যেটা বলবে, সবাই সেটাই অন্ধের মতো শুনতে ও করতে বাধ্য থাকবে, কারোর কোনো প্রশ্ন করা চলবে না।

আনঅফিসিয়ালি আইবি-ই তদন্তের রাশ হাতে নিয়ে নেয়

কোনো বিস্ফোরণের তদন্তের ক্ষেত্রে আইবি খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য পদক্ষেপ নিতে অভ্যস্ত নয়। তবু তদন্তের প্রত্যেক মোড়ে তাদের থাকাটা চাই-ই। এমনকি স্থানীয় পুলিশ যদি তদন্তের ঠিকঠাক রাস্তাতেও এগোয়, আইবি হুড়মুড় করে সেখানে ঢুকে পড়ে, নিজেদের তত্ত্ব খাড়া করে, নিজেদের মনগড়া তথ্য-প্রমাণ সামনে রাখে, পুলিশের মধ্যে থেকে নিজেদের লোকদের বেছে দল তৈরি করে ফেলে, তারপরও নাম কে ওয়াস্তে 'তদন্ত'। যদি বিস্ফোরণের পেছনে আইবি-র নিজের কিংবা কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের হাত থাকে, তাহলে তো এই গা জোয়ারি চলে আরও বেশি মাত্রায়।

যদি দেখা যায় স্থানীয় পুলিশ বা তদন্তকারী সংস্থা আসল সত্যিটা প্রায় বুঝতে পেরে যাচ্ছে, আইবি সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গল্প খাওয়াতে মনগড়া চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করে দেয়। আইবি-র হাতে যা ক্ষমতা রয়েছে, তা থেকে তারা যা ইচ্ছে করতে পারে। মোবাইল ফোন নম্বরের প্রিন্ট আউট, স্বীকারোক্তি, ফোনের কথোপকথন, বাজেয়াপ্ত করা বিস্ফোরক, অস্ত্রশস্ত্র বা নথি, অথবা যা ইচ্ছে যেটা মানুষ ও সংবাদমাধ্যমের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে, এমনকি এমনভাবে তারা তথ্য বিকৃতি ঘটিয়ে দেবে যে আদালতও কাউকে পুলিশ হেফাজতে পাঠাতে বাধ্য হবে। এই সব করার পর আচমকা স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার কাজে নাক গলাতে শুরু করবে আইবি, আনঅফিসিয়ালি তারাই তদন্তভার হাতে নিয়ে নিবে। এভাবেই শ'য়ে শ'য়ে মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা সহজ হয়ে যায় আইবি-র। এভাবেই সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে গোটা মুসলিম সমাজকে ভিলেন বানানো হয়, মুসলিম বিরোধী পরিবেশ তৈরি করিয়ে দেওয়া হয়। আইবি নিজেরা আড়ালে থেকে মুসলিমদের খতম করার জন্য এগিয়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ ও এটিএস, সিট-এর মতো স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থাদের। এমনকি সিবিআই-কেও এই ফাঁদে ফেলে দেয় তারা। ফলে মুসলিম ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ সরকার আর পুলিশকেই সাম্প্রদায়িক বলে দোষারোপ করতে থাকে। অথচ এই ঘটনার আসল যারা মাথা, সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আর আইবি গোটা ব্যাপারটা টিভির পর্দায় দেখে মজা নেয়। কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী যখন কোনো বিস্ফোরণের সঙ্গে

জড়িত থাকে অথবা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে আইবি যখন সেই কীর্তিটি করে থাকে, তখনই শুধু তারা তদন্তে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

এনকাউন্টার—শূণ্যস্থান পূরণে আইবি-র চলতি অস্ত্র

কোনো বিস্ফোরণের ঘটনার তথ্য প্রমাণ বিকৃত করতে কিংবা কোনো ফাঁকফোকর যদি থেকে থাকে, তা সামাল দিতে এনকাউন্টার আইবি-র কাছে বড় অস্ত্র। এনকাউন্টারের আগে যে কোনো 'সন্ত্রাসবাদী'কে দিয়ে আইবি কিছু কাজ করায়। যেমন ডাইরি লেখায়। তাতে লেখা থাকে নাম-ধাম, ফোন নম্বর, তার 'সাঙ্গোপাঙ্গো' বা 'কে' তার সাথে যোগাযোগ রাখে, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ নিতে 'কোথায় কোথায়' সে গিয়েছিল, তার সংগঠনের 'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা' এই সব। যাদের নাম সে লিখল তাদের সাথে তাকে কথা বলাতে বাধ্য করাতে হয়। শূণ্যস্থান পূরণে তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করানো হতে পারে। কারণ এনকাউন্টারের পরে তো এই সব প্রমাণই চাই। যেমন বিস্ফোরক, অস্ত্র, জিহাদি সাহিত্য, কিছু কিছু লেখা আবার সে ডাইরিতে নিজের হাতে লিখে রাখবে, মোবাইল ফোনে বিশেষ বিশেষ কারোর সাথে কথা বলবে, আর এই সব তথ্য নাকি ঘটনাস্থল থেকে 'উদ্ধার' হবে।

আইবি-র কাছের মানুষ যেমন দিল্লির স্পেশাল সেল, উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ, মহারাষ্ট্র এসটিএফ, রাজস্থানের সিট, মধ্যপ্রদেশ পুলিশ, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের একাংশে, কর্ণাটক পুলিশের একাংশ, হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ তাদের কাজে সাহায্য করে থাকে। এনকাউন্টারের সবথেকে নিরাপদ জায়গা হলো কাশ্মীর। এনকাউন্টার সেখানে প্রায় নিয়মিত ঘটনা। মুম্বাইয়ে ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ড, আহমেদাবাদ-সুরাট মামলা, ২০০৮ দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ড, ২০০৬ সঙ্কট মোচন বিস্ফোরণ, উত্তরপ্রদেশ আদালতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, জয়পুর মামলার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছে আইবি।

ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে তথ্যসূত্রকে বিকৃত করার অপচেষ্টা

ধরা যাক, প্রাথমিক তদন্তের সময় স্থানীয় পুলিশের হাতে ঘটনাস্থল থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র মিলে গেল, সেই সূত্র ধরে এগোনো বা তদন্তের একটা যুক্তিগ্রাহ্য সমাপ্তিতে পৌঁছানোর বিষয়টাতে বাধা দেয় আইবি। যদি সেই তথ্যসূত্র কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের দিকে আঙুল তুলতে শুরু করে দেয়, অথবা সেইসব যদি আইবি-র খাড়া করা তত্ত্বের সঙ্গে খাপ না খায়, তাহলে মুশকিল। তথ্যসূত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে পুলিশের তদন্ত বানচাল করে দেওয়া হয়। ঠিক

যেমনটা হয়েছিল ২০০৬ মুম্বাই ট্রেন বিষ্ফোরণকাণ্ড, ২০০৭ হায়দরাবাদ মক্কা মসজিদ বিষ্ফোরণকাণ্ড, ২০০৭ আজমির শরিফ বিষ্ফোরণকাণ্ডের ক্ষেত্রে।

তদন্তের গতিপথ ঘন ঘন বদলে ফেলে আইবি

অনেক ক্ষেত্রেই আইবি নিজের একটা তত্ত্ব খাড়া করার পর তদন্তকারী সংস্থাদের হাতে দিয়ে দেয়। আর সেই পথে হাঁটতে গিয়ে এমন কিছু পরস্পরবিরোধী তথ্য উঠে আসে যে, তাতে হোঁচট খেতেই হয়। সেই সব ঘটনায় আইবি জামাকাপড় বদলের মতো অবস্থান পাল্টায়। কিছু কিছু ঘটনায় এই বদলের বিষয়টা এক আধবার নয়, দুবার বা তারও বেশি হয়ে থাকে। যদি সেই তদন্তকারী সংস্থা আইবি-কে খুব একটা পাত্তা না দেয়, তাহলে একটাই তদন্তে দুরকম তত্ত্ব পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মুখ পুড়তে থাকে আইবি-র। মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ড, হায়দরাবাদ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণকাণ্ড, আজমির শরিফ বিষ্ফোরণকাণ্ড, উত্তরপ্রদেশে ধারাবাহিক বিষ্ফোরণকাণ্ড কিংবা সঙ্কটমোচন বিস্ফোরণকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই হয়েছিল।

চার্জশিটে বিস্তর ফাঁকফোকর

যদি আইবি-র হাতে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি ধরা পড়ে যায়, তাহলেই প্রমাণ বিকৃত করার সব রকম ফন্দিফিকির শুরু করে দেয় আইবি। যেখানে বেশিরভাগ বিষ্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত মিথ্যের ওপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে, সে কারণে যে চার্জশিট পেশ হয় সেটা বহুরোগ জর্জরিত। বিস্তর ফাঁকফোকর থেকে যায় তাতে। বহু কিছু হেরফের করা হয় এবং এনকাউন্টারের ঘটনাও থাকে। কিন্তু আইবি-র তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, কারণ এতে মুসলিম সম্প্রদায়কে হেয় করার আইবি-র যে লক্ষ্য সেটা সফল হয়ে যায়। মামলা চলতে থাকে, অভিযুক্তকে বহু বছর ধরে জেলে ফেলে রাখা যায়।

প্রায় প্রত্যেকটা বিষ্ফোরণের তদন্তের একই রকম পদ্ধতি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এমন কয়েকটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তার কিছু বিশ্লেষণ রইল।

❖ মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ড ২০০৬ (১১ জুলাই ২০০৬)

দুই সমান্তরাল তদন্ত ও তত্ত্বের কথা, যেখানে আসল সন্ত্রাসীরাই ধরা ছোঁয়ার বাইরে

শুরুর দিন থেকেই মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তিদের ওপর দোষারোপ

১. একদম শুরুর দিন থেকেই এই ঘটনার পেছনে সিমি সদস্যদের হাত রয়েছে বলে দাবি করে আসছিল আইবি। (অফাটারনুন, মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)

২. লশকর-ই-তাইয়েবা এবং সিমির হাত রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের। (*মিড-ডে*, মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)

৩. রাহিল, ফাইয়াস কাগজি, জয়নামুদ্দিন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল বলে চিহ্নিত করা গিয়েছিল। (*মিড-ডে*, ১২ জুলাই ২০০৬)

৪. কাঠমান্ডুতে ৪ জন পাকিস্তানিকে গ্রেফতার করে নেপাল পুলিশ। *রেডিফ.কম*, ১২ জুলাই ২০০৬)

৫. হায়দরাবাদ থেকে ৩ সিমি সদস্যকে গ্রেফতার। (*এশিয়ান এজ*, মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)

৬. বিস্ফোরণের ৪ দিন পর শহরের মাহিম এলাকা থেকে কমপক্ষে ২৫০ জনকে আটক করা হয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ১৫ জুলাই ২০০৬)

বকলমে তদন্তের দখলদারি আইবি-র হাতে

তদন্তের দায়িত্ব দখলে নিয়ে নিয়েছিল আইবি। চরম গোপনীয়তা বজায় রাখছিল তারা। খবর ছিল একমাত্র এটিএস প্রধান কেপি রঘুবংশীর কাছে। আর কেউ এই ঘটনার তদন্ত নিয়ে কিছুই জানতে পারছিল না। (*দৈনিক সকাল*, পুনে, ২২ জুলাই ২০০৬)

অন্যান্য প্রতিবেদন

১. একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও একজন আহত ব্যক্তির দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী সন্দেহভাজনদের ছবি এঁকে ফেলা হয়েছে। (*রেডিফ.কম*, ১২ জুলাই ২০০৬)

২. সিপিআই (এম) পলিটব্যুরো সদস্য ও বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সন্দেহপ্রকাশ করেছেন, ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ডে হিন্দু উগ্রপন্থীদের হাত রয়েছে (*রেডিফ.কম* ১৫ জুলাই ২০০৬)

৩. জঞ্জালের মধ্যে আরডিএক্স, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং তেল মিলেছে বলে রিপোর্ট ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের (*এশিয়ান এজ*, মুম্বাই, ১৭ জুলাই ২০০৬)

তদন্তের নিষ্পত্তি নিয়ে এটিএস-এর দাবি

১. ২০ জুলাই বিহার থেকে কামাল আহমেদ নামে একজনকে এবং ২৯ জুলাই মুম্বাইয়ের মীরা রোড থেকে এহতেশাম নামে দুজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করে এটিএস (পড়ুন আইবি)। এর নারকীয় পরিকল্পনায় তাদের সঙ্গে আর কারা কারা ছিল, নার্কো টেস্টে সেই সব কথা বলে দেয় ধৃতরা। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরও ৪ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে এটিএস। ধৃতরা হলো মুহাম্মদ সাজিদ, মুহম্মদ সফি (দুজনের মুম্বরার বাসিন্দা), ওয়াজিহুদ্দিন শেখ (কাশী মীরর বাসিন্দা) এবং মুহাম্মদ মাজিদ শেখ (কলকাতার বাসিন্দা)। এই কজনকে গ্রেফতার করার পরেই এটিএস দাবি করে তারা তদন্তের নিস্পত্তি করে ফেলেছে। পাকিস্তানের নাগরিকদের কাছ থেকে বিস্ফোরকের জিনিসপত্র পেয়ে ধৃতরাই ট্রেনে বোমা রেখেছিল বলে দাবি করা হয়। এদের মধ্যে মাজিদ শেখ লস্করের স্লিপার সেলের সদস্য ছিল বলে সন্দেহ। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬)
২. মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার এ এন রয় বলেছিলেন, এদের মধ্যে একজন পাকিস্তানি ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে নামতেই পারেনি। ফলে খার স্টেশনে বিস্ফোরণে তারও মৃত্যু হয়। তার ছিন্নভিন্ন দেহের কোনো দাবিদার এখনও মেলেনি। মৃতের মুখের পুনর্গঠন ও ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজনের নার্কো পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন ওই মৃতদেহ সালিমের যে পাকিস্তানের লাহোরের বাসিন্দা। (দ্য হিন্দু মুম্বাই, ১ অক্টোবর ২০০৬)
৩. নয়াদিল্লিতে কর্মরত একজন আমলা বলেছিলেন, বিহার থেকে ঘটনার প্রথম অভিযুক্ত কমল আনসারি গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানের সালিম (সাতটি বিস্ফোরণের একটিতে যার মৃত্যু হয়েছিল) এবং মুহাম্মদ আলি (২০০৬ আগস্টে অ্যান্টপ হিলে এনকাউন্টারে যার মৃত্যু হয়)-র গতিবিধির তথ্য জড়ো করতে শুরু করে দিয়েছিল। মুম্বাই পুলিশ কমিশনার রয় তার আগেই অবশ্য বলে দিয়েছিলেন যে বিস্ফোরণের ঘটনায় আইএসআই-এর হাত রয়েছে। কেন্দ্রও মহারাষ্ট্র সরকারের তত্ত্ব সমর্থন করে। ৪ অক্টোবর ২০০৬-এ ধারাবাহিক

বিস্ফোরণে আইএসআই-এর যোগসাজশের কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে মহারাষ্ট্রের শীর্ষ পুলিশ অধিকারিকরা রিপোর্ট দেয়। জানানো হয়, ধৃতরা কোথায় কোথায় গিয়েছিল, কার সাথে কথা বলেছিল, পাকিস্তানে লশকর টাকা লেনদেন করেছিল এবং একজন অভিযুক্তের বাড়ি থেকে আরডিএক্স মিলেছিল। এই সব তথ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই তাদের রিপোর্ট ।

৪. তথ্যপ্রমাণের জেরে যেটা দাঁড়ালো, সেটা হলো ক) বিস্ফোরণের মূলচক্রী ছিল আইএসআই খ) বিস্ফোরণে সরাসরি যুক্ত ছিল ১১ জন পাকিস্তানি নাগরিক গ) পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর ক্যাম্পে তারা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। এই তথ্যই স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে দিয়েছিল মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার এ এন রায় এবং এটি এস প্রধানকে পি রঘুবংশী। (*সকাল*, পুনে, ৫ অক্টোবর ২০০৬)

৫. সূত্রের খবর, বিহারের মধুবনী জেলার প্রায় এক ডজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অভিযুক্ত কামালের। কার কার সাথে কেমন যোগাযোগ, তা তদন্ত করে দেখছে এটিএস এবং আইবি-র আধিকারিকরা। *রেডিফ.কম*, ১১ অক্টোবর ২০০৬)

এটিএস-এর দায়ের করা চার্জশিট

পরে আদা লতে এই ঘটনায় অভিযুক্ত ধৃত ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে এটিএস। চার্জশিটে আরও ১৫ জনকে (১০জন পাক নাগরিক সহ) পলাতক হিসেবে দেখানো হয়।

তথ্যপ্রমাণ যে বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে তুলে ধরা হয় সেগুলো হলো- ১) ধৃতদের স্বীকারোক্তি। ২) তাদের ফোনের কথোপকথনের রেকর্ড। ৩) কয়েকজন ধৃতের নার্কো পরীক্ষা। ৪) এনকাউন্টারে মৃত পাকিস্তানি নাগরিকের ডিএনএ পরীক্ষা। ৫) এক অভিযুক্তের বাড়ি থেকে আরডিএক্স উদ্ধার ৬ গোয়ান্ডি থেকে বান্দ্রায়যে মারুতি গাড়িতে করে বোমা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই গাড়ি উদ্ধার এবং তাতে আরডিএক্স যে রাখা হয়েছিল, সেটারও প্রমাণ মিলেছে।

এছাড়া আর দুই 'গুরুত্বপূর্ণ' প্রত্যক্ষদর্শীর কথা বলে এটিএস। তাদের মধ্যে একজন পশ্চিম রেলওয়ের একজন কমিউটার। তার মতে ঘটনার দিন একজন সন্দেহভাজনের সঙ্গে তার ঝামেলা হয়েছিল। ওই সন্দেহভাজন ভারী কিছু জিনিস নিয়ে যাচ্ছিল, আর তার সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। সংবাদপত্রে সন্দেহভাজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর তিনি নিজেই এসে তাকে চিহ্নিত করে দেন। দ্বিতীয় একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। ঘটনার দিন তিনি গোয়ান্ডি থেকে

চার্চগেট পর্যন্ত তিন জনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে বেশ ভারী বাক্স ছিল। তারমধ্যে একটাকে সামনের সিটে রেখেছিল তারা। যেতে যেতে একসময় আচমকা ব্রেক কষতে হয়েছিল তাকে। তার জেরে একটা বাক্স পড়ে যায়। ট্যাক্সি ড্রাইভারের বয়ান, তাতেই পেছনের সিটে বসা থাকা যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তার ওপর চিল্লাতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই তার বেশ অবাকই লেগেছিল। কিন্তু সংবাদপত্রে তাদের ছবি দেখে ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার নিজে থেকে এগিয়ে এসেই তাদের চিহ্নিত করেন।

তথ্যপ্রমাণ কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

১. শহরের ভিড়ে স্টেশনে কারোর সাথে ঝামেলা হলো, আর সেই ঝামেলাবাজের মুখখানা সে মনে রাখল, এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? এবং সেই ঝামেলা হয়েছিল ব্যস্ততম সময়ে। তারপরেও আবার বেশ কয়েক সপ্তাহ পর শুধুমাত্র তার বিবরণ আর আঁকা দেখে সে নাকি তাকে চিনে ফেলল। আবার নিজেই নাকি সেটা গিয়ে পুলিশকে জানাল?

২. ট্যাক্সি ড্রাইভারের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য। বিস্ফোরণের পর কয়েকশো যাত্রীদের মধ্যে ওই কয়জন যাত্রীদের মুখই তার কীভাবে মনে থাকল?

৩. কখন কীভাবে সন্দেহভাজনদের মোবাইলে কথোপকথন রেকর্ড করা হলো? যদি বিস্ফোরণের আগে থেকেই তাদের ফোনের ওপর আইবি ও পুলিশের নজরদারি থাকত, তাহলে কেনো আগেভাগে তাকে গ্রেফতার করা হলো না? আর যদি বিস্ফোরণের পর তাদের ওপর নজরদারি শুরু হয়েছিল, তাহলে তা কীসের ভিত্তিতে? বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই কি কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করা হয়েছিল?

৪. MCOCA-র অধীনে যে বয়ান নেওয়া হয়েছিল তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, যেখানে MCOCA-র বেশ কিছু ধারা নিয়ে আপত্তি তুলে সুপ্রিমকোর্টে মামলা চলছিল?

৫. কারোর বিরুদ্ধে যদি অন্যান্য কোনো তথ্যপ্রমাণ না থাকে, তবে শুধুমাত্র নার্কো পরীক্ষার মাধ্যমে কি তাকে অভিযুক্ত বলে চালানো যায়?

৬. স্রেফ ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে কী করে বোঝা গেল সে পাকিস্তানি নাগরিক কি না? ওই ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে তার দেশ, ধর্ম কিংবা কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সে হাত ধরে আছে, সে সবের জানাশোনা হয়ে যায়?

৭. কারোর বাড়ি থেকে যে মুম্বাই পুলিশ আরডিএক্স উদ্ধার করেছিল, তা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? মুম্বাই পুলিশের যা কীর্তি, তাতে তারা যে কারোর বাড়ি থেকেই ইচ্ছেমতো যখন তখন আরডিএক্স উদ্ধার করে ফেলতে পারে।

এছাড়াও এই মামলার তদন্তে আরও বেশ কিছু সন্দেহজনক জায়গা রয়েছে। কারোর মাথায় সমান্যতমও বুদ্ধি থাকলে সে ধরে ফেলবে কীভাবে তথ্যপ্রমাণের হেরফের করা হয়েছিল। এমনকি তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন পর্যন্ত তথ্যপ্রমাণের এই হাল নিয়ে সন্তুষ্ঠ ছিলেন না। আর এই অদ্ভুত সব তত্ত্ব খাড়া করেছিল এটিএস। মূল কলকাঠিটি নেড়েছিল আইবি। নারায়ণন বলেছিলেন, "ধাঁধার কিছু অংশের হদিস মিলছে না, তথ্য প্রমাণ যা মিলেছে তা যে ত্রুটিশূণ্য, সেটা বলতে আমার নিজেরই অস্বস্তি হচ্ছে।" (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৩ অক্টোবর ২০০৬)

যেখানে ধাঁধার বেশ কিছু অংশ বেপাত্তা, যেখানে আইএসআই-এর যোগ থাকার কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই মেলেনি, সেখানে তৎকালীন মুম্বাই পুলিশ কমিশনার এ এন রায়ের, এভাবে মামলার সমাধান হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা উচিৎ হয়নি।

যেটা বিষয়, সেটা হলো মুম্বাই পুলিশ কমিশনারের এই মামলায় কোনো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। কারণ তার জায়গায় এই ঘটনা ঘটেইনি। তাছাড়া মুম্বাই পুলিশও এই মামলায় কোনো তদন্ত করেনি। বিস্ফোরণ হয়েছিল মুম্বাই রেলওয়ে পুলিশ কমিশনারের বিচারধীন এলাকায়। দ্বিতীয়ত, তদন্ত চালায় এটিএস, যার মহারাষ্ট্রের ডিজিপি-র নিয়ন্ত্রণাধীন। সে কারণে হয় রেলওয়ে পুলিশ কমিশনার বা এটিএস প্রধান, নয়তো ডিজিপি-র সাংবাদিক সম্মেলন করার কথা। কিন্তু দেখা গেল কোনো অজ্ঞাত কারণে মুম্বাইয়ের সিপি এ এন রায়কে সাংবাদিক বৈঠক করতে বলে আইবি নয়তো সরকার। একজন দুঁদে পুলিশ অফিসার হিসেবে তিনি শান্ত ভাবে এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতেই পারতেন, কিন্তু তিনিও তা করেননি। দুর্ভাগ্যজনক, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের নেতাদের এই বোধটি হয়নি যে এই ধরনের মামলায় আইবি তার নিজের ইচ্ছেমতো প্রভাব খাটিয়ে থাকে। এটা নেহাত আইএসআই বা পাকিস্তানের ওপর দোষ চাপানোর ফন্দি নয়, বরং ভারতীয় মুসলিমদের সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা তৈরি করা হয়। যাতে মুসলিমদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়ে যায় এবং তার জেরে সঙ্ঘ পরিবার ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির কীর্তিকলাপ অধরাই থেকে যায়। আর এই পরিস্থিতিতে ফায়দা তোলে তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি।

সংবাদমাধ্যমের কাছে আইএসআই যোগসাজশের কথা বলে অর্ধসত্য তুলে ধরে এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণের যথার্থতা প্রমাণ করতে না পেরে এটিএস আন্তর্জাতিক মহলে সরকারের মুখ পুড়িয়েছিল।

আইবি-র নতুন 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' তত্ত্ব নিয়ে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন

সম্প্রতি মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানায় ২০০৬ মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ডে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের একটি চক্রের হাত রয়েছে। এবং তারা সেই চক্রের হদিসও পেয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘোষণায় মুম্বাই এটিএসের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকে।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে যে পাঁচজন গ্রেফতার হয়েছিল, তার মধ্যে ৩ সন্দেহভাজন জঙ্গি স্বীকার করেছিল, তারা একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত, আর তারাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ২৪ সেপ্টেম্বর মুম্বাই থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সাদিক শেখকে। অভিযোগ, সে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সহ প্রতিষ্ঠাতা। সাদিক ও সাইফের সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছিল আরিফ শেখ। ২০০৮ এর ১৯ সেপ্টেম্বর দিল্লির বাটলা হাউস এনকাউন্টারে ধরা পড়েছিল আরিফ। এরাই ওই স্বীকারোক্তি করেছিল বলে দাবি। সাদিক ও আরিফ মুম্বাই পুলিশের কাছে দায় স্বীকার করেছিল, আর সাইফ দিল্লি পুলিশের কাছে। আতিফ আমিন ও মুহাম্মদ সাজিদসহ আর পাঁচ ব্যক্তির নাম জানিয়েছিল এরা। এদের মধ্যে আতিফ ও সাজিদ দিল্লি শ্যুট আউটে খুন হয়েছিল। শ্যুট আউটের পর গ্রেফতার হয়েছিল জীশান। সাইফের ভাই ড. শাহনওয়াজ খান ও আবু রশিদ পালিয়ে যায়।

সূত্রের খবর, উল্লেখিত ওই ১৩ জন হয় স্লিপার সেলের সদস্য, নয়তো চাপে পড়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে। কিন্তু ক্রাইম ব্রাঞ্চ যে তিনজনকে জেরা করেছিল, আর বাকিদের এটিএস আগে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তাদের মধ্যে বয়ান খতিয়ে দেখলে বেশ গরমিল পাওয়া যাবে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের স্লিপার সেল বা তারা একই গোষ্ঠীর সদস্য বলে যে তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল তা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ দুই তদন্তকারী সংস্থার জেরা থেকে পাওয়া বয়ান দুরকম, আর তাতে বিস্তর অসঙ্গতি। কীরকম দেখুন,

১. এটিএস-এর মতে ফয়জল শেখ ও আসিফ খান, বশির খান হলো ঘটনার মূল চক্রী। অথচ মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের দাবি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সহ প্রতিষ্ঠাতা সাদিক শেখ হলো মূল ষড়যন্ত্রকারী।
২. চেম্বুরের গোয়াভির চিতাহ ক্যাম্পে মুহাম্মদ আলির বাড়িতে বিস্ফোরক জড়ো করা হয়েছিল বলে দাবি করে এটিএস। কিন্তু ক্রাইম ব্রাঞ্চ

জানায়, সেউরি এলাকায় আবু রশিদের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে ওই কাণ্ডটি হয়।

৩. এটিএসের তত্ত্ব অনুযায়ী আসিফ খান, বশির খান অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আর ডেটোনেটর আনে। আর কামাল আনাসির এক পাকিস্তানি নাগরিক এহসানুল্লাহর কাছে থেকে আরডিএক্স জোগাড় করে। অন্যদিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের দাবি, রিয়াজ ভটকল ওরফে রোশান খান সেউরির ফ্ল্যাটে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নিয়ে আসে। বিস্ফোরকে আরডিক্স-এর অস্তিত্বই ছিল না।

৪. এটিএসের মত অনুযায়ী বিষ্ফোরণের জন্য টাইমার সার্কিট তৈরি করেছিল সাজিদ মারগুম আনসারি, যেখানে ক্রাইম ব্রাঞ্চের মত, ইলেকট্রিশিয়ান আরিফ শেখ চিতাহ ক্যাম্পে তার বাড়িতে বসে এই সার্কিট বানিয়েছিল। বিষ্ফোরণের দুদিন আগে আরিফই ওই টাইমার সেউরির ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে।

৫. এটিএস-এর চার্জশিটে বলা হয়, গোয়ান্ডিতে পাক যোগাযোগকারী শেখ মুহাম্মদ আলির বাড়িতে বোমা তৈরি হয়েছিল। আশিফ খান, বশির খান, সাজিদ আনসারি, এহতেশাম সিদ্দিকি তাকে সাহায্য করে। উল্টোদিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের দাবি, সাদিক শেখ, মুহাম্মদ সইফ আর তার ভাই শাহনাওয়াজ খানের সাথে হাত মিলিয়ে জীশান শেখ, আরিফ শেখ, মুহাম্মদ সাজিদ, আবু রশিদ এবং আতিফ আমিন বোমা তৈরি করে।

৬. এমনকি যে ব্যক্তি ট্রেনে বোমা রেখেছিল এবং তার আগে বোমা বয়ে এনেছিল বলে দাবি করা হয়েছে, দুই তদন্তকারী সেক্ষেত্রে দুরকম নামের উল্লেখ করেছে।

এছাড়াও দিল্লি পুলিশকে সাইফ বলে, তারা জানেই না ওই ১৩ জন কারা। (*পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ৩ অক্টোবর ২০০৮ এবং *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* মুম্বাই ১৫ অক্টোবর ২০০৮)

বিচারে যখন ধৃত ১৩ জনের সঙ্গে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের কোনো যোগসাজশ প্রমাণ করা গেল না, আইবি নাকি পুরো হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রেই এই খবর মিলেছিল। কিন্তু আসল ঘটনা হলো আইবি-র এত চমকে যাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। কারণ দুটি তদন্তই এগিয়েছিল আইবি-র লেখা চিত্রনাট্য নির্ভর করে। প্রথমে ছিল আইএসআই, এবং আইবি-র অন্তরঙ্গ ব্যক্তি কে পি রঘুবংশী দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল এটিএস মুম্বাই। পরেরটায় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের গল্প ছিল। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের প্রধান রাকেশ মারিয়া, আইবি-র আরও বড় ভক্ত ছিল।

কিন্তু অবাক করার ব্যপার হলো এটাই, যে এভাবে তদন্তের রাস্তা পাল্টালে যে তথ্য উঠে আসবে তাতে MCOCA আদালতে অভিযুক্ত ১৩ জনের বিচার যে ধাক্কা খাবে সেটা জানা সত্ত্বেও আইবি কেনো সেই কাজ করেছিল? আইবি-র ব্যবহার কিন্তু এক্ষেত্রে বেশ সন্দেহজনক। আইবি-র পুরোনো অভ্যেস বলে, যে তারা মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে এক্ষেত্রে এগোতেই দিত না। যদি ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্ত সত্যি হতো, তাতেও না। এবং এটা বলা হতো যে যেহেতু আইবি এই ঘটনায় পাকিস্তান ও আইএসআই-এর গল্প ফেঁদে দিয়েছে, এখন যদি অন্য তত্ত্ব চলে আসে তাতে সরকারের মুখ পুড়বে। ঠিক এরকমটাই সমঝোতা হয়েছিল বিস্ফোরণকাণ্ডের ক্ষেত্রে। যেখানে আইবি-র কাছ থেকে তথ্য পেয়ে ভারত সরকার পাকিস্তান, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের কাছে দরবার করেছিল, এর পেছনে আইএসআই-এর হাত রয়েছে। পরে হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে এটিএস যখন ২০০৮-মালেগাও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তভার নিল, তখন বোঝা গেল যে গোটাটাই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির শয়তানি কারবার। কারকারে আইবি-র দাসত্ব করেননি। তাই আইবি তড়িঘড়ি মাঠে নেমে পড়ে। সরকারকে তারা বোঝায় যে এখন যদি তারা আইএসআই তত্ত্ব থেকে সরে এসে নতুন কিছু বলে তবে, আমাদেরই ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ক্ষুণ্ণ হবে (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ১৮ নভেম্বর ২০০৮)। অদ্ভুত ভাবে মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে ক্রাইম ব্রাঞ্চ যখন নতুন তদন্তের রাস্তায় গেল, তখন আইবি কিন্তু তেমনতর কাজটি করল না। উল্টো নতুন তত্ত্বটিকে আইবি বেশ ভালোভাবেই নিল। এখানেই তাদের ভূমিকা আরও সন্দেহজনক ঠেকে। বিশেষ করে এটা মাথায় রেখে যে সমঝোতা বিস্ফোরণকাণ্ডে এটিএস-এর তথ্য সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল, অথচ মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ডে তখনও ধোঁয়াশাই বজায় ছিল। এই ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে, যুক্তি দিয়ে বোঝা দরকার।

আহমেদাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ডের পর কোনো অজ্ঞাত কারণে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের প্রধান রাকেশ মারিয়া পুরোপুরি আইবি-র হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিলেন। যে কোনো তদন্তের ক্ষেত্রে তিনি আইবি-র হুকুমই তামিল করতেন। ফলে তদন্তে নতুন নতুন কী তথ্য মিলছে তা আইবি-র গোচরে ছিল না, সেটা কোনো ভাবেই বলা যাবে না। অন্যদিকে এই নতুন তত্ত্ব যে আইবি-রই মস্তিষ্ক প্রসূত হতে পারে, সে ভাবনায় অবিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই। অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এই তথ্যবিকৃতির জেরে মামলায় প্রভাব পড়বে, এবং তাতে সরকার আন্তর্জাতিক মহলের কাছে অপদস্ত হবে জানা সত্ত্বেও আইবি এই কাজটা করল কীভাবে। মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণে আরডিএক্স তত্ত্ব দিলে যদি কিছু প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতা ফেঁসে যায়, সেই কারণেই কি আরডিএক্স ব্যবহৃত হয়নি বলে

প্রমাণ খাড়া করতে চেয়েছিল আইবি? ২০০৩ সালে মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে এটিএস-এর তদন্তে জানা গিয়েছিল লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিতের চুরি করা আরডিএক্স বিভিন্ন বিস্ফোরণকাণ্ডে ব্যবহার হয়েছে। সেই ঘটনা চাপা দিতেই কি আরডিএক্স তত্ত্ব থেকে পিছু হঠেছিল আইবি? কিন্তু মুম্বাই ট্রেন বিষ্ফোরণকাণ্ডের ক্ষেত্রে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরাই যেহেতু আরডিএক্স থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাই সেই তত্ত্ব থেকে পিছু হঠাটা আইবি ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের পক্ষে খুব একটা সহজ ছিল না। (*এশিয়ান এজ,* মুম্বাই, ১৭ জুলাই ২০০৬)। কিন্তু এটাই মিথ্যে প্রমাণ করা গিয়েছিল এক অভিযুক্তের (সাদিক শেখ) বয়ানে। এই পরিস্থিতিতে আইবিও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ নতুন তত্ত্ব খাড়া করতে গিয়ে কী কী করেছিল, সেটা বেশ আকর্ষণীয় ব্যাপার।

পক্ষপাতদুষ্ট, রহস্যজনক তদন্ত

দুটি তদন্তে মেলা তথ্যই বেশ সন্দেহজনক। দুটি ঘটনাতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জোরদার কোনো প্রমাণ মেলেনি। গোটাটাই অভিসন্ধিমূলক।

১. এটিএস-এর প্রথম তদন্ত

১. আইবি-র মুসলিম বিরোধি মানসিকতা নিয়েই ভুলভাল ভাবে তদন্ত শুরু হয়েছিল। সেই কারণে শুরুর দিকেই বিস্ফোরণকাণ্ডের জন্য কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল সিমি-কে (*আফটারনুন,* মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)। স্থানীয় পুলিশতো আবার সিমির সঙ্গে সঙ্গে লশকর-ই-তাইয়েবাকেও সন্দেহ করেছিল। (*মিড ডে,* মুম্বাই, ১২ জুলাই ২০০৬)

২. বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু হিন্দু মৌলবাদীদের জড়িত থাকার যে অভিযোগ তুলেছিলেন তা নিয়ে কোনো তদন্তকারী সংস্থারই কোনো উচ্চবাচ্য ছিল না। (*রেডিফ.কম,* ১৫ জুলাই ২০০৬)

৩. কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া হয়নি, (ক) গুজরাট দাঙ্গার চার বছর পর এই বিস্ফোরণের ঘটনা কোনো প্রতিশোধের ব্যাপার হতে পারে না (খ) যদি তাই হতো, তাহলে বিস্ফোরণ নিশ্চয়ই কোনো হিন্দু অধ্যুষিত কিংবা গুজরাটি অধ্যুষিত স্টেশনে হতো, যেমন চার্চগেট থেকে দাদর এবং ভায়েন্দার থেকে ভিরার (গ) অথচ বেশিরভাগ বিস্ফোরণ হয়েছিল মুসলিম অধ্যুষিত স্টেশনগুলোতে। মাহিম থেকে মীরা রোডের মাঝে।

৪. দাদর স্টেশনের ঠিক পরেই যেভাবে বিষ্ফোরণ হলো, তা সময় নিয়ে ভাবার দরকার ছিল। দাদর মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আরএসএস-এর

শক্ত ঘাঁটি। বোমা রাখা হয়েছিল দিনের প্রথম ট্রেনটিতে, যাতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ্যবাদী অধ্যুষিত আরও দুটি স্টেশন ভিলে পার্লে ও মালাড-কে এড়িয়ে যাওয়া যায়।

৫. নান্দেঢ় বিস্ফোরণকাণ্ডে জড়িত আরএসএস-ভিএইচপি ও বজরং দলের কর্মীদের জেরা করা হয়নি।

৬. ঘটনার কয়েক দিন পর ভায়েন্দারের কাছে সমুদ্রে চার অমুসলিম যুবকদের একটি ব্যাগ ছুঁড়ে ফেলতে দেখা গিয়েছিল। তাদের কোনো খোঁজ করে জেরা করা হলো না।

৭. আহমেদনগরের একজন মহিলা লেকচারার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাজে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তার দাবি ছিল, তিনি গণেশ খান্ডেরাও নামে ৭/১১-র এক সন্ত্রাসবাদীকে চেনেন। অওরঙ্গাবাদের আশানগরে সে থাকে। কিন্তু এটা নিয়ে কোনো বিস্তারিত তদন্তই হলো না। টেলিফোন অপারেটর অভিযোগকারিণীর নামটি লিখতে ভুল করে, ফলে তার হদিসই মেলেনি। পরে ওই মহিলা ফের অওরঙ্গবাদ পুলিশে ফোন করে তার আসল নামটি জানান। অভিযুক্তদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তিনি চিঠিও পাঠান। তা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁকে কোনো জেরা করেনি। উল্টো পুলিশ অভিযোগকারিণীর ভাই আর বাবাকে জেরা করে এই সিদ্ধান্তে আসে, যে খান্ডেরাওকে শিক্ষা দিতেই ওই মহিলা এই কাজটি করেছেন। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিয়ে না করায় এভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা চলেছে। ব্যাস, মামলা বন্ধ (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১৮ অগাষ্ট ২০০৬) ।

৮. এই ঘটনায় যদি ধরেও নেওয়া যায় ওই মহিলা সর্ম্পকে নিয়ে হতাশ ছিলেন, তাহলেও তিনি যা বলছিলেন তার সব মিথ্যে তো নাও হতে পারে। তিনি একজন লেকচারার। তিনি এটা নিশ্চয়ই জানবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও পুলিশের কাছে ভুল তথ্য দিলে কতটা, কী পরিমাণ বিপদ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, যখন তিনি জানতে পারেন পুলিশের কাছে তার ভুল নাম গিয়েছে তিনি যেচে তার নাম ঠিক করান ও চিঠিও দেন। এরপর নিশ্চয়ই পুলিশের বিস্তারিত তদন্ত করার দায়িত্ব ছিল। গণেশ খান্ডেরাওকে খুঁজে বের করতে হতো। ওই মহিলার দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে জেরা করতে হতো। সে রকম হলে ওই মহিলার সামনা সামনি বসিয়েও তাকে জেরা করতে পারত পুলিশ। কিংবা তার চিঠির ভিত্তিতেও এই কাজ হতে পারত। অথচ পুলিশ ঠুটো জগন্নাথ হয়ে থাকলো। উল্টোদিকে মক্কা মসজিদ (হায়দরাবাদ) বিস্ফোরণকাণ্ডের

ক্ষেত্রেও এরকম একটি তথ্য দিয়েছিলেন এক মুসলিম ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী। পুলিশ তড়িঘড়ি তদন্তে নেমে সেই ব্যক্তির বাড়ি থেকে দেশি রাইফেল উদ্ধার করে। পুলিশ তাকে অস্ত্র মামলায় বেশ কয়েকদিন জেলে বন্দি রাখে। পরে অবশ্য জানা যায় ওই বিস্ফোরণের সঙ্গে তার কোনো যোগযোগ নেই। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২৮ মে ২০০৭)। পুলিশ যে কী পরিমাণ পক্ষপাতদুষ্ট, এই ঘটনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৯. মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দিকেই যখন ধীরে ধীরে অভিযোগের তীর ঘুরতে লাগল, আইবি-র হাত দিয়ে সঙ্ঘ পরিবার মহারাষ্ট্র পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে ঘোষণা করালো, ঘটনায় আইএসআই-এর হাত রয়েছে। অথচ এই দাবির সপক্ষে কোনো ঠিকঠাক তথ্য প্রমাণ কিন্তু ছিলই না।

১০. এটিএস-এর চার্জশিটে অভিযুক্তদের সম্পর্কে অভিযোগের বিস্তারিত খতিয়ান দেওয়া ছিল। সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণের জন্য যাতায়াত, ষড়যন্ত্রের চেষ্টা, টাকা তোলা, বিস্ফোরণের জিনিসপত্র জোগাড় করা, স্টেশনে বিস্ফোরক বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে রাখা। সবই ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যাটা হলো সবই অভিযুক্তদের বয়ানের ওপর ভিত্তি করে।

১১. ঘটনার তিন মাস পরে এক অভিযুক্ত তদন্তকারীদের দাহিসারের কাছে রেললাইনের ধারে নিয়ে যায়। সেখান থেকে নাকি কিছু বিস্ফোরক উদ্ধার হয়। তিন মাস পরে...।

১২. যে অগুনতি সাক্ষীদের কথা বলা হয়েছিল, তাদের কারোর পরিচয়ই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

১৩. কীভাবে পাকিস্তানি নাগরিকের ছিন্নভিন্ন দেহকে আবার পুনর্গঠন করে ফেলল তদন্তকারীরা, যাতে অভিযুক্তরা তাকে শনাক্তও করে ফেলল? অন্তত মুম্বাই পুলিশ কমিশনার তাই বলেছিলেন। ওই ব্যক্তির মাথার খুলি কি অবিকৃত ছিল? মৃতের মুখের ছবি ছিল সামনে থেকে?

১৪. কার বয়ানের ভিত্তিতে মৃতের ছবি এঁকে প্রকাশ করা হলো, কোন প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানের জেরে তাকে শনাক্ত করা গেল সেসবের কিছুই কেউ জানে না।

২. মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের দ্বিতীয় তদন্ত

১. দ্বিতীয় তদন্তের গোড়াতেই বিস্তর গলদ। গোটাটাই অযৌক্তিক। এটা একটা নেহাত আজগুবি ঘটনা যে একটি মামলায় কেউ একজন

অভিযুক্ত, সে নিজে থেকেই দাবি করে বলে যে সে আরেকটার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে। শুধু তাই নয় পুলিশকে সে তথ্যও সে গড়গড় করে বলে দেয়।

২. এটিএস আগে যে ১৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল তাদের বয়ানের মধ্যে মিল বিশেষ ছিল না। এছাড়া ক্রাইম ব্রাঞ্চও যে ৩ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল, তাদের বয়ানেও গরমিল ছিল। ফলে তারা যে স্লিপার সেলের সদস্য বা তারা একই গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করত, তেমনটা মেনে নেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

৩. ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী বিস্ফোরণে আরডিএক্স ব্যবহার করার যে তত্ত্ব, ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে ধৃত কারোর স্বীকারোক্তির জেরে তা মোটেই বাতিল করে দেওয়া চলে না।

৪. ঘটনার আরও জটিল হয়ে যায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের করা চার্জশিটে। ২০০৮-এর অক্টোবরে গ্রেফতার হওয়া পাঁচ সন্দেহভাজন 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' জঙ্গির বিরুদ্ধে ওই চার্জশিট ফাইল হয়েছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে। তাতে কী কী সমস্যা ছিল?

৫. ফলে গোটা বিষয়টা ভীষণ জটিল হয়ে :গল আর তাতে আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির ষড়যন্ত্রের শিকড় আরও গভীরে গেল। দুটো তদন্তই আনঅফিসিয়ালি আইবি-ই চালালো, আর দিনের শেষে দেখা গেলো দুটিই ভুলে ভরা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেখা দরকার, ক) আইবি-র ওপরে এমন কি চাপ ছিল যে তাকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরতে হলো এবং খ) আসল অপরাধী তাহলে কে? যদি আইবি ছাড়া কোনো স্বাধীন সংস্থার হাতে প্রথম প্রশ্নের তদন্তভার যেত, তাহলে হয়তো এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও সেখান থেকেই পাওয়া যেত।

এর পরে কিছু বিশেষ তথ্যের উঠে আসা

আইবি এই গোলকধাঁধাঁ থেকে কীভাবে বেরিয়ে এসেছিল তা বলা বেশ কঠিন। কিন্তু এরপর কিছু সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে, বিশেষ বিশেষ কিছু তথ্য যেভাবে উঠে এলো, তা কিন্তু বেশ আকর্ষণীয়।

১. তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর চাপে শেষ পর্যন্ত মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের নকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন তৎকালীন মুম্বাই পুলিশ কমিশনার এ এন রয় এবং তৎকালীন এটিএস-এর ডিআইজি সুবোধ জয়সওয়াল। এরপর কয়েকজন এটিএস অফিসারের বদলি করিয়ে দেওয়া হয়। মানসিক চাপ সামলাতে পারেননি সৎ

অফিসার বিনোদ ভাট। আত্মহত্যা করেন তিনি (মারাঠি দৈনিক *শোধন*, মুম্বাই ২১-২৭ নভেম্বর ২০০৮। শিবসেনা মুখপত্র *দৈনিক সামনা*-র উদ্ধৃতি দিয়েছিল তারা)।

২. ২০০৯ এর ১৮ ফেব্রুয়ারি মহারাষ্ট্র এটিএস জানায়, ৭/১১ ধারাবাহিক বিস্ফোরণ তদন্তে অভিযুক্ত 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' সদস্য মুহাম্মদ সাদিক ইসরার আহমেদ শেখকে তারা হেফাজতে নিতে চায়। ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় সংগঠনের কী ভূমিকা ছিল সাদিকের কাছ থেকে তা খতিয়ে দেখতে চাইছিল এটিএস। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে ১৯, ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

৩. ২০০৬, ১১ জুলাই মুম্বাই ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়ে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন'—এর শীর্ষ নেতা সাদিক শেখের স্বীকারোক্তি এটিএস-কে বিড়ম্বনায় ফেলে। বছর দুয়েক আগে চার্জশিটে ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দিয়েছিল এটিএস। অথচ সাদিক ও 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র অন্যান্য সদস্যের নাম তাতে ছিল না। ২০০৯-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি নিউজ চ্যানেল সাদিকের স্বীকারোক্তির ভিডিও প্রকাশ করে। তাতে সে নিজে দাবি করে বিস্ফোরণের ঘটনায় সে ও তার সঙ্গীরা জড়িত ছিল। প্রেসার কুকারে বোমা রেখে তা ট্রেনে রাখার কথা জানায় সাদিক। স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছিল এটিএস। তারা দাবি করেছিল, সাদিক তদন্তকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

৪. ট্রেন বিস্ফোরণের ঘটনায় 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র সহ প্রতিষ্ঠাতা সাদিক শেখকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছিল এটিএস। তাদের ইঙ্গিত ছিল, এই ঘটনার সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র জড়িত থাকার প্রমাণ তাদের কাছে নেই। স্বাভাবিক, ক্রাইম ব্রাঞ্চের আঁতে ঘা লেগেছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ১৭ মার্চ ২০০৯)

ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, দুটো অসত্য কখনো একটা সত্য তৈরি করতে পারে না।

❖ মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ড (৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে স্থানীয় পুলিশের সঠিক তদন্ত বিপথে নিয়ে গেল এটিএস (পড়ুন আইবি)

আইবি-র হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ডের সঙ্গে অনেকটাই মিল পাওয়া যাবে মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তের। এখানেও আচমকাই বিস্ফোরণের ধাঁচটা পাল্টে গিয়েছিল মুম্বাইয়ের মতোই।

প্রাথমিকভাবে স্থানীয় পুলিশের সঠিক তদন্ত

প্রাথমিক ভাবে নাসিক জেলা পুলিশের তদন্ত একদম ঠিকঠাক পথেই এগোচ্ছিল:

১. দুটো বিকল্প খোলা রেখে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। হয় বজরং দল নয়তো লশকর এই বিস্ফোরণের পেছনে জড়িত থাকতে পারে। তদন্তে তারা দেখল, পারভানি এলাকার মুহাম্মদিয়া মসজিদ এবং পুর্না ও জালনার মসজিদে যেভাবে বজরং দল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, একই কায়দায় বিস্ফোরণ হয়েছে এখানেও। ডিজিপি পসরিচা সংবাদদাতাদের এই ভাবনাটি জানিয়েছিলেন। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

২. বিস্ফোরণের তিন দিন পরে পুশিল নিশ্চিত হলো, তদন্ত একদম ঠিক পথেই এগোচ্ছে। কারণ যে দোকান থেকে সাইকেলে করে বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই দোকানটি চিহ্নিত করে ফেলেছিল তারা। (*আফটারনুন*, মুম্বাই, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

৩. নাসিক রেঞ্জের আইজিপি পি কে জৈন দুজনের মুখের ছবি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। বিস্ফোরণের জন্য ওই দুজন দুটি বা তিনটি সাইকেল ব্যবহার করেছিল। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, পুলিশ দু-তিনটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে তদন্ত চালাচ্ছে। (*এশিয়ান এজ*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

৪. বিস্ফোরণের আগে ও পরে ল্যান্ডলাইন ও মোবাইল থেকে যে যে ফোন করা হয়েছিল তা হাতে এসে গিয়েছিল। যা প্রমাণ হওয়ার হয়েও গিয়েছিল। (দৈনিক *পুধারি*, পুনে ১০সেপ্টেম্বর ২০০৬)

৫. হিন্দু সংগঠনগুলো আচমকাই আত্মরক্ষামূলক আচরণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভিএইচপি-র সাধারণ সম্পাদক প্রবীন তোগাড়িয়া বিস্ফোরণের পেছনে কোনো হিন্দু সংগঠনের জড়িত থাকার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র মসজিদে বিস্ফোরণ হয়েছে বলেই হিন্দু

সংগঠনগুলোর ওপর দায় চাপানোর বিষয়টি ঠিক নয়। (*পুধারি*, পুনে ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

৬. বিস্ফোরণের পাঁচ দিন পর পুলিশ ২০ জনকে আটক করে। এদের মধ্যে সবাই হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার বাসিন্দা। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

বোঝাই যাচ্ছে যুক্তিগত ও পেশাগত ভাবেই স্থানীয় পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

এটিএস-এর মাধ্যমে আইবি-র হস্তক্ষেপ

সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী দেখা গেছে এটিএস-এর তৎকালীন প্রধান কে পি রঘুবংশী ধীরে ধীরে গোটা তদন্তের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। এই রঘুবংশী মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকেই ধীরে ধীরে আইবি-র হাতের পুতুল বনে যান। সেই রঘুবংশী আসার পর মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তের ধাঁচটাই পাল্টে যেতে শুরু করেছিল।

১. মুম্বাই এটিএস-এর একজন অফিসার দাবি করেছিলেন, মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ডের থেকে এই ঘটনা আলাদা হলেও সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীরা জইশ-ই-মুহাম্মদের। কারণ যে বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল তা মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ডের বিস্ফোরকগুলোর মতোই প্রায়। (*আফটারনুন*, মুম্বাই, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

২. মালেগাঁও বিস্ফোরণের দুই দিন পর মুম্বাইয়ের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ ও মালেগাঁও বিস্ফোরণের মধ্যে অজস্র মিল খুঁজে পেয়ে গেল। (*দ্য স্টেটসম্যান*, মুম্বাই, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬)

৩. ২০০৬, ৩০ অক্টোবর এটিএস সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করে দিল তারা তদন্ত গুটিয়ে ফেলেছে। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে সিমি-র হাত রয়েছে। আর এই ঘটনায় তারা সিমি সদস্য নুরাল হুদা বলে একজনকে গ্রেফতারও করে ফেলেছে। এটিএস-এর দেওয়া তত্ত্ব অনুযায়ী নুরাল হুদা, সাব্বির আহমেদ আনসারি (ব্যাটারিওয়ালা)-র ব্যাটারির দোকানে কাজ করত। এই সাব্বির ঘটনার আরেক চক্রী। সাব্বির সৌদি আরব হয়ে পাকিস্তানে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিল। মুম্বাই বিস্ফোরণের পরেই নাকি একে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। (সাব্বির পুলিশ হেফজতে থাকাকালীন মালেগাঁও বিস্ফোরণ হয়েছিল। নুরাল হুদা সাব্বিরের আদেশ মেনেই কাজ করেছে। সাব্বিরের কারখানাতেই বোমা তৈরি হয়েছে। আট মাসে বিস্ফোরণের

ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। অন্য একটি সংগঠনের হাত ধরে আরডিএক্স ভারতে আনা হয়েছে। (*মহারাষ্ট্র টাইমস*, মুম্বাই, ৩১ অক্টোবর ২০০৬ এবং *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৪ নভেম্বর ২০০৬)

৪. সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার যাওয়ার আগে তড়িঘড়ি ডিজিপি পাসরিচা ঘোষণা করলেন, তদন্ত শেষ। ৩০ অক্টোবর ২০০৬-এ ইটিএস যা বলেছিল, পাসরিচা সেই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করলেন। এর সাথে আরও জানালেন, এটিএস আট সিমি সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। আরও আটজনের খোঁজ চলছে। দুজন পাকিস্তানি এই ঘটনায় জড়িত। এরমধ্যে একজন মুজাম্মিল, বিস্ফোরক তৈরিতে সাহায্য করতে গত জুলাইতে ভারতে এসেছিল। আরেকজন ধৃত মুহাম্মদ আলি, মুম্বাইয়ে ৭/১১ বিস্ফোরণের পর করাচির কাছে একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সাব্বিরকে পাঠিয়েছিল। এই আলিই সাব্বিরের কাছে পনেরো থেকে কুড়ি কেজি আরডিএক্স পাঠিয়েছিল। এর মধ্যে দেড় কেজি বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে মালেগাঁও-তে। নুরাল হুদার বিয়ের সময় ৮ মে এই ছক কষা হয়েছিল। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করাই ছিল এই বিস্ফোরণের লক্ষ্য। তবে পাকিস্তানের এরমধ্যে সরাসরি হাত রয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত নয় বলে জানান পাসরিচা। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর ২০০৬)।

৫. সিবিআই-এর হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে আদালতে এটিএস চার্জশিট জমা দিয়ে দেয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ২১ ডিসেম্বর ২০০৬)

যে প্রমাণ লিখিত রয়েছে

১. সাব্বির ব্যাটারিওয়ালার গোডাউনে আরডিএক্স ছিল বলে জানা গিয়েছিল।

২. একজন প্রতক্ষ্যদর্শীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয় ১৬৫ সিআরপিসি ধারা অনুযায়ী। যদিও তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

৩. অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি।

৪. ব্রেন ম্যাপিং, পলিগ্রাফি, কেমিক্যাল অ্যানালিসিস পরীক্ষার রিপোর্ট।

৫. টিকিটের মতো কিছু নথি, যার বিস্তারিত বিবরণ জনসম্মুক্ষে আনা হয়নি। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর ২০০৬)

৬. এক অভিযুক্তের (আবরার আহমেদ) বয়ান, যে পরে রাজসাক্ষী হয়ে গিয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬)

তত্ত্ব ও প্রমাণের বিশ্বাসযোগ্যতা

১. মালেগাঁও বিস্ফোরণের দু মাস আগে, মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের পর থেকেই যদি সাব্বির ব্যাটারিওয়ালা মুম্বাই পুলিশের হেফাজতে থেকে থাকে, তাহলে তার পক্ষে কীভাবে এই ধরনের বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়?

২. প্রত্যক্ষদর্শীদের পরিচয় কেনো প্রকাশ করা হলো না?

৩. রাজসাক্ষীর বয়ান কতটা বিশ্বাসযোগ্য? যেখানে সে প্রায় এক মাস পুলিশের জিম্মায় ছিল, এবং আইনি ভাবে তার হেফাজত নেয়নি পুলিশ।

৪. ব্রেন ম্যাপিং আর পলিগ্রাফ পরীক্ষায় কী পাওয়া গিয়েছিল? সেসব কি কোনো ভাবে যাচাই করা হয়েছিল? নার্কো অ্যানালিসিস পরীক্ষা কেনো সরকারি ভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি?

৫. টিকিটের বিস্তারিত বিবরণ কেনো প্রকাশ করা হলো না?

৬. কোথাও 'আরডিএক্স-এর হদিস' পাওয়ার প্রমাণগুলো পুলিশের ইচ্ছে মতো সাজানো কি একেবারেই অসম্ভব? পুলিশের তত্ত্ব অনুযায়ী অভিযুক্তের বয়ানের মতো বিষয়গুলোও ঠিক করে দেওয়াও তো সম্ভব? (এই সব দিক বিচার করে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।)

কিছু প্রশ্ন যার উত্তর এখনও মেলেনি

১. বিস্ফোরণের জন্য সাইকেল এনেছিল বলে যে দুজনের কথা বলা হয়েছিল, যাদের মুখের ছবি আঁকানো হয়েছিল, তার পরিণতি কী ঘটল?

২. স্থানীয় পুলিশ যে টেলিফোনের কথোপকথনের বিশ্লেষণ চালিয়েছিল, তার ফলাফল কী হলো?

৩. ২০০৬-এর নান্দেড় বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের কি আদৌ জেরা করা হয়েছিল? যদি করা হয়েই থাকে, তাহলে তার ফলাফলটা কী? (এটা এখন অন্তত নিশ্চিত হয়ে গেছে, যে অভিযুক্তরা নান্দেড় বিস্ফোরণে জড়িত ছিল তাদেরই হাত ছিল পারভানি, পূর্ণা ও জালনায়। যেটা নিয়ে পুলিশ জানিয়েছিল সে জায়গাগুলোতে যেভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো

হয়েছিল তার ধাঁচটি ছিল মালেগাঁও বিস্ফোরণের মতোই) এছাড়াও মুম্বাইয়ে উর্দু দৈনিক ইনকিলাবে ১১ সেপ্টেম্বরের ইস্যুটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়, মালেগাঁ বিস্ফোরণে নকল দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। আচমকাই তার দেহ রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যায়। শরীরটি মারাত্মক ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। নীচের অংশটি প্রায় ছিলই না। মালেগাঁও-এর ইসলামপুরার বছর সাইত্রিশের এক দর্জি আকিল আহমেদ জানিয়েছিল, তিনি নিজে যখন ওই দেহটি তুলে অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই তার নকল দাড়ি খুলে বেরিয়ে আসে। মালেগাঁও মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন মেডিক্যাল অফিসার ডক্টর বাগ জানিয়েছিলেন, ওয়াদিয়া হাসপাতালে প্রায় ৩০টি দেহের ময়না তদন্ত হয়েছিল যার মধ্যে একটি দেহের পা ছিল না। এই তথ্যে নান্দেড়ে আরএসএস সদস্যের বাড়িতে বিস্ফোরণের যোগসূত্র মেলে। কারণ সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল বেশ কিছু নকল দাঁড়িও।

৪. মালেগাঁও-এর হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা থেকে ধৃত ২০ ব্যক্তিকে জেরা করার পর কী তথ্য মিলেছিল?

৫. সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, উৎসবের আবহে মুসলিমরা কী কারণে মুসলিমদের মারতে বিস্ফোরণ ঘটাতে যাবে?

নতুন তথ্য প্রকাশ

সিবিআই-এর কাছ থেকে মালেগাঁও-এর মানুষ যখন এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়ার আশা করছিল, তখন ২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে এলো অদ্ভুত তথ্য। এই তথ্য থেকে জানা যায়, যে ২০০৬ সালে যারা মালেগাঁও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, ২০০৮-এর বিস্ফোরণেও জড়িত ছিল তারাই। মারাঠি দৈনিক *সকাল*, পুনে, ১০ নভেম্বর ২০০৮, এক তদন্তকারী অফিসারকে উদ্ধৃত করে জানায় মালেগাঁও-এর দুটি বিস্ফোরণ এবং নান্দেড় বিস্ফোরণের পেছনে সেই ৫৪ জন যুবকই জড়িত ছিল, যারা ২০০১ সালে নাগপুরের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিয়েছিল।

❖ আহমেদাবাদের বিস্ফোরণকাণ্ড এবং সুরাটের অবিস্ফোরিত বোমা (২৬ জুলাই ২০০৮)

- নরেন্দ্র মোদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শিক্ষা
- তদন্তে মেলা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্রেফ হাওয়ায় ছেড়ে দেওয়া
- আহমেদাবাদ, মুম্বাই ও দিল্লি পুলিশের যৌথ ভাবে আচমকা আইবি-র সাজানো তদন্তের সমাধান।
- কেন হেউড-কে বেকসুর প্রমাণের জন্য মুসলিম তথ্যপ্রযুক্তি
- কর্মীদের অভিযুক্ত করা।

২০০৮-এর ২৬ জুলাই ১৭টি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল আহমেদাবাদ। মৃত ৫০-এরও বেশি, আহত কমপক্ষে ১০০।

শুরুর দিন থেকেই মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তিদের ওপর দোষারোপ

১. পুলিশ ঘটনার পেছনে সিমি-র স্লিপার সেলের হাত খুঁজে পেয়েছিল। (*দ্য হিন্দু*, ২৭ জুলাই ২০০৮)

২. ২০০২ সালে গোধরা দাঙ্গার পর আবদুল হালিম নামে সিমির এক সদস্যকে পুলিশ খুঁজছিল। আহমেদাবাদের দানি লিম্বা এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অথচ দাঙ্গার পর থেকে সে নাকি অধরা ছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৮ জুলাই ২০০৮)

তদন্তে আইবি-র হস্তক্ষেপ

১. ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পেছনে হাত ছিল সিমি-র সদস্যদের। লশকর, জইশ আর হুজিকে পিছনে রেখে সামনে রয়েছে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন'। পুলিশ এই তত্ত্বের পেছনেই ঘুরে চলেছিল। ধারণা ছিল এই বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা এসেছিল বাইরে থেকে। (*দ্য টেলিগ্রাফ*, মুম্বাই, ২৮ জুলাই ২০০৮)

২. ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর গুজরাট পুলিশের গোপন তথ্যের নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। ফলে ঠিকঠাক খবর না পেয়ে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল তারা। গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর সেখানে যে কটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চলেছিল, তার সবকটাই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ২৭ জুলাই, ২০০৮)

৩. আহমেদাবাদ, জয়পুর, হায়দরাবাদ, লখনউ এবং বারাণসীতে যে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার মধ্যে কোনো মিল বা কাজের সামঞ্জস্যতা ছিল কিনা, তা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি-কে খতিয়ে দেখতে বলেছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। (*ডেকান হেরাল্ড*, ২৭ জুলাই ২০০৮)

তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর ই-মেইল

১. 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' নামে একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম করে ইন্ডিয়া টিভি-র অফিসে একটি ই-মেইল আসে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে। ঘটনার দায় স্বীকার করা হয় তাতে। 'রোক সাকো তো রোক লো' জাতীয় চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া হয় নিরাপত্তা সংস্থাকে। গত বছর ১৩ মে জয়পুর বিস্ফোরণ এবং ২৩ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশ আদালতে বিস্ফোরণের আগেও এমন ই-মেইলের কাণ্ড ঘটেছিল। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে এবং *পুধারি*, পুনে, ২৭ জুলাই ২০০৮)

২. ওই একই রাতে লশকর-ই-তাইয়েবা এবং হুজি বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে। (*পুধারি*, পুনে, ২৭ জুলাই ২০০৮)

৩. একটি বেসরকারি চ্যানেলের কাছে আরও একটি ই-মেইল আসে। তাতে বলা হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লিতেও বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। (*পুধারি*, পুনে ২৮ জুলাই ২০০৮)

গুরুত্বপূর্ণ সূত্র: মহারাষ্ট্র যোগ

রবিবার (২৭ জুলাই ২০০৮) নবি মুম্বাইয়ের একটি ফ্ল্যাটে হানা দেয় পুলিশ। আগের দিন টিভি চ্যানেলগুলোতে যে কম্পিউটার থেকে ই-মেইল পাঠানো হয়েছিল সেই কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র নামে যে মেইল পাঠানো হয়েছিল তার আইপি অ্যাড্রেস যাচাই করে ফ্ল্যাটটিকে চিহ্নিত করা হয়। নবি মুম্বাইতে ফ্ল্যাটটি ভাড়া করেছিল আমেরিকান নাগরিক কেন হেউড। অ্যালার্বি গুজরাট নামে যে অ্যাকাউন্ট থেকে ই-মেইলটি পাঠানো হয়েছিল সেটি ছিল হেউডের। ক্যাম্পবেল হোয়াইট নামে বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থায় ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন তিনি। তিনি তথ্য প্রযুক্তির প্রশিক্ষণও নিয়েছিলেন। হেউডের দাবি ছিল, কেউ তার কম্পিউটার হ্যাক করে ই-মেইল পাঠিয়েছে। এই দাবি যাচাই করতে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে এবং *পুধারি*, পুনে ২৮ জুলাই ২০০৮)

২. আহমেদাবাদের সঙ্গে জড়িত ঘটনার সূত্র মিলেছে নবি মুম্বাইয়ে পাওয়া কিছু তথ্য মারফত। (*পুধারি*, পুনে ২৮ জুলাই ২০০৮)

৩. গুজরাট পুলিশ মুম্বাই পুলিশকে জানায়, সুরাটে বিস্ফোরক ভর্তি দুটি মারুতি 'ওয়াগন আর' গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় মিলেছে। গাড়িদুটির রেজিস্ট্রেশন নবি মুম্বাইয়ের। মুম্বাইয়ের একজন এটিএস অফিসার এই সূত্রের সত্যতা স্বীকার করেন। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ২৯ জুলাই ২০০৮)

অন্যান্য সংবাদপত্রের প্রতিবেদন

১. নীল পলিথিন ব্যাগের মধ্যে করে সাইকেলের পেছনে টিফিন বক্সের মধ্যে রাখা ছিল বেশিরভাগ বোমা। যেখানে হাসপাতালের বোমাটি ছিল গাড়িতে। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৭ জুলাই ২০০৮)
২. মাইক্রোপ্রসেসর আর টাইমার ডিভাইস ছিল বোমাটিতে। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় বোমায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়েছিল। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ২৭ জুলাই ২০০৮)
৩. জয়পুরে বিস্ফোরণের যে ধারা ও উদ্দেশ্য তার সাথে আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরুর বিস্ফোরণের মিল ছিল। (মারাঠি দৈনিক *পুধারি*, পুনে, ২৮ জুলাই ২০০৮)
৪. সুরাটে দুটি ওয়াগন আর গাড়িতে দুটি অবিস্ফোরিত গাড়ি বোমা উদ্ধার হয়েছিল ২৭ জুলাই, ২০০৮-এ দুটো গাড়িই সিএনজি গ্যাসের। আহমেদাবাদে সিভিল হাসপাতালে বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও সিএনজি চালিত ওয়াগন আর গাড়িই ব্যবহৃত হয়েছিল আহমেদাবাদ আর সুরাটের মধ্যে এটা একটা ভালোরকম যোগসূত্র। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৮ জুলাই ২০০৮ এবং *দ্য টেলিগ্রাফ*, মুম্বাই, ২৮ জুলাই ২০০৮)

পরবর্তী প্রতিবেদন-সুরাটের বোমা ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

১. ২০০৮ সালের ২৭ থেকে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে সরাটে ২৩টি তাজা বোমা উদ্ধার করে সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ৩১ জুলাই ২০০৮)
২. ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেন, সুরাটে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলোর সবকটিই শক্তিশালী ছিল, বিস্ফোরণ হলে ভালোরকম ক্ষয়ক্ষতি হতে পারত। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ৩১ জুলাই ২০০৮)

৩. গুজরাটের টিভি নাইন নিউজ চ্যানেলে একটি চিঠি পাঠিয়ে হুজি বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছিল। (*পুধারি*, পুনে, ৩১ জুলাই ২০০৮)

৪. বিস্ফোরণের মধ্যে অনেক মিল দেখেই আহমেদাবাদে এসেছিল জয়পুর আর হায়দরাবাদ পুলিশ। (*সকাল*, পুনে, ৩১ জুলাই ২০০৮)

৫. সুরাটে রহস্যজনক ভাবে তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনা তদন্তে উঠে এল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। পুলিশ জানায়, আহমেদাবাদে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘন্টাখানেক আগেই সুরাটে ওই বোমাগুলো রাখা হয়েছিল। শনিবার ১১টা নাগাদ, অর্থ্যৎ ২৬ জুলাই ২০০৮, ওই বোমাগুলো রাখতে দেখেন এক স্থানীয় বাসিন্দা, তিনিই পরে পুলিশকে খবর দেন। সুতরাং আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের আগেই ওই বোমাগুলো রাখা হয়েছিল। (*এশিয়ান এজ*, ৩১ জুলাই, ২০০৮)

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নানান তত্ত্ব মুসলিমদের লক্ষ্য করেই ঘুরপাক খাচ্ছিল

১. গোয়েন্দা সংস্থার এক শীর্ষ অধিকারিক জানিয়েছিলেন, বেঙ্গালুরু ও আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের মাস্টারমাইন্ড রসুল খান পারতি এবং মুহাম্মদ সুফিয়া। তারা পাকিস্তানে লুকিয়েছিল। (*পুধারি*, পুনে, ৩১ জুলাই ২০০৮)

২. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, কোনোভাবেই সিমি আহমেদাবাদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল না বলে দাবি করে মুম্বাই এটিএস। তবে তাদের দাবি, দাউদ ইব্রাহিম এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তাদের আরও দাবি, ভারতের আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাউদই 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' তৈরি করে। আর এর খরচাপাতি দেয় আইএসআই। নবি মুম্বাই থেকে গাড়ি চুরি করেছিল যে গ্যাং, তাদের সাথেও দাউদ যোগের তত্ত্ব আনা হয়। (*পুধারি*, পুনে, ৩১ জুলাই ২০০৮)

৩. গুজরাট আর বেঙ্গালুরুর ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় ছোট দাউদ আর আহমেদাবাদের রসুল খান, ইয়াকুব খান পাঠানের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করেছিল 'র'-সহ অন্যান্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে কাজকর্ম চালাত ছোট দাউদ। রসুল খান পাঠান নতুন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' তৈরি করেছিল। পাকিস্তানে দাউদের সঙ্গে এদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। দাউদ ও

পাকিস্তানের আইএসআই-এর নির্দেশমতোই তারা কাজ করত। (*এশিয়ান এজ*, মুম্বাই, ৩১ জুলাই ২০০৮)

৪. সুরাটে বিস্ফোরণের ব্যর্থ চেষ্টা কিংবা আমেদাবাদের বিস্ফোরণের পেছনে স্থানীয় কোনো বাসিন্দার সহযোগিতা ছিল কিনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গুজরাটের অনেক ইমামকে এই নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। সূত্রের দাবি, আহমেদাবাদ, ভারুচ, মাঙ্গারোলের বেশ কিছু মৌলভি বিস্ফোরণের চক্রীদের আশ্রয় দিয়েছিল, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও সরবরাহ করেছিল। পশ্চিমবাংলা থেকে আসা বেশ কিছু মৌলভিকে আটকও করেছিল পুলিশ। (*ডিএনএ*, ১ অগাস্ট, ২০০৮)

৫. মহারাষ্ট্র এটিএস আবার সন্দেহ করে আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের পেছনে হাত রয়েছে সিমির। জানুয়ারিতে গুজরাটে এই নিয়ে একটি বৈঠক করে তারা। মধ্যপ্রদেশ থেকে মার্চ মাসে গ্রেফতার হয়েছিল আবদুল নামে এক ব্যক্তি। সেই নাকি এটিএস-কে জানায়, জানুয়ারির ১৩ থেকে ১৪-র মধ্যে বরোদা থেকে ৫০ কিলোমিটার দুরে হালোলের কাছে একটি জঙ্গল এরাকায় প্রশিক্ষণ শিবির চলে। তাতে অংশ নেয় ১৫ জন সিমি সদস্য। ছিল সিমির প্রধান সফদর নাগোরি, তার ডেপুটি শিবলি আবদুল এবং গুজরাটে সংগঠনের দুই শীর্ষ নেতা সাজিদ মানসুরি ও আসিফ কাগজি। মানসুরি বরোদার বাসিন্দা আর কাগজি আহমেদাবাদের। বিস্ফোরণের পর এরা দুজনে আত্মগোপন করেছিল বলে মনে করা হয়। (*ডিএনএ*, মুম্বাই, ৪ অগাস্ট ২০০৮)

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য

পুলিশি জেরায় গাড়ি চুরির সঙ্গে জড়িত আটক ব্যক্তি জানায়, ৯ জুলাই থেকে ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে চুরি হওয়া গাড়িটি তালসারি টোলের (মহারাষ্ট্রের থানে জেলায়) ওপর দিয়ে যায়। গাড়িটি সন্ত্রাসী কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ওই টোলটিতে শক্তিশালী সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ছিল। এতটাই যে গাড়ির নম্বর প্লেট থেকে শুরু করে ড্রাইভারের মুখ পর্যন্ত তাতে দেখা যেত। এটিএস আশা করেছিল আহমেদাবাদের মূল চক্রীকে এবার পাকড়াও করা যাবে। কিন্তু ওই দুদিনের মধ্যে নবি মুম্বাইয়ের চুরি যাওয়া গাড়িতে সন্ত্রাসবাদীদের যাওয়ার ফুটেজ যে ডিস্কটিতে ছিল, সেটি নাকি 'করাপটেড' বা 'নষ্ট' হয়ে গিয়েছিল। ফলে সব চেষ্টাই জলে যায়। এটিএস অতিরিক্ত কমিশনার পরম বীর সিং বলেন, ডিস্কে কোন সমস্যা রয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত চলছে। ফুটেজ হয় মুছে দেওয়া

হয়েছে, নয়তো তার উপর দিয়েই অন্য ফুটেজ রেকর্ড করানো হয়েছে। তবে ফুটেজ ডিলিট করে দেওয়া হলে তা উদ্ধার করা একটা চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে তার ওপর রিরাইট করলে তা মেলা মুশকিল।

তদন্তে যুক্ত আরেক শীর্ষ আইপিএস আধিকারিকের আবার দাবি ছিল সিসিটিভি ডাটা হয়তো বিকৃত করা হয়ে থাকতে পারে। যাইহোক, ওই টোলটি পড়ে থানে জেলা পুলিশের অধীনে। তাদের দাবি, সপ্তাহখানেক আগে টোলের তরফে অভিযোগ এসছিল সিসিটিভির যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে না। (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, পুনে এবং *পুনে মিরর* ১ অগাষ্ট ২০০৮)।

- আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ ও সুরাটের অবিস্ফোরিত বোমাগুলোর ডিটোনেটরের ওপর অন্ধ্রপ্রদেশের এপি এক্সপ্লোসিভস প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার লোগো ছিল। ডিটোনেটর ও ডিটোনেটিং ফিউজ তৈরি করে সংস্থাটি। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই, ৩১ জুলাই ২০০৮)।
- সুরাটে যে ২৭ টি বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল তদন্তকারীদের অনুমান সেগুলো রাজস্থানের রাজস্থান এক্সপ্লোসিভস অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড (আরইসিএল) নামে সংস্থার তৈরি। যে সংস্থায় রাজস্থান সরকারের বড় অংশ শেয়ার রয়েছে। গুজরাট পুলিশের হাতে অবশ্য তড়িঘড়ি ক্রেতাদের তালিকা তুলে দিয়েছিল আরইসিএল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২ অগাস্ট ২০০৮)
- এলজি হাসপাতাল ও সিভিল হাসপাতালে বিস্ফোরণের জন্য যে এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলো উত্তরপ্রদেশের মিরাটে তৈরি। আহমেদাবাদের কালুপুরে সেগুলোর ডিস্ট্রিবিউটরদের হদিস মিলেছিল। সূত্রের খবর আহমেদাবাদ ডিটেকশন অব ক্রাইম ব্রাঞ্চ (ডিসিবি) এই ঘটনার তদন্ত করছে। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই ৪ অগাস্ট ২০০৮)
- আরও বিস্ফোরণ হতে পারে, এই হুমকি দিয়ে টিভি চ্যানেলে মেইল করার অভিযোগে ২০০৮-এর ৩১ জুলাই দীপক পান্ডে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ আধিকারিকরা। দীপক পেশায় অ্যাকাউন্ট্যান্ট। (*এশিয়ান এজ,* মুম্বাই, ১ অগাস্ট ২০০৮)
- জয়েন্ট কমিশনার আশিস ভাটিয়া জানান, সন্ত্রাসবাদীদের বোমা রাখতে দেখেছিলেন যে প্রত্যক্ষদর্শী, তার সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্তদের ছবি আঁকিয়েছে গুজরাট পুলিশ। (*রেডিফ.কম,* ২ অগাস্ট ২০০৮)

- নারোল, হাটকেশ্বর আর রায়পুর এলাকায় যারা বোমা রেখেছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই তিন সন্দেহভাজনের ছবি প্রকাশ করেছে গুজরাট পুলিশ। (*দ্য স্টেটসম্যান*, মুম্বাই, ৭ অগাস্ট ২০০৮)
- ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে আসেন, আহমেদাবাদের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে আইইডি ব্যবহৃত হয়েছিল। যে এই বোমা তৈরি করেছিল, সেই ব্যক্তিই জয়পুর, উত্তরপ্রদেশ আদালত, গোকুল চাট ভান্ডার, হায়দরাবাদ এবং বরাণসীর সঙ্কট মোচন মন্দিরে বিস্ফোরণের বোমাও তৈরি করেছিল। (*দ্য হিন্দু, মুম্বাই,* ৭ অগাস্ট ২০০৮)।
- আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের কিছু আগে যে হুমকি মেইল এসেছিল, তার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাইছিলেন শহরের ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞরা। তাই কালিনা ফরেন্সিক সায়েন্সের ডিরেক্টর শ্রীমতী রুক্মিনি কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে কথা বলে পুর্ড্রু ইউনিভার্সিটির সাইবার ফরেন্সিক ল্যাবের বিশেষজ্ঞরা। *(দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* মুম্বাই ৭ অগাস্ট ২০০৮)
- এসিপি উষা রাডার নেতৃত্বে গুজরাট ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি দল ২০০৮-এর ৬ অগাস্ট মুম্বাই আসে। শ্রীমতি রাডা জানান, আগামী কয়েকদিনে শুধুমাত্র ই-মেইল-এর ইস্যুটির ওপর তার খোঁজখবর চালাবেন। কেনেথ হেউডের সঙ্গেও কথা বলবেন তারা। হেউডের বাড়ি থেকে তিনটি ও আশপাশ থেকে মেলা ১০টি কম্পিউটার খতিয়ে দেখবেন তারা। (*দ্য হিন্দু*, মুম্বাই, ৭ অগাস্ট ২০০৮)
- গুজরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত একটি হিরো হোন্ডা বাইকের (GJ-AT-4404) খোঁজখবর নেয় পুলিশ। অনুমান, ২৮ অগাস্ট মাহাদের (মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায়) একটি গ্যারেজে বাইকটি পি পি দেশাই নামে এক ব্যক্তি নিয়ে যায়। গ্যারেজের কর্মীদের সেই ব্যক্তি বলে, দুদিনের মধ্যে এসে বাইকটি নিয়ে যাবে, কিন্তু আর ফিরে আসেনি সে। গুজরাট পুলিশের কাছ থেকে এই ঘটনা জানার পর মুম্বাই পুলিশের একটি টিম ২০০৮-এর ৯ অক্টেবর মাহাদে আসে। গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশ। এইটুকুই শুধু তথ্য মেলে, ওই ব্যক্তি একটি লজে উঠেছিলেন। তদন্ত জারি রয়েছে। (*দৈনিক লোকসত্তা*, মুম্বাই, ১০ অক্টোবর ২০০৮)

গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দিল্লি পুলিশের যৌথ উদ্যোগে মামলার সমাধান। গোটাটাই আইবি-র সাজানো

যেখানে সাধারণ মানুষ ভাবছিলেন যেভাবে একের পর এক তথ্য উঠে আসছে তাতে খুব শিগগিরই এই ঘটনার তদন্ত শেষ হবে, সেখানে গুজরাট পুলিশ, তারপর মহারাষ্ট্র ও দিল্লি পুলিশ দুম করে জানিয়ে দিল তারা তদন্ত শেষ করে ফেলেছেন। অথচ আগে পাওয়া এত সূত্রের সঙ্গে তার কোনো সমঞ্জস্য থাকল না। পুলিশের কী গল্প ছিল?

২০০৮, ১৬ অগাস্ট। ১১ সিমি সদস্যকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ জানাল, তারা বড়সড় তথ্য হাতে পেয়ে গেছে। পুলিশের মতে, উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের মুফতি আবুল বাশার কাশেমি এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড। প্রাক্তন সিমি নেতা সফদর নাগোরির হাত ধরেই আবুলের উঠে আসা। এই সফদর আগে জয়পুর, হায়দরাবাদ এবং বেঙ্গালুধুতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। ২০০৮-এর মার্চে ইন্দোরে গ্রেফতার হয় সফদর। ভারুচ এলাকা থেকে সাজিদ মনসুরি নামে একজনকে গ্রেফতার করে আহমেদাবাদ পুলিশ। গ্রেফতার করে আহমেদাবাদ পুলিশ। একে বলা হচ্ছিল কোঅর্ডিনেটর। তার কাছ থেকে অনেক তথ্য মিলেছে। আহমেদাবাদের ভাপি থেকে যে গাড়ি চুরি গিয়েছিল, তা উদ্ধারে সাহায্য করেছিল সাজিদের বয়ান। বাকি নজন অভিযুক্ত যথা, উসমান আগরবাত্তিওয়ালা, আরিফ, ইমরান শেখ, ইউনুস মনসুরি, জাহিদ শেখ, গিয়াসুদ্দিন, শামসুদ্দিন, কামারুদ্দিন এবং ইকবালকে গ্রেফতার করে গুজরাট পুলিশ। ইউনুস মনসুরি বোমা বানিয়েছিল। অন্যান্যদের নানান কাজ ছিল যেমন, রেইকি করা, সাইকেল আনা, বোমা রাখা এবং আরও ছোটোখাটো কাজ। তারা সবাই সিমির সদস্য হলেও প্রত্যেকেই 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র ছাতার তলায়। এরাই সুরাটে বোমা রাখার ক্ষেত্রেও অভিযুক্ত। সংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য দিয়েছিল গুজরাটের ডিজিপি পি সি পান্ডে। অন্যদের সঙ্গে তদন্তের নিষ্পত্তিতে আইবি কীভাবে সাহায্য করেছে সেটিও পান্ডে স্বীকার করেছিল। গুজরাটের ডিজিপি, ঘটনার অন্যতম চক্রী মুম্বাইয়ের বাসিন্দা তারিক বিলাল ওরফে আবদুল সোবাহানের নাম নেয়নি। অথচ আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের মূল চক্রী হিসেবে গুজরাট পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত কমিশনারের কথা উল্লেখ করে তারিকের কথা বলে চলেছিল সাংবাদমাধ্যমগুলো। প্রতিবেদনে বলা হচ্ছিল, বিস্ফোরণের আগে মার্কিন নাগরিক কেন হেউডের কম্পিউটার হ্যাক করে ই-মেইল পাঠিয়েছিল তারিকই। তারিক নিজে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। কিন্তু ২০০৮, ৮ অগাস্ট টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, তওফিক বিলাল আর আবদুল সোবাহান একই ব্যক্তি কিনা তা নিয়ে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও আহমেদাবাদ পুলিশের মধ্যে

মতপার্থক্য রয়েছে। আবুল বাশারের তথাকথিত জবানবন্দিতে তওফিক বা সোবাহানের নাম ছিল না।

আবুল বাশার গ্যাং সম্পর্কে পুলিশ কীভাবে তথ্য পেল, তারও তিনটি তত্ত্ব রয়েছে:

১. মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুলিশ এই ঘটনার মূল চক্রী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পাকড়াও করে ফেলেছিল। পাঁচটি প্রিপেইড মোবাইল সিম কার্ড একই সময়ে কেনা হয়েছিল। বিভিন্ন ফোন বুথ থেকে তাতে শুধু কল আসত। বিস্ফোরণের দিন (২৬ জুলাই)-এর পর থেকে আচমকাই সে ফোনের সুইচ অব হয়ে যায়। আর এটাই পুলিশের হাতে বড়সড় সূত্র। কাকতালীয় ভাবে একটি সূত্র মারফত পুলিশ এই বিষয়ে আরও তথ্য পায়, ফলে সহজেই মূল চক্রীরা হাতের নাগালে চলে আসে। একটি সংবাদপত্রে তো এও বলা হয়, একটি জায়গায় তল্লাশির সময় পুলিশ সেই সিমকার্ডগুলোও পেয়ে গেছে।
২. রুটিন পরিদর্শনের সময় কর্ণাটকের দেবনাগরি জেলার হোন্নালি এলাকায় আচমকাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সিমি সদস্য রিয়াজুদ্দিন নাসির। তার কাছ থেকে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের সন্ধান মেলে।
৩. ৭ বছর পলাতক ছিল সাজিদ মনসুরি। তার গ্রেফতারের পর বেশ কিছু বিস্ফোরণের ঘটনার সূত্র মেলে তার কাছ থেকে। (*সকাল*, পুনে, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, এবং *পুধারি*, পুনে, ১৭ অগাস্ট ২০০৮ এবং (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৮ অগাস্ট ২০০৮)

তবে সিম কার্ড ঠিক কবে পুলিশের হাতে এলো, কবে রিয়াজুদ্দিন নাসির গ্রেফতার হলো, কবেই বা ধরা পড়লো সাজিদ মনসুরি, তার দিনক্ষণ মেলেনি কোনো সংবাদপত্রেই। ফলে কোন ঘটনাটা যে আগে আর কোনটা যে পরে তা জানা নেই। কোন ঘটনাটাই বা তদন্তের আসল রহস্য সমাধানে সাহায্য করল, জানা নেই সেটাও।

তদন্তের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, ২০০৮, ১৭ অগাস্ট মহারাষ্ট্র পুলিশ গুজরাট পুলিশের আগেই তা ঘোষণা করে দেয়। মহারাষ্ট্রের এটিএস আবার আয়াজ শেখ এবং নাদিম শেখকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে সন্ত্রাসী হানায় মদত রয়েছে সন্দেহে ক্রাইম ব্রাঞ্চ পাকড়াও করে বিলাল কাগজিকে। অথচ পুলিশের খাতায় রয়েছে, আয়াজ ও নাদিমকে জাল নোটের কারবারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। আর তোলা চাওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হয় কাগজি। এই দশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা সিমির স্লিপার সেলের সদস্য। ইউসুফ খান নামে একজন

তাদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখত। আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের পর তারা আত্মগোপন করে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৮ অগাস্ট ২০০৮)।

২০০৮, ১৯ সেপ্টেম্বর, দিল্লি পুলিশ বাটলা হাউসে এ বিস্ফোরণের দুই সন্দেহভাজনকে গুলি করে মারে। গ্রেফতার করা হয় আরও একজনকে। আরও দুজন পালিয়ে যায়। এনকাউন্টারে গুলি লেগে মারা যান দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের ইন্সপেক্টর মোহন চাঁদ শর্মা। যে দুজন অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদীকে মারা হয়, তাদের মধ্যে একজন আতিফ, মূল সন্দেহভাজন আবদুস সোবাহান কুরেশি ওরফে তওকিরের সঙ্গী। গ্রেফতার যাকে করা হয়েছিল তার নাম সাইফ। এর আগে আহমেদাবাদ পুলিশ গ্রেফতার করেছিল মুফতি আবুল বাশারকে। তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের জেরেই এই পুলিশি অভিযান চলে।

২০০৮-এর ২১ সেপ্টেম্বর জামিয়া নগর এলাকা থেকে দিল্লি পুলিশ বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে, জিয়াউর রহমান, শাকির নাসির এবং মুহাম্মদ শাকির। ওই এলাকাতেই ১৯ সেপ্টেম্বর এনকাউন্টারটি হয়েছিল। ধৃতরা শহরে কমপক্ষে ২০টি বোমা বিস্ফোরণের চক্রান্ত চালাচ্ছিল বলে দাবি করা হয়। প্রত্যেকেই 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র সদস্য বলে অভিযোগ আনা হয়। বাটলা হাউস এনকাউন্টারে যে আতিফ মারা গিয়েছিল, তার সাথে এদের বছর চারেক ধরে যোগাযোগ চলছিল বলে দাবি পুলিশের। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে এবং *সকাল*, পুনে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮)

২০০৮, ২৪ সেপ্টেম্বর মুম্বাই পুলিশ জানায় তারা 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। গত কয়েকদিন ধরেই এরা মুম্বাইয়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজ করবার চালাচ্ছিল বলে দাবি পুলিশের। ধৃতরা হলো মুহাম্মদ সাদিক, আফজল উসমান, মুহাম্মদ আরিফ শেখ, মুহাম্মদ জাকির শেখ এবং সেখ মুহাম্মদ আনসার। নবি মুম্বাই থেকে চারটি গাড়ি চুরির অভিযোগ উঠেছিল এদের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে দুটি জুলাইতে আহমেদাবাদ বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হয়। বাকি দুটি সুরাটের রাস্তা থেকে বিস্ফোরক ভর্তি অবস্থায় উদ্ধার হয়। ধৃত পাঁচজনের একজন মুহাম্মদ সাদিক শেখ 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল। দিল্লিতে সংগঠনের মাথা ছিল আতিফ (বাটলা হাউস এনকাউন্টারে যার মৃত্যু হয়), সাদিক ছিল তার নিয়ন্ত্রক। ২০০৬ সালের জুলাইতে মুম্বাইয়ের ট্রেনেও কয়েকটা বোমা এরা রেখেছিল বলে স্বীকারোক্তি দেয় ধৃতেরা। যা ২০০৬-এর ধারাবাহিক বিস্ফোরণকাণ্ডে নতুন মোড় নেয়।

উত্তরপ্রদেশের আজমগড় থেকে এদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সংগঠনের এই শাখার অবিসংবাদী নেতা ছিল সাদিক। একটি ইলেকট্রনিক কোম্পানিতে সে ছিল প্রোগ্রাম ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু সংগঠনের নেট বিশেষজ্ঞ ছিল

সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আনসার। পাঁচজনকে যে ধরা হয়েছিল, আনসার তাদের মধ্যেই ছিল। কিন্তু ২৬ সেপ্টেম্বর জয়েন্ট সিপি ক্রাইম, রাকেশ মারিয়া বলে, ই-মেইল পাঠানোর ভাবনাটা ছিল মূলত রোশন খান ওরফে রিয়াজ ভটকলের। 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র তাত্ত্বিক নেতা। পুলিশের মতে সংগঠনের পেছনে হাত ছিল হুজি আর লশকর-ই-তাইয়েবার। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৫ অগাস্ট, ২০০৮, *সকাল*, পুনে, ২৭ অগাস্ট, ২০০৮)

৬ অক্টোবর, ২০০৮ মুম্বাই পুলিশ দাবি করে তারা আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ বিস্ফোরণ ও সুরাটের বোমা রাখার ঘটনায় জড়িত সন্ত্রাসী সংগঠনের মূল ব্যক্তিদের ধরতে পেরেছে। পুনে, ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই থেকে ১১ জন সন্দেহভাজন 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' সদস্যকে গ্রেফতার করেছে বলে দাবি করে পুলিশ। এরমধ্যে তিনজন, দেশে হইচই ফেলে দেওয়া সন্ত্রাসী হুমকি দিয়ে ই-মেইল পাঠানোর ঘটনায় জড়িত। এর বেশ ভালো ও শিক্ষিত পরিবারের, নিজেরা উচ্চ শিক্ষিত, কম্পিউটার জানা লোক। এর মধ্যে এক অভিযুক্ত মুহাম্মদ মনসুর পিরভোয় ওরফে মন্নু পুনের বাসিন্দা। সে ইয়াহুতে প্রিন্সিপ্যাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিল।

মুম্বাইয়ের বিভিন্ন যায়গা থেকে ই-মেইল করার আগে মন্নুই তার বয়ান ঠিক করে দেয়। বাকি দুজন মুবিন শেখ, একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসার এবং আসিফ বশির শেখ ওরফে মেহমুদ, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। দুজনেই পুনের বাসিন্দা।

মুম্বাই পুলিশের জয়েন্ট সিপি বা যুগ্ম কমিশনার রাকেশ মারিয়া দাবি করে, ২৩ সেপ্টেম্বর এই পাঁচজনকে জেরা করা হয়। এদের জেরা করেই সেই এগারোজন সন্দেহভাজনের খোঁজ মেলে। পুলিশ দুটি রিভালোভার, ৪৫টি বুলেট, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, লাইফ জ্যাকেট, ছটি ল্যাপটপ, ওয়াইফাই রাউটার এবং নগদ সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে এবং *সকাল*, পুনে, ৭ অক্টোবর ২০০৮)

মার্কিন নাগরিক কেন হেউড আচমকাই দেশ ছাড়ল

১. ২০০৮ এর ১৮ অগাস্ট ভোরের বিমানে আচমকাই দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে আমেরিকা চলে গেল কেন হেউড। অথচ তখনও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে দেশ ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছিল। হেউড জানিয়েছিল সে সোমবার হাজিরা দেবে। অথচ ওই দিনই ভোরে সে দেশ ছেড়ে পালালো। লুক আউট নোটিশ থাকা সত্ত্বেও যেভাবে সে পালালো, তাতে দিল্লি এয়ারপোর্টের গাফিলতিই প্রমাণ হয়। মুম্বাই

পুলিশের দাবি ছিল লুক আউট নোটিশ পাঠানো হয়েছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভিবাসী দফতরে এবং ফরেন রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের কাছে সেই নোটিশ সম্পর্কে জানানোও হয়েছিল। ধরে নেওয়াই যায়, ভারত সরকার তাকে দেশ ছাড়তে অনুমতি দিয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে এবং *সকাল*, পুনে ১৯ অগাস্ট ২০০৮)

২. হেউডকে ক্লিনচিট: হেউডের ব্রেন ম্যাপিং ও পলিগ্রাফ পরীক্ষায় যেহেতু আপত্তিকর কোনো কিছু মিলল না, তাই এটিএস ঠিক করল তার বিরুদ্ধে থাকা লুক আউট নোটিশ বাতিল করে দেবে। (*দৈনিক সকাল*, পুনে, ২১ অগাস্ট, ২০০৮)

৩. ক্যাম্পবেল হোয়াইটে কর্মরত হেউডের কাছ থেকে সেরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বলে জানায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। তাদের দাবি, সে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ছিল না। নেহাত তাত্ত্বিক বিষয়েই তার পড়াশোনা।

৪. সংবাদমাধ্যমের একাংশের অনুমান ছিল, এটিএস যেহেতু হেউডের নার্কো পরীক্ষা করার বন্দোবস্ত করছিল, সেই কারণেই সে আগেভাগে দেশ ছেড়ে পালায়। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৫. মুম্বাই এয়ারপোর্টে হেউড ফিরে আসে বুধবার মাঝরাতে (১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। অ্যারিজোনাতে প্রায় এক মাস নিজের বাড়িতে কাটানোর পর। তার দাবি ছিল, এটিএস জেরার কারণে সে ট্রমায় চলে গিয়েছিল। সেটা কাটানোর জন্যই এভাবে তার চলে যাওয়া। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

সিমির ওপর নিষেধাজ্ঞা

২০০৮-এর ৬ অগাস্ট যখন স্পেশাল ট্রাইবুনাল সিমিকে ছাড় দেয়, তারপরেই তড়িঘড়ি করে সর্বোচ্চ আদালতে বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ জানায় কেন্দ্র। সুপ্রিম কোর্ট ট্রাইবুনালের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। আর এর মাঝে আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের সঙ্গে সিমির কীরকম যোগাযোগ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল গুজরাট পুলিশ। পাশে ছিল অন্যান্য রাজ্যের পুলিশ ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো বা আইবি। তদন্তে এই সিমির বিরুদ্ধে 'শক্তপোক্ত প্রমাণ' মিলল, জানা গেল কেমন করে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা দেশজুড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে। সিমির মতোই চরমপন্থী সংগঠন হিসেবে দেখানো

হলো 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' কে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২১ অগাস্ট ২০০৮)।

ভয়ঙ্কর গাফিলতি ফাঁকফোকর, সন্দেহ এবং সীমাবদ্ধতা

এটা বেশ অবাক করার মতো বিষয়, তদন্তের আচমকাই নিস্পত্তি হয়ে গেল, আগে পাওয়া সূত্রগুলো ছাড়াই। স্বাভাবিকভাবেই যাদের যেভাবে যে কারণে আটক করা হয়েছিল, সেসবের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সে কারণে সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে হলেও অন্তত তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে জানাতে হতো, আগে পাওয়া সূত্রগুলো নিয়ে তারা কী করেছে। বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে গেছে, যার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান মেলেনি। তদন্তকারীদের সেগুলো সম্পর্কে সাফাই দেওয়ার প্রয়োজন:

১. প্রমাণের ক্ষেত্রে তালসারি টোলের সিসিটিভি ফুটেজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ এটিএস যে হার্ড ডিস্কগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেগুলো ছিল করাপটেড। ডিস্কগুলোকে ইচ্ছেকৃত ভাবে করাপ্ট করা হয়েছে, না কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি, তা নিয়ে আরও বিশদ তদন্তের প্রয়োজন ছিল। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল এটিএস-এর:
   - জুলাই-এর ৯ তারিখ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত সিসিটিভিগুলো আদৌ কাজ করছিল তো?
   - অন্যান্য যে গাড়িগুলো ওই দিন টোল পার করে যাচ্ছিল, সেগুলোর ছবিও কি ধরা পড়েছিল?
   - সিসিটিভিগুলো দেখভালের দায়িত্ব কার ছিল, কেই বা সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে-পুলিশ নাকি টোলের কর্মীরা?
   - সিসিটিভিগুলো যে গন্ডগোল করছে, সেই সম্পর্কে ঠিক কবে পুলিশ খবর পায়? এরপর কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?
   - টোলের কর্মচারীই হোক বা মূল কন্ট্রাক্টর কিংবা টোলের সঙ্গে যুক্ত অন্য কেউ কি কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল?

২. বেশ কয়েকমাস যেহেতু কেটে গেছে, উপরোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে এখনও তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। ধরা যাক তদন্ত হলো, তাহলে তার থেকে কী সূত্র মিলতে পারে?

৩. গাড়ি চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে যারা আটক হয়েছিল, জেরার সময় তারা জানিয়েছিল, চুরি যাওয়া গাড়িগুলোই বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ৯ থেকে ২০ জুলাইয়ের মধ্যে সেগুলো

তালসারি টোলের ওপর দিয়ে গিয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১ অগাস্ট ২০০৮)। আটক ব্যক্তিরা কারা? এরপর তাদের সঙ্গে কী হয়েছিল? সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে তারা আর কী কী তথ্য দিয়েছিল?

৪. সুরাটে যে ২৭টি বোমা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল সেগুলো ঢোলপুরের আরইসিএল সংস্থা থেকে এসেছিল। এ নিয়ে আর কী কী তদন্ত হয়েছে? তদন্তে কীই-বা মিলেছিল?

৫. একইরকম ভাবে বিস্ফোরকগুলোর সঙ্গে যে অন্ধ্রপ্রদেশ এক্সপ্লোসিভস প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থাটির যোগ মিলেছিল, তা নিয়ে কি তদন্ত হয়েছে?

৬. বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডার কোথা থেকে এলো তাই নিয়ে তদন্ত করছিল আহমেদাবাদের ডিটেকশন অব ক্রাইম ব্রাঞ্চ (ডিসিবি)। সেই তদন্ত থেকে কী মিলল?

৭. আরও বিস্ফোরণ ঘটানো হবে সেই হুমকি দিয়ে ৩১ জুলাই, ২০০৮-এ একটি নিউজ চ্যানেলে মেইল করেছিল দীপক পান্ডে। মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাকে গ্রেফতারও করে। তা থেকে কী পাওয়া গেছে? তার এর সঙ্গে কী যোগ, তার সঙ্গীরাই বা কে, তার খোঁজ মিলেছে কি?

৮. প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী গুজরাট পুলিশ সন্দেহভাজনদের তিনটি ছবি আঁকয়েছিল। এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল *রেডিফ.কম*-এর ২ অগাষ্ট ২০০৮-এ। আবার *দ্য স্টেটসম্যান* (মুম্বাই)-এ ৭ অগাস্ট ২০০৮-এ একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল গুজরাট পুলিশ বোমা রাখার ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনের ছবি প্রকাশ করেছে। এটা পরিষ্কার নয় যে দুবার একই খবর প্রকাশিত হয়েছিল, নাকি গুজরাট পুলিশ আগের আঁকাগুলো বাদ দিয়ে নতুন করে কোনো ছবি আঁকয়েছিল? যদি পরেরটাই সত্যি হয়, তাহলে কী এমন হয়েছিল? আগের ছবি আর পরের ছবির মধ্যে কোনো মিল ছিল, না দুটিই একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? নাকি পরে যে ছবিগুলো আঁকা দুটিই একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা? নাকি পরে যে ছবিগুলো আঁকা হয়েছিল তা আইবি আর পুলিশের আগে থেকেই ঠিক করে রাখা সন্দেহভাজনদের ছবি ছিল সেগুলো?

৯. গুজরাট পুলিশ, আইবি, মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং দিল্লি পুলিশ শুদ্ধাশুদ্ধির নিয়ম মেনে তদন্ত করছিল। প্রথমে বেশ কিছু তত্ত্বের পথে তারা এগোচ্ছিল। তদন্ত পুরো শেষ বলে গুজরাটের ডিজিপি পি সি পান্ডে যে

ঘোষণা করেছিল, সেই মুফতি তত্ত্বকে খারিজ করা হয়। কিন্তু রহস্যের সামাধানটা যে কী করে হলো, সেটাই রহস্য থেকে গেল। কর্ণাটকে রিয়াজুদ্দিন নাসিরের গ্রেফতারি, নাকি ভারুচের সাজিদ মানসুরি, অথবা কিছু জায়গা থেকে সিম কার্ড উদ্ধার হওয়া, কোন ঘটনার জেরে যে তদন্তের নিষ্পত্তি হলো পরিষ্কার নয়। যেহেতু পুলিশ ওই তিনটি ঘটনা নিয়ে কোনো দিনক্ষণের ঘোষণা করেনি, সেই কারণে কোন ঘটনার জেরে তদন্তের নিষ্পত্তি হলো তা বলা অসম্ভব। মোবাইল ফোনের সিম কার্ডের যে তত্ত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ধারণাতীত। পুলিশ জানিয়েছিল, শুধুমাত্র বিভিন্ন পিসিও থেকে ফোন আসার জন্য পাঁচটি সিম কার্ড কেনা হয়েছিল একই সময়ে। সে ফোনগুলোর সুইচ বিস্ফোরণের দিন আচমকাই বন্ধ হয়ে যায়। এটাই নাকি বড়সড় সূত্র। এই ঘটনা নিয়ে একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন বলে, দুষ্কৃতীদের মোবাইল ফোনের ওপর নজরদারি চালিয়ে তাদের পাকড়াও করে পুলিশ। আরেকটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের দাবি, একটি জায়গায় তল্লাশি করতে গিয়েই নাকি সিমকার্ডগুলো উদ্ধার হয়েছে।

১০. অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার হিসেবে আমার অন্তত এটা বোধগম্য হয়নি, কোনটা আগে হলো। কার্ড আগে উদ্ধার করার পর বিষয়গুলোর তথ্য মিলল যে, তারা একইসঙ্গে পাঁচটি সিমকার্ড কিনেছে, বিষ্ফোরণের দিন হঠাৎ সেগুলো বন্ধও হয়ে গেছে? নাকি অন্য কোনো ভাবে এই সূত্রগুলো পুলিশের হাতে এসেছে? অন্য ভাবে বলতে যেমন ধরুন, আগে একসঙ্গে কার্ড কেনার তথ্যটি পুলিশের হাতে এলো, তারপর সিম কার্ডগুলো উদ্ধার হলো। কিন্তু যদি সিম কার্ড আগে উদ্ধার হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কোথা থেকে সেগুলো মিলেছিল? পুলিশের কাছেই বা সে জায়গার সম্পর্কে খবর এলো কোথা থেকে? কি এমন তথ্য ছিল যার ওপর পুলিশ তার নজর রেখেছিল? তার থেকে কীভাবেই বা ঘটনার মূলচক্রীদের হদিস পেয়ে গেল পুলিশ? সূত্র কাকতালীয়ভাবে কেমনই বা তথ্য পুলিশকে দিয়েছিল।

১১. যদি ওপরের প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর না মেলে, তাহলে পুলিশের (আইবি) গল্প মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে আদালতের কাছে তো না-ই।

১২. হেউডের কম্পিউটার থেকে পাঠানো হুমকি ই-মেইল নিয়ে কালিনার ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি পুর্ড়ু ইউনিভার্সিটির ফরেন্সিক ল্যাবের

সাহায্য চেয়েছিল। এছাড়াও গুজরাট ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি টিম মুম্বাইতে এসেছিল শুধুমাত্র এই বিষয়টি সম্পর্কেই খোঁজখবর করতে। পুর্ডু ইউনিভার্সিটি কী মতামত দিয়েছিল? গুজরাট ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তেই বা কী উঠে এসেছিল?

১৩. সবথেকে বেশি আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো হেউডের ভারত থেকে আচমকা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। একজন পলাতক সম্পর্কে ক্লিনচিট দেওয়ার জন্য মুম্বাই পুলিশ ও আইবি কীভাবে তৎপর হয়ে উঠেছিল, সেটাও অবাক করার মতো। এ নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে:

- এরকম চাঞ্চল্যকর ঘটনায় যখন হেউডের ভূমিকা সন্দেহজনক ছিলই, তাহলে মুম্বাই পুলিশ কেনো তার ওপর নজর রাখেনি?
- যার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের, (ভারতে যেটা বকলমে আইবি)-র তৎপরতা ছাড়া, সেরকম ব্যক্তির দেশ ছেড়ে পালানো কি আদৌ সম্ভব?
- হেউড আচমকা পালিয়ে যাওয়ার দু দিনের মধ্যেই তাকে ক্লিনচিট দেওয়া নিয়ে মুম্বাই এটিএস-এর এমন কি ব্যস্ততা ছিল, বিশেষ করে যখন তার বিরুদ্ধে তদন্ত তখনও শেষ হয়নি? তার কম্পিউটার হ্যাক করা হয়েছিল, না নিজেই তা পাঠিয়েছিল তা নিয়ে পুলিশ তখনও কোনো সহমতে পৌছতে পারেনি। তদন্ত চলাকালীন তার এইভাবে দেশ ছেড়ে পালানো কি সন্দেহজনক বিষয় নয়? নাকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে আনঅফিসিয়ালি যা হয়েছে তা আইবি-র নির্দেশেই?
- একমাস বাদে যখন সে ভারতে ফিরে আসে, তখন আইবি-র বলার দরকার কী ছিল, যে সে বিশেষজ্ঞ মোটেই নয়, তাত্ত্বিক বিষয় নিয়েই তার ঘাঁটাঘাটি? অথচ সে আইটি প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করত। হেউডের ঘটনায় আইবি-র পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়েই কি এই তৎপরতা?
- এক মাসে ধরে সে আমেরিকায় কী করছিল? আমেরিকার বিশেষজ্ঞ আর আইবি কি তাকে পাখির বুলি শেখাচ্ছিল যে কীভাবে তদন্তকারীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, নার্কো পরীক্ষা কীভাবে উতরাতে হবে, আর তার পরেই এই হইচইয়ের মধ্যে কীভাবে চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে?

কম্পিউটার জানা মুসলিম ছেলেদের ওপর দোষ চাপাতে অতি উৎসাহিত আইবি-র দোষী বিবেক

ওপরের তত্বগুলো নিয়ে আইবি বেশ দুশ্চিন্তায় ছিল। হেউডকে বাঁচাতে তাই তদন্তকারী সংস্থা, বিশেষত মুম্বাই পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছিল। সে কারণে সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কম্পিউটার জনা ব্যক্তিকে আনানো জরুরি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মজার ব্যপার শুরুতে হেউডকে ক্লিনচিট দিতে গুজরাট পুলিশ খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি। সেখানে মুম্বাই পুলিশ মোটামুটি আইবি-র হয়েই যেহেতু কাজ করছিল, তারা এই ব্যাপারে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। গুজরাটের ডিজিপি-ও তদন্তের নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণা করতে গিয়ে কিন্তু একবারও তথাকথিত কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও মূল চক্রী, বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত তৌফিকের কথা উল্লেখ করেননি। কিন্তু ওই একই দিনে মুম্বাই পুলিশ জানালো, তারা যে কয়েকজনকে পাকড়াও করেছে, তাদের মধ্যে একজন তৌফিক, যাকে গুজরাট পুলিশই মূল চক্রী হিসেবে সন্দেহ করেছিল। যদিও এই নিয়ে তদন্ত শেষ করার আগে বিশদে কিছু বলা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে তারা এটাও ঘোষণা করল, কম্পিউটারের সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগুলো সম্পর্কে তৌফিকের যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে। তৌফিক মাস্টার হ্যাকার এবং সেই হেউডের কম্পিউটার হ্যাক করে ই-মেইলগুলো পাঠিয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এটা ধরে নেওয়া যায়, গুজরাট পুলিশ ঠিকঠাক তদন্ত করতে আগ্রহী ছিল। আহমেদাবাদ ও সুরাটের ঘটনার শিকড় খুঁজতে চাইছিল তারা। কারণ, গুজরাটে সন্ত্রাসবাদীরা ঢোকার সাহস পাবে না বলে সরকারের তরফে যে অতিরঞ্জিত প্রচার চলেছিল, এই ঘটনা তাতে বড়সড় ধাক্কা। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তিকে তা ক্ষুণ্ণ করেছিল। কিন্তু অন্যদিকে আইবি, স্বাভাবিক কারণেই এই ঘটনার বিশদ তদন্ত চাইছিল না। তারা চাইছিল, তদন্ত হোক, তবে তাদের দেখানো রাস্তাতেই। শুরুতে যদিও আইবি ও গুজরাট পুলিশের মতপার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো, কিন্তু এটা ধরে নেওয়া যায়, কারোর হস্তক্ষেপে আইবি-র জুতোতেই শেষ পর্যন্ত পা গলায় তারা। কেউ একজন, সম্ভবত আরএসএস-এর বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো নেতা নরেন্দ্র মোদিকে বুঝিয়েছিল, যা হচ্ছে তা দেশের স্বার্থে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বার্থে। অথচ এটা বেশ হাওয়ায় ছুঁড়ে দেওয়ার মতো একটা কথা, যাতে বিশদ ব্যাখ্যাও থাকে না, নেতারাও এটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। আসল কথাটা হলো দিনের শেষে সবকটি তদন্তকারী সংস্থা সেই আইবি-র দেওয়া তদন্তের তত্ত্বেই সহমতে আসবে। হেউডকে ক্লিনচিট দেওয়া হবে। আর কিছু মুসলিম যুবককে বলির পাঁঠা বানিয়ে সেভাবে তথ্যপ্রমাণ সাজানো হবে। প্রমাণ করিয়ে দেওয়া হবে তারাই হেউডের কম্পিউটার হ্যাক

করে ই-মেইল পাঠিয়েছিল। কিন্তু এই তত্ত্ব খাড়া করাতে হলে এমন করতে হবে যাতে কারোর সন্দেহ না হয়। সে কারণে এমন ডাকাবুকো কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ দরকার ছিল, যে অনায়াসে অন্যের কম্পিউটার হ্যাক করতে পারে। এই গুরুত্বপুর্ণ কাজটা আইবি দিয়েছিল মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে। কয়েকজন অফিসারকে সফট টার্গেট বানিয়ে মাথা খাওয়া হয়েছিল তাদের।

সেইমতো মুম্বাই পুলিশ এই কাজটি পায়। শুদ্ধাশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে তদন্ত এগোতে থাকে। তারা এর আগে তৌফিককে হেউডের কম্পিউটার থেকে ই-মেইল পাঠানোর মূল কারিগর বলে জানিয়ে দিয়েছিল। যদিও তৌফিক আদৌ সে কাজটি পারত কিনা তা তারা ভেবে দেখেনি। তাই আচমকাই তার নাম সরিয়ে মুহাম্মদ সাদিক ও আনসারের নাম সামনে আনলো মুম্বাই পুলিশ। কিন্তু পরের দিনই আবার মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানাল, বিয়াজ ভটকল নামে এক ব্যক্তিই এই ই-মেইল পাঠানোর ঘটনার মূল মাথা। কিন্তু দেখা গেল তারা কেউই তেমনটা নয়, যে কারোর কম্পিউটার হ্যাক করে মেইল করে দিতে পারবে। এতএব মুম্বাই পুলিশ বেশ খোঁজখবর চালিয়ে পুনে থেকে তিনজন উচ্চশিক্ষিত কম্পিউটার জানা ব্যক্তি, মনসুর পীরভোয়, মুবিন শেখ এবং আসিফ বাশির শেখকে গ্রেফতার করল। গ্রেফতার করার সময় পুলিশ ছটি কম্পিউটার এবং ওয়াইফাই রাউটার অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করল। তারা যদ্দিন পুলিশ হেফাজতে থাকবে, তদ্দিনের মধ্যেই কম্পিউটারের রেকর্ডে কারসাজি করে তারা দেখাতে চাইবে, হেউডের কম্পিউটার তারাই হ্যাক করে মেইলগুলো করেছিল। এবং অবশ্যই ক্লিনচিট দেওয়া হবে হেউডকে।

আরও কিছু বিষয়ের উত্তর এখনও মেলেনি, যেমন-

১. গুজরাট বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত আছে সন্দেহে মাহাদ এলাকা থেকে যে হিরো হুন্ডা মোটর বাইকটি মিলেছিল, তা থেকে কী জানা গিয়েছিল?
২. ২০০৮ সারের ১৯ সেপ্টেম্বর বাটলা হাউস এনকাউন্টারে দুজন মারা গিয়েছিল। দুজন পালিয়ে গিয়েছিল। এই এনকাউন্টার কি তদন্তে ফাঁকফোকর ভরাতে সাহায্য করেছিল? কারণ মৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল হাতে লেখা ডাইরি, মোবাইল ফোন, বিস্ফোরক, অস্ত্র ইত্যাদি।
৩. সিমির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ নেই বলে স্পেশাল ট্রাইবুনাল যে রায় দিয়েছিল, সেই রায়ের সঙ্গে এই ঘটনার বা তদন্তের কি কোনো যোগাযোগ রয়েছে?

ছজনের নাম সহ 'সংরক্ষিত অভিযুক্তের' গ্রেফতারি

আইবি-র নেতৃত্বে দিল্লি পুলিশ, মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও গুজরাট পুলিশের যৌথ তদন্ত সত্ত্বেও পুলিশ ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিল না। তাছাড়া তদন্তেও কিছু কিছু ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। নীচের সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলো পড়লেই বোঝা যাবে:

মধ্যপ্রদেশ এটিএস কয়ামুদ্দিন কাপাড়িয়া নামে একজনকে গ্রেফতার করে। বাটলা হাউস এনকাউন্টারে যারা মারা গিয়েছিল ও ধরা পড়েছিল, তাদের সাথে এর টানা যোগাযোগ ছিল। তার প্রায় এক ডজন নাম ছিল। কয়ামুদ্দিন কাপাড়িয়া ওরফে মুসা ওরফে ইসফাক ওরফে আবদুল কাদির ওরফে রিজওয়ান। আহমেদাবাদ ও দিল্লি বিস্ফোরণে এই ব্যক্তি জড়িত ছিল। ভাদোদরার তাইওয়াড়ে এলাকার বাসিন্দা। ভদোদরায় এ আর এর ভাই ডিটিপি-র ব্যবসা চালায়। এর বাবা ওই এলাকার একজন ইমাম। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১১ নভেম্বর ২০০৮)

অথচ এই ব্যক্তির নাম কোনদিনও তদন্তে উঠে আসেনি। সংরক্ষিত অভিযুক্ত হিসেবে একে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে একে ধরা হয়েছিল, যাতে ভবিষ্যতে কোনো তদন্তে যদি ফাঁক থাকে, তাহলে এই হবে সেই জায়গা ভরাটের যোগ্য ব্যক্তি। ছটি নামের যেটা মনে হবে সেটাই কাজে লাগানো যাবে। এছাড়া এই গাঁজাখুরি গ্রেফতারির আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এর বাবা ইমাম, আর এরা কম্পিউটারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসা চালায়, ব্যাস আর কী, এটাই গ্রেফতারের সাফাই।

'মূলচক্রী' তৌকিরকে ছেঁটে ফেলা হলো

সরকার, সংবাদমাধ্যমে ও জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বিস্ফোরণে সন্দেহভাজন হিসেবে ওরফেওয়ালা অনেক নামের ব্যক্তিকে গ্রেফতারির ঘটনা এরকমই প্রথম নয়। এবং তদন্তের পরে অতি সামান্যতম বিচ্যুতি হলেও এই নাম নিয়ে ষড়যন্ত্র করার চলটাও ছিল। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তারা আসল লক্ষ্যটাই ভুলে যায়, আর নিজেরাই নিজেদের বিভ্রান্তির শিকার হয়।

আগে যেমনটা আলোচনা হয়েছিল, মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ আইবি-র কথা মেনে তৌকির ওরফে আবদুল সোবাহান ওরফে তৌফিক বিলাল ওরফে আবদুল সোবাহান কুরেশি ওরফে কামিকে বোমা বানানোয় বিশেষজ্ঞ, মাস্টার হ্যাকার, আহমেদাবাদ সহ বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের মূলচক্রী বলে চালিয়েছিল। পরে যে হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলায় গুজরাট ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও দিল্লি পুলিশ। মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের আসল উদ্দেশ্য ছিল হেডডকে ক্লিনচিট পাওয়ানোর জন্য, ওই ব্যক্তিকে হেডডের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ই-মেইল পাঠানোর অভিযুক্ত হিসেবে যাতে সাজানো যায়।

কিন্তু এই অতি উৎসাহে তারা এটাই ভাবতে ভুল করে, যে আদৌ ওই ব্যক্তি এই ধরনের কাজ করার মতো যোগ্যতা রাখে কিনা। পরে যখন জানা যায় যোগ্যতার অনেক নীচে রয়েছে সে, তখন নিজেকেই নিজের থুতু গিলতে হয়েছিল মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে। বাধ্য হয়েই তৌকিরের নাম সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় তারা। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)। অগত্যা মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ তৌকিরকে সংবাদমাধ্যমের বানানো নাম বলে চালিয়ে দেয়। চার্জশিট থেকে বাদ দেওয়া হয় তার নাম। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ৭ অক্টোবর, ২০০৮, *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)। দিল্লি বিস্ফোরণ সংক্রান্ত নোটে এই নিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য মিলবে।

যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার

আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং সুরাটের অবিস্ফোরিত বোমা সংক্রান্ত তদন্ত থেকে যা মিলেছে, তাই থেকেই আমার এই পর্যবেক্ষণ। সংবাদপত্র কেউ যদি খুঁটিয়ে পড়েন, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, আহমেদাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ড ও সুরাটে বোমা রাখার বিষয়টি আইবি-ই করিয়েছিল। নির্দেশ এসেছিল আরএসএস-এর মূল মাথাদের কাছ থেকে। সাথে ছিল কিছু মার্কিন সংস্থা, হেউড যার এজেন্ট। দুটি লক্ষ্য ছিল। এক, মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভালোরকম ধাক্কা দেওয়া। কারণ তিনি তার যে জায়গা, তার থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিলেন এবং আরএসএস ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতাদের মাঝে মধ্যেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। দুই, সিমির বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা কিছু মুসলিম তরুণের বিরুদ্ধে প্রমাণ সাজানো। এর ফলে ট্রাইবুনালের আদেশ সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে চাপে পড়বে। কেন্দ্রীয় সরকার যথারীতি আইবি-র এই কীর্তিকলাপ সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি।

❖ দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ড (১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

- ফাঁকফোকর ভরাট করতে বাটলা হাউস এনকাউন্টার
- ইন্সপেক্টর শর্মার রহস্যজনক মৃত্যু
- সন্ত্রাসবাদীদের সিম কার্ডের হদিস মেলে ঔরঙ্গাবাদে (মহারাষ্ট্র)
- কিন্তু সেগুলো নিয়ে এগোনো হয়নি
- হেউডকে বাঁচাতে মুসলিম তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের মিথ্যে অভিযুক্তকরণ

শুরুর দিন থেকেই মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তিদের ওপর দোষারোপ

১. যখন বিস্ফোরণ হয় তখনই সংবাদমাধ্যমে মেইল করে বিস্ফোরণের দায় নেয় নিষেধাজ্ঞায় থাকা সিমি-র ছায়া সংগঠন 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' এবং লশকর-ই-তাইয়েবা। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

২. গুজরাট পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছিল, আহমেদাবাদ বিস্ফোরণে সন্দেহভাজন সিমি সদস্য কয়ামুদ্দিনকে খুঁজছিল পুলিশ। দিল্লি বিস্ফোরণের পেছনে সে জড়িত থাকতে পারে। সঙ্গে থাকতে পারে আবদুল সোবাহান ওরফে তৌকির। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮, *সকাল,* পুনে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৩. সিমি-তে যোগ দেওয়ার জন্য অভিযোগ, সোবাহান মুম্বাইয়ের একটি বহুজাতিক সংস্থার কাজ ছেড়ে দেয়। গুজরাট পুলিশের দাবি অনুযায়ী বোমা বানানোর ক্ষেত্রে তার গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮, *সকাল,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

অন্যান্য তথ্য

১. পাঁচটি ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৮ জনের মৃত্যু হয়, আহত হন ৭০ জন। কনট প্লেস, গফফর মার্কেট, করোল বাগ এবং গ্রেটার কৈলাশের এম ব্লক মার্কেটে বিস্ফোরণ (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

২. কনট প্লেসে আবর্জনা ফেলার জায়গায় বোমা রাখা হয়েছিল। গ্রেটার কৈলাশে একটি বোমা ডাস্টবিনে অন্যটি সাইকেলে রাখা হয়। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৩. ইন্দিরা গেটের কাছে এবং কনট প্লেসের রিগাল সিনেমার কাছ থেকে কমপক্ষে দুটি অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধার করা হয়। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৪. বোমায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও টাইমার ব্যবহার করা হয়েছিল। (*পুধারি,* পুনে, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৫. মুম্বাইয়ের চেম্বুর এলাকা থেকে আইবিএন সেভেন নিউজ চ্যানেলে ই-মেইল পাঠানো হয়েছিল। (*পুধারি,* পুনে, ১৪ সেপ্টেম্বর, *সকাল,* পুনে, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

দিল্লি পুলিশের দাবি-গুরুত্বপূর্ণ সূত্র প্রাপ্তি

১. বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছে বলে দাবি করে দিল্লি পুলিশ এবং তার জেরে ২০ জনকে আটক করা হয়। (*পুধারি,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
২. মুম্বাইয়ের এক সিমি সদস্যের নাম ঘটনার 'মূলচক্রী' হিসেবে উঠে আসে। উত্তরপ্রদেশের আরও তিন ব্যক্তির নাম সন্দেহভাজনের তালিকায় চলে আসে। (*পুধারি,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৩. দিল্লি ও আহমেদাবাদ বিস্ফোরণে অনেক কিছু মিল রয়েছে বলে দাবি করে দিল্লি পুলিশের মুখপাত্র। (*পুধারি,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৪. মুম্বাই বিস্ফোরণের 'মূলচক্রী' তৌকিরের বিরুদ্ধে তদন্ত চলে। মুম্বাইয়ে ওয়াইফাই সিস্টেম হ্যাক করে সেই 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র নাম করে টিভি চ্যানেলে ই-মেইল পাঠিয়েছিল। (*পুধারি,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৫. মুম্বাইয়ের তৌকির ওরফে আবদুস সোবাহান কুরেশি ওরফে তৌকির বিলাল সন্দেহভাজনের তালিকায়। তার খোঁজে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি চালায়। (*পুধারি,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৬. নবি মুম্বাইয়ের বিদ্যা ভবন থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে এবং আন্ধেরির একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেয় তৌকির। (*পুধারি,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

বেশ কয়েকজনকে আটক করার পর, দিল্লি পুলিশের এনকাউন্টার

১. বাটলা হাউসে পুলিশের এনকাউন্টারে আতিফ ও সাজিদ নামে দুই অভিযুক্ত সন্ত্রাসী নিহত হয়। দুজন পালিয়ে যায়। সাইফ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়। সবচে গুরুত্বপূর্ণ, দিল্লি পুলিশের

এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট ইন্সপেক্টর মোহন চাঁদ শর্মার মৃত্যু হয়। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের জয়েন্ট কমিশনার এই তথ্য দেন। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

২. পুলিশের দাবি অনুযায়ী, আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের মূল অভিযুক্ত আবুল বাশার স্বীকার করে, আতিক (আতিফ) ওরফে বাশার এবং সে নিজে জামিয়া নগরের বাটলা হাউসের কাছে কিছু দিনের জন্য ছিল। তাদের সঙ্গেই ছিল দিল্লি বিস্ফোরণের 'মূলচক্রী' তৌকির। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮) আবুল বাশারকে ওই এলাকা চিহ্নিতকরণের জন্য আনা হয়। আতিক (আতিফ) একটি বিল্ডিং-এর তিন তলায় রয়েছে, এটা নিশ্চিত হওয়ার পরেই পরের দিন সকালে পুলিশ তাদের অভিযান শুরু করে। (*সকাল*, পুনে, ২০ সেপ্টেম্‌বর ২০০৮, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

এনকাউন্টারের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে সব রকম তথ্য, তাদের সংগঠন ও তাদের কুকীর্তির সব কথা জেনে ফেলল

১. দিল্লি পুলিশ দাবি করে নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি ও 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র সঙ্গে পাকিস্তানের লশকর-ই-তাইয়েবার গুরুত্বপুর্ণ সংযোগ রয়েছে। এরাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্ফোরণে দায়ী।

২. আতিফ (আতিক) ওরফে বশির 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র মূল নেতা। সম্ভবত আল-কায়েদার ওসামা বিন লাদেনের থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে সে। দাবি করেন দিল্লি পুলিশের জয়েন্ট সিপি স্পেশাল সেল কর্ণাল সিং।

৩. পুলিশ আতিফের ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করে। যার মধ্যে আল-কায়েদা ও ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কিত জিনিসপত্র ছিল।

৪. সিং-এর দাবি, শুক্রবারের শ্যুটআউটের মধ্যে জামিয়া নগর থেকে সাইফকে গ্রেফতার করা হয়। রাতে গ্রেফতার করা হয় জীশানকে। এদের দিয়েই গত বছরের উত্তরপ্রদেশ আদালতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের তদন্তের নিষ্পত্তি হয়। সাজ্জাদের সঙ্গে সইফ বারাণসী আদালতে বোমা রেখেছিল। সাজ্জাদ 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র মূল বোমা তৈরির কারিগর বলে সন্দেহ করা হয়।

৫. সিং-এর দাবি, রাজধানীতে বিস্ফোরণের জিনিসপত্র আনা হয়েছিল কর্ণাটক থেকে।

৬. সূত্র মারফত খবর পেয়ে পুলিশ সন্দেহভাজন জঙ্গি জীসানকে গ্রেফতার করে। একটি নিউজ চ্যানেলে জীসান ইন্টারভিউয়ের জন্য গিয়েছিল, সেই অফিস চত্বর থেকেই তাকে গ্রেফতার হয়।
৭. মুহাম্মদ সইফের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বোমা রেখেছিল এরকম আরও দশজন ব্যক্তির খোঁজ চলছে।
৮. কনট প্লেসের রিগাল সিনেমার কাছে সাইফ-ই বোমা রেখেছিল বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে।
৯. তদন্তকারীদের সইফ আরও জানায়, আতিফই এই বিস্ফোরণের মূলচক্রী। গ্রেটার কৈলাস মার্কেটে সেই বোমা রেখেছিল। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

পরবর্তী তদন্ত নিয়ে সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদন

১. সাইফ ও জীসানের পর জামিয়া নগর থেকে আরও তিন সন্দেহভাজন জিয়াউর রহমান, শাকির নিসার ও মুহাম্মদ শাকিলকে রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮) গ্রেফতার করে পুলিশ। (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, পুনে এবং *সকাল,* পুনে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
২. ধৃত তিন ব্যক্তির কাছ থেকে জানা যায়, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন আরও বড়সড় ভাবে রাজধানীতে হামলার পরিকল্পনা করছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় কমপক্ষে গোটা কুড়ি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৩. বাটলা হাউসের কেয়ারটেকার আবদুর রহমানকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। ফ্ল্যাটের মালিকের সই নকল করার অভিযোগে জিয়ার বাবাকেও গ্রেফতার করা হয়। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৪. দিল্লি পুলিশ, লখনউয়ের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে হানা দেয়। আতিফ ও তার সঙ্গী শাকিব-এর ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে। শুরুতে এই রকম খবর আসে যে শাকিবের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নাকি প্রায় তিন কোটি টাকা লেনদেন হয়। পরে জানা যায়, সে কথা নেহাতই ফলাও করে বলা হয়েছিল, কারণ তার অ্যাকাউন্টে ছিল মাত্র ১,৪৩৭ টাকা। তিন থেকে চারটি লেনদেন হয়েছিল, তবে তা কোনো ভাবেই ২০ হাজার টাকার বেশি নয়। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৫. দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ১৩ জনের ৯ জন হলো, আতিফ আমিন ওরফে বশির (২২), মুহাম্মদ শাকিল (২৪), মুহাম্মদ সাইফ (২২), মুহাম্মদ সাজিদ ওরফে পঙ্কজ (১৭), জীসান (২৪), শাকিব নাসির (২৩), জিয়াউর রহমান (২২), আরিফ (২১) এবং সাজিদ। এদের মধ্যে আতিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে আহমেদাবাদ, বারাণসী, জয়পুর ও হায়দরাবাদ বিস্ফোরণেও জড়িত। মুহাম্মদ শাকিল ও মুহাম্মদ সাজিদ ওরফে পঙ্কজের যোগ ছিল আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের সঙ্গে। আহমেদাবাদ ও বারাণসী বিস্ফোরণে নাম ছিল মুহাম্মদ সাইফের। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৬. কলকাতা পুলিশ দাবি করে মুহাম্মদ সাদিক ওরফে সাদাকত, দেশে ঘটে চলা ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত। দিল্লি ও আহমেদাবাদ বিস্ফোরণেও এর যোগ রয়েছে। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১১ নভেম্বর ২০০৮)

৭. দিল্লির বাটলা হাউস এনকাউন্টারে নিহত জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া সিম কার্ড নেওয়া হয়েছিল মাস দুয়েক আগে। নকল কাগজপত্র দেখিয়ে ঔরঙ্গাবাদের কাছে চিট্টে পিম্পালগাঁও নামে একটি জায়গায়, গৌরি এন্টারপ্রাইজ নামের দোকান থেকে সিম কার্ডগুলো মাস দুয়েক আগে নেওয়া হয়েছিল। এটিএস-এর করা তদন্তে এই তথ্য মিলেছিল। বলা হয়েছিল, আরও এরকম পনেরোটি সিম কার্ড মিলেছিল, যা ২০০৭-এর এপ্রিল থেকে ব্যবহার করা হচ্ছিল। (মারাঠি দৈনিক *লোকমত*, নাগপুর, ৮ ডিসেম্বর ২০০৮)

আরও আশ্চর্যজনক তথ্য হলো, বাটলা হাউসে যখন এনকাউন্টার চলছিল, তখন ঔরঙ্গাবাদের একটি মোবাইল নম্বরে একটি সিমকার্ড থেকে ফোনে কথা বলা হয়। এক সন্ত্রাসবাদীর ফোন কলের বিবরণ থেকে এই তথ্য মেলে। চিট্টা পিম্পালগাঁও-এর 'নওয়াজ আজিজ শেখে'র নামে এই কার্ডগুলো তোলা হয়। পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি চালায় ভালোরকম তদন্ত করে। কিন্তু ওই নামে ওই এলাকায় কাউকেই পাওয়া যায়নি।

এটিএস তদন্তে আরও উঠে আসে, সেই মোবাইল ফোনের দোকান গৌরি এন্টারপ্রাইজের মালিক মঙ্গেশ দশেপান্ডে নিজেই নকল কাগজপত্র ব্যবহার করে সিম কার্ড তুলেছিল। তারপর তা চালু করে সন্ত্রাবাদীদের দিয়েছিল। পুলিশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং গ্রেফতার করা হয় তাকে, তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়নি, সিম কার্ড ঠিক কে নিয়েছে। কে সেগুলো অর্ডার করেছে বা

সেগুলোর জন্য টাকা দিয়েছে। কে সেগুলো ব্যবহার করত আর কে এখন করছে, সেটিও জানা যায়নি। (মারাঠি দৈনিক *লোকমত*, নাগপুর, ৮ ডিসেম্বর ২০০৮)

কিছু অংশের চার্জশিট দায়ের

১. করোল বাগ বিস্ফোরণের অংশটুকু নিয়ে আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পাঁচজন অভিযুক্তের নাম ছিল তাতে, মুহাম্মদ সাইফ, জীসান আহমেদ, সকিব নিসার, জিয়াউর রহমান এবং মুহাম্মদ শাকিল।

২. চার্জশিট অনুযায়ী, করোল বাগ বিস্ফোরণের তদন্তে ২২ জন জড়িত ছিল বলে জানা গেছে। এর মধ্যে জামিয়া নগরে দুজন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছে। ১৩ জন এখনও ফেরার। মুম্বাই পুলিশের জিম্মায় রয়েছে এক অভিযুক্ত মুহাম্মদ মনসুর বীরভোয়। সাদিক শেখ ও কয়ামুদ্দিনের বিরুদ্ধে আলাদা ভাবে চার্জশিট দেওয়া হবে বলে আদালতে পুলিশ জানায়।

৩. যেহেতু টেলিফোনে কথোপকথন পুলিশ ধরে ফেলেছিল, তাই চার্জশিটে তারা স্বীকার করে, চাইলে এই দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই এড়ানো যেত। যে মোবাইল ফোন নম্বরটির (৯৮১১০০৪৩০৯) ওপর নজারদারি চলেছিল, সেটি মুহাম্মদ আতিফ আমেনের। আতিফ 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র শাখা নেতা বলে অভিযোগ। ২০০৭ উত্তরপ্রদেশ আদালতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ সংক্রান্ত যে মেইলগুলো পূর্ব দিল্লির একটি সাইবার ক্যাফে থেকে করা হয়েছিল। সেই জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে আতিফের নম্বরটির হদিস মেলে। দিল্লি বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগে ২ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ তার কথোপকথনের ওপর নজরদারি চালায়।

৪. চার্জশিটে পুলিশ গ্রেফতার হওয়া সন্ত্রাসবাদীদের মোবাইল ফোন নম্বরের তালিকা জমা দেয়। আর বোঝা যায়, আতিফ ও তার সঙ্গীরা বিস্ফোরণের আগে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিল।

৫. পুলিশ দাবি করে তারা আতিফের ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করে। তাতে অসংখ্য জিহাদি গান ও সাহিত্য ছিল। তার মোবাইল ফোনের ডেটা থেকেও ল্যাপটপে অনেক কিছু নেওয়া হয়। বিভিন্ন বিস্ফোরকের ভিডিও ক্লিপস, গাড়ি, আহমেদাবাদের যে জায়গায় বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেই জায়গার ছবিও তাতে ছিল।

৬. পাঁচ অভিযুক্তকে জেরা করে জানা যায়, আতিফও দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল। ২০০৫ সাল থেকেই এই কাণ্ড করে আসছে সে।

৭. চার্জশিটে বলা হয়, পাকিস্তানের আমির রাজা খান সিমি আর লশকর-ই-তাইয়েবা সাহায্যে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' নামে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি করে। তার চারটি শাখা-দুটি দক্ষিণ ও উত্তরে সন্ত্রাসী হানা চালানোর জন্য, একটি ভিভিআইপি-দের ওপরে হামলা চালানোর জন্য এবং চার নম্বরটি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮)

৮. নথিপত্রে থাকা তথ্য—*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* (১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮) পুনে সংস্করণে চার্জশিটের কিছু অংশ প্রকাশ হয়েছিল। তাতে এই মামলার মূল প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল:

- ২০০৮-এর ২ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর আতিফের মোবাইল ৯৮১১০০৪৩০৯ -এর ওপর পুলিশ নজরদারি চালায়।
- অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদীদের মোবাইল নম্বরই বলে দিয়েছে, বিস্ফোরণ স্থলে তারা ছিল।
- আতিফের কাছ থেকে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ভিডিও ক্লিপস, মোবাইলের মেমোরি কার্ড উদ্ধার হয় বলে দাবি করা হয়।
- ধৃত অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি।

প্রমাণ যা মিলেছে তার কীরকম আইনি বৈধতা রয়েছে?

১. মোবাইল ফোনের কথোপকথনের ওপর নজরদারি

চার্জশিটে মজার ব্যাপার হলো, বিস্ফোরণের আগে টেলিফোনের কথোপকথন ধরে ফেলা নিয়ে পুলিশ যেচে এবং অপ্রয়োজনীয় ভাবে যেরকম নিজেদের দায় স্বীকার করল। এ নেহাত তাদের বিবেকের দংশন। তাই যদি হয়, তবে হয় তারা কোনো বিষয় চেপে যেতে চাইছিল, আর নয়তো তারা এমন কিছু প্রমাণ করতে চাইছিল, যার অস্তিত্ব আদৌ নেই। এই তথ্যপ্রমাণ স্রেফ বানানো ও মিথ্যা। এই ঘটনায় যদি স্বচ্ছ ভাবে তদন্ত ও বিচার চলে, তাহলে নীচের বিষয়গুলো নিয়ে সাফাই দিতে হলে পুলিশকে চাপে পড়তে হবে:

- ২০০৭ উত্তরপ্রদেশ আদালতে বিস্ফোরণের ঘটনায় পাঠানো ই-মেইলগুলো নিয়ে পুলিশ ঠিক কবে তদন্ত শুরু করে?

- আতিফের মোবাইল নম্বর ঠিক কখন পেল পুলিশ?
- আতিফের সিম কার্ড কোথা থেকে কেনা হয়েছিল, কার নামেই বা কেনা হয়েছিল?
- ওই নম্বরের কল রেকর্ড কি পাওয়া যাবে? যদি পাওয়া যায়, তাহলে যে যে মোবাইল নম্বরে ফোন করা হয়েছিল, সেই সেই মোবাইল নম্বরগুলোর সঙ্গে আতিফের নম্বরের কথা বলার সময় আদৌ মিলবে তো? আতিফের ফোন থেকে যে নম্বরে ফোন করা হয়েছিল, সেই নম্বরগুলোতে ঠিক সেই সময়ে আতিফের নম্বর থেকে ফোন এসেছিল তো?
- সন্ত্রাসবাদীরা কীরকম সাংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা চালিয়েছিল? সেই কথাবার্তা কখন ও কেমন করে পুলিশ বুঝে ফেলে?

২. অভিযুক্ত অন্যান্য ধৃতদের মোবাইল নম্বর

প্রমাণ স্বীকার করে নেওয়ার আগে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আদালতকে সন্তুষ্ট করানো প্রয়োজন,

- সিম কার্ডগুলো কাদের নামে?
- কে সেগুলো কিনেছিল? কাদের কাছ থেকে কিনেছিল?
- সেই সব নম্বরে কলরেকর্ড কি পাওয়া যাবে?

৩. ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, মেমোরি কার্ড ও আতিফের ভিডিও ক্লিপস

ল্যাপটপের ডেটা, মোবাইল ফোন, মেমোরি কার্ড কিংবা ভিডিও ক্লিপস মিথ্যে ভাবে বানানো কি একেবারেই অসম্ভব? প্রমাণের সত্যতা কীরকম, তা প্রমাণ করা বেশ কঠিন কাজ, যদি না পুলিশ সন্দেহাতীত ভাবে স্থানীয় কোনো ব্যক্তির সামনে ঠিক ওই জায়গা থেকেই এগুলো উদ্ধার করে থাকে। বাটলা হাউস এনকাউন্টার নিয়ে যে বিতর্ক ঘনিয়েছিল, সেটাও পুলিশের পক্ষে প্রমাণ করা বেশ কঠিন।

৪. ধৃত অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তি

যেখানে বেশিরভাগ জবানবন্দি পুলিশ অফিসাররাই নিয়েছে, ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী তা তথ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। যদিও কিছু কঠোর আইনের জেরে তা গ্রাহ্যও হয়ে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই উচ্চতর আদালতের বিচারযোগ্য। সে কারণেই এই ধরনের জবানবন্দির ওপর বিচারবিভাগের নজরদারি জরুরি।

তদন্তের যা ফাঁকফোকর

এই তদন্তে ফুটবলের আকৃতির গর্ত রয়ে গেছে, যার নাম বাটলা হাউস এনকাউন্টার। যে এনকাউন্টারে দুই 'সন্ত্রাসবাদী' আতিফ আর সাজিদের মৃত্যু হয়, দুজন পালায়, সাইফ নামে একজন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, রহস্যজনক ভাবে দিল্লি পুলিশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট ইন্সপেক্টর মোহন চাদ শর্মা নিহত হন। প্রায় প্রত্যেকটা খবরের কাগজ এই ঘটনাকে বেশ ভালোরকম প্রচার করে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনার সমালোচনা করেন। তারা দাবি করেন, এটা ফেক এনকাউন্টার। তারা এর বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলেন। যদিও তাদের দাবি সত্যি, সেটা প্রমাণ করা বেশ শক্ত কাজ। তবে কোনো শক্তপোক্ত মূল্যায়নে পৌছনোর আগে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ভেবে দেখা জরুরী:

১. দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল কি আগে থেকেই জানত যে জামিয়া নগরের বাটলা হাউস এল-১৮-এ সন্ত্রাসবাদীরা রয়েছে, নাকি তারা সেখানে তদন্ত করতে গিয়ে আচমকাই সন্ত্রাসবাদীদের সন্ধান পেয়ে যায়?

খবরের কাগজের প্রতিবেদনগুলো খতিয়ে দেখলে মনে হয়, পুলিশ আগে থেকেই জানত বাটলা হাউসের এল-১৮-এ সন্ত্রাসবাদীরা থাকছে। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, তারা যদি বাটলা হাউসের এল-১৮-এ তদন্ত করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সামসাসামনি হয়ে যায়, তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গত কয়েকবছর ধরে ঘটা সবকটি বিস্ফোরণ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তাদের হাতে এসে গেল? ওই একই দিনে সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লি পুলিশ কমিশনার ওয়াই এস দাদওয়াল ঘোষণা করলেন, আতিফই সাম্প্রতিক সব বিস্ফোরণের 'মূলচক্রী' আর বোমা তৈরি করেছিল সাজিদ। সাজিদ বিস্ফোরক বানিয়েছিল, আর তার টিম সেগুলো নিয়ে গিয়েছিল—

দুটি ডেটোনেটর, কাঠের ফ্রেম, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও কোয়ার্টজের ঘড়ি। দাবি ছিল দাদওয়ালের। (*হিন্দুস্তান টাইমস*, দিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে পুলিশ সকালে পর্যন্ত গুলির লড়াই হবে বলে ভাবতেই পারেনি, সেখানে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা বলে দিল, দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বোমায় সাজিদের নাম রয়েছে।

প্রথম সারির খবরের কাগজে যে প্রতিবেদনগুলো ছাপা হয়েছিল, বিশ্বস্ত সূত্র মারফত পাওয়া খবরকে উদ্বৃত করে তারা জানায় বাটলা হউসের এল-১৮-এ সন্ত্রাসবাদীরা লুকিয়ে আছে, পুলিশ আগে থেকেই তা জানত।

- মারাঠি দৈনিক *সকাল,* ২০০৮-এর ২০ সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদন, তাকে (আবুল বাশার, আহমেদাবাদ বিস্ফোরণে অভিযুক্ত) বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ঘটনাস্থল চিহ্নিত করতে নিয়ে আসা হয়। আতিফ সেই এলাকার একটি বাড়ির তিনতলায় আছে জানার পরেই, পরদিন সকালে শুরু হয় অভিযান।
- *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে (২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮) প্রকাশিত প্রতিবেদনেও দাবি, আহমেদাবাদ বিস্ফোরণে অভিযুক্ত আবুল বাশারের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পরেই পুলিশ জনবহুল জামিয়া নগরে ওই বাড়িটি এনএসজি কমান্ডোর সাহায্যে ঘিরে ফেলে।

যদি তাই হয়, তাহলে পুলিশের স্পেশাল সেল নিশ্চয়ই জেনে থাকবে যে ওই এল-১৮ বাড়িটিতে সন্ত্রাসবাদীদের শীর্ষ নেতা ও তার সঙ্গীরা থাকছিল। তাহলে প্রশ্ন, কেনো পুলিশ তবে সাধারণ ভাবে যা করা হয়ে থাকে, ওই বাড়িটি ঘিরে ফেলে সন্ত্রাসবাদীদের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করা হয় সেটি করল না? সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ বা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে রাখতে পারত তারা। কিন্তু কেনো এই সব প্রথাগত বিষয়ের পথে হাঁটল না পুলিশ?

২. তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদেরও আচার আচরণে কোথাও কি বিবেক দংশনের চিহ্ন মিলেছিল?

যদি বিভিন্ন খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর ওপর বিশ্বাস করা যায়, তাহলেও উত্তরটা 'না-ই হবে। যেমন,

- বাড়ি ভাড়া নেওয়ার আগে বাড়ির কাগজপত্র দেখাতে আতিফ নিজে অগাষ্ট মাসে স্থানীয় পুলিশ থানায় গিয়েছিল। তার ও তার বন্ধুর পরিচয়পত্র ও ভাড়ার কাগজ দেখিয়েছিল। (মারাঠি সাপ্তাহিক *শোধন,* ১৪-২০ নভেম্বর ২০০৮)
- আতিফের ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল। স্বাভাবিক ভাবে ওই লাইসেন্সে তার সবকিছু আসল বিবরণ থেকে থাকবে (*দ্য মিলি গেজেট,* ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)
- জীসান, আসিফের সঙ্গে একই ফ্ল্যাটে থাকছিল। এনকাউন্টারের দিন সে কাজে গিয়েছিল। ফিরে এসে যখন সে ঘটনার কথা জানতে পারে, সে কিন্তু পালিয়ে যায়নি। সে যে নিরাপরাধ, সেটা জানাবার জন্যই সে আজ তক টিভির অফিসে গিয়েছিল। সেখান থেকেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। (মারাঠি সাপ্তাহিক *শোধন,* ১৪-২০ নভেম্বর ২০০৮)

- আহমেদাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিল সাকিব। বিস্ফোরণের সময় সে দিল্লিতে পরীক্ষা দিচ্ছিল। (মারাঠি দৈনিক *শোধন*, ১৪-২০ নভেম্বর ২০০৮)
- তারা সিম কার্ড কিনেছিল আসল নথি দেখিয়ে। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)
- যারা পড়াশোনা করছিল, স্কুল আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই তাদের আসল নাম-ধাম নথি রয়েছে। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)
- তারা তাদের থাকার জায়গা ঘন ঘন বদলায়নি, তারা পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ নভেম্বর ২০০৮)

ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বিবেক দংশনের কোনো জায়গাই তৈরি হওয়ার কথা নয়।

৩. স্পেশাল বা আইবি-র সিনিয়িরদের প্রতি কি ভুল বার্তা দিয়ে ফেলেছিলেন ইন্সপেক্টর মোহন চাঁদ শর্মা?

এ সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। না হলে মোহন চাঁদ শর্মার মতো একজন দক্ষ অফিসারকে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল থেকে সরিয়ে কেনো ঝরোদা কালন পুলিশ ট্রেনিং কলেজে বদলি করা হবে। একে বলা হচ্ছিল শাস্তি স্বরূপ বদলি। (*পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* ২২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮)

ঘটনার কিছুদিন আগেই এই বদলির নির্দেশ এসেছিল। তাঁকে স্পেশাল সেলের দায়িত্ব থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নতুন পদে যোগ দেওয়ার বদলে তিনি ছুটি নিয়েছিলেন। কিন্তু স্পেশাল সেল থেকে এভাবে অনাড়ম্বর ভাবে তার চলে যাওয়ার কারণ কী থাকতে পারে? তার তরফ থেকে কি কোনো গাফিলতি হয়েছিল, নাকি তিনি দিল্লি পুলিশ ও আইবি সম্পর্কে এমন কিছুই জেনে ফেলেছিলেন যেটা তার জানার কথা নয়? যাই হোক না কেনো? শর্মা আর কোনো ভাবেই আইবি ও স্পেশাল সেলের গুডবুকে ছিলেন না। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই পরিস্থিতিই যদি থাকে, তাহলে তড়িঘড়ি করে তাঁকে কেনো বাটলা হাউসের মতো অভিযানে ডেকে পাঠানো হলো, যেখানে আবার তিনি ছুটিতে ছিলেন?

৪. ইন্সপেক্টর শর্মা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট (বিপিভি) কেনো পরে ছিলেন না?

বিভিন্ন সময়ে পুলিশের তরফ থেকে যে সব কারণ দেওয়া হয় তা পরস্পর বিরোধী ও মোটেই বিশ্বাযোগ্য নয়। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের বড়কর্তারা সাফাই দেয়, যেহেতু বাটলা হাউস বেশ ঘিঞ্জি এলাকা, সে কারণে গোটা বিষয়টার মধ্যে গোপনীয়তা রক্ষা করতেই বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট না পরার পরামর্শ দেওয়া

হয়েছিল। (*তেহেলকা,* দিল্লি ৪ অক্টোবর ২০০৮)। তারা আরও বলে, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে ওই রকম এলাকায় ঢুকলে, অভিযুক্তরা আগেভাগে সতর্ক হয়ে পালিয়ে যেতে পারত। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* দিল্লি ৯ অক্টোবর ২০০৮)। কিন্তু যখন তাদের পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, সাজিদকে তবে কীভাবে পরপর মাথায় গুলি করা হলো, তখন গল্প ফাঁদা হয়, একজন পুলিশকে লক্ষ্য করে সাজিদ যখন গুলি ছোঁড়ে তখন সে মাটিতে শুয়েছিল। আর সেই পুলিশ যে ইন্সপেক্টর শর্মা অবশ্যই নন, সে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেছিল, পাল্টা সাজিদকে একে-৪৭ থেকে গুলি ছোঁড়ে, যা লাগে তার মাথায়। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* দিল্লি ৮ অক্টোবর ২০০৮)। তাহলে প্রশ্ন হলো, কোনো কোনো পুলিশ বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরেছিল, কিন্তু গোপনীয়তা রাখতে গিয়ে ইন্সপেক্টর শর্মাকেই শুধু সে জ্যাকেট গায়ে তুলতে দেওয়া হলো না? দিল্লি পুলিশ আগে দাবি করেছিল তারা নেহাত ছোটখাট অস্ত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। এক-৪৭ এর গল্প তো আগের সেই দাবিকেও নাকচ করে দেয়। (*দ্য হিন্দু দিল্লি,* ১০ অক্টোবর ২০০৮)

৫. ইন্সপেক্টর শর্মার সামনে থেকে না পেছনের দিকে গুলি লেগেছিল? বুলেট কি ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, না হাসপাতালে সেটি বের করা হলো?

খবরের কাগজে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে এল-১৮ বিল্ডিং থেকে ইন্সপেক্টর শর্মাকে যখন বের করে আনা হচ্ছে, তখন তার সামনে কোনো রক্তের চিহ্ন ছিল না। অথচ পুলিশ দাবি করেছিল তাঁকে সামনে থেকে গুলি করা হয়েছে। একটি বুলেট তার বাম হাত ছুয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, অন্যটি ডান দিকে তার পেট ফুঁড়ে, পশ্চাৎদেশ থেকে বেরিয়ে যায়। (*দ্য হিন্দু,* দিল্লি, ১০ অক্টোবর ২০০৮) এই কারণে পুলিশের দাবি, পেছনে যেখান থেকে বুলেট ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, সেখানে রক্তপাত হচ্ছিল। বুলেট ছুঁয়ে বেরিয়ে যাওয়ার যে ভাবনা, তাতে কিছু বিরোধিতা রয়েছে।

- ইন্সপেক্টর মোহন শর্মার পোস্টমর্টেম করেছিলেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউড অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এর এমন একজন সিনিয়ার ডাক্তারের মতে, বুলেট কোথা দিয়ে ঢুকে কোথা দিয়ে ঠিক বেরিয়ে যায়, এইটা বোঝা ভারী দুষ্কর ছিল। কারণ হলি ফ্যামিলির (হাসপাতাল) এক ডাক্তার সব প্রমাণ ঘেঁটে দিয়েছিলেন। (*তেহেলকা,* ৪ অক্টোবর ২০০৮)
- হিন্দি দৈনিক অমর উজালা ডাক্তর রাজেশ চাওলাকে উদ্ধৃত করে জানায় বুলেট বের করে নেওয়া হয়েছে। ডাক্তার চাওলাকে বিশেষ ভাবে অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে ডেকে আনা হয়েছিল। তিনি ওই খবরের কাগজে জানান, গুলি লাগার কারণে ফুসফুস ও নীচের অংশ

থেকে মারাত্মক ভাবে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তবে বুলেট বের করে নেওয়ার পর হয়তো শর্মা বেঁচেও যেতে পারেন।

- কয়েকটি খবরের কাগজের প্রতিবেদনে প্রকাশ হয়, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী শর্মার দুটি গুলি লেগেছিল। দুটি গুলিই তাঁকে ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়, কোনো গুলিই আলাদাভাবে শরীর থেকে বের করা হয়নি। এইভাবে গুলি ছুঁয়ে বেরিয়ে যাওয়া বা গুলি বের করে নেওয়া নিয়ে নানান তত্ত্ব ইন্সপেক্টর শর্মার মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। ডাক্তার অ্যাপোলো হাসপাতালের ডাক্তার রাজেশ চাওলা এবং এইমস এর সিনিয়র ডাক্তারের বয়ান, নতুন করে তদন্ত করার জন্য যথেষ্ট।

৬. দুজন "সন্ত্রাসবাদী" পালাল কী করে?

যেখানে পুলিশের দাবি মতো এলাকাটি বেশ ঘিঞ্জি, বাড়িটি ঘিরে রাখা হয়েছিল, তাহলে তথাকথিত 'এনকাউন্টারের' পর দুজন 'সন্ত্রাসবাদী'র পালানোটা অবাস্তব, অসম্ভব। পুলিশের সাহায্য ছাড়া এইরকম পরিস্থিতিতে কারোর পক্ষেই পালানো সম্ভব নয়। এটা কি মনে হচ্ছে না, যে ওই দুইজন 'সন্ত্রাসবাদী'কে 'বিশেষ কোনো কাজ' দেওয়া হয়েছিল, আর সেটা করার পরেই তাদেরকে পালিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল?

৭. বাটলা হাউসে 'সন্ত্রাসবাদী'রা রয়েছে বলে খবরটি কে দিয়েছিল?

- প্রাথমিক ভাবে বলা হচ্ছিল ১০ অগাস্ট আহমেদাবাদ পুলিশের হাতে ধৃত আজমগড়ের মুফতি আবুল বাশারের মাধ্যমে খবর পেয়ে বাটলা হাউসে অভিযান চালানো হয়েছিল। পরে দিল্লি পুলিশ ঘোষণা করে, ওই আবুল বাশার নামেই অন্য একজনের কাছ থেকে এই খবর তারা পায়। এই আবুল আহমেদাবাদেরই একজন ইমাম। এলাকার কিছু বস্তিতে বিনামূল্যে জল দিত সে। পরে তাকেও গ্রেফতার করে আহমেদাবাদ পুলিশ। *দ্য মিলি গেজেট*, (১-১৫ অক্টোবর ২০০৮)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় স্তরে তদন্তের বড়সড় খোলসা করে ফেলেছে (গুজরাট) পুলিশ। প্রায় প্রত্যেকটা বিস্ফোরণে ওই ব্যক্তিই (আজমগড়ের আবুল বাশার) জড়িত আছে বলে অনুমান পুলিশের। যদিও দিল্লি পুলিশ বারবার দাবি করে আসছে সে তার সমনামীর (আহমেদাবাদেও আবুল বাশার) সঙ্গে কোনো দিনও দেখা করেনি। দিল্লি পুলিশ আহমেদাবাদেও আবুল বাশারের ওপরেই বেশ নজর দিয়েছিল। কে যে ঘটনার 'মূলচক্রী' এই বিতর্ক তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেয়। যদিও দিল্লি পুলিশ

প্রধান অবশ্য এই অভিযানের সঙ্গে কোনো বাশারেরই যোগাযোগ নেই বলে দাবি করে বসে। এটা স্পষ্ট, গুজরাট পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল।

- এই ধোঁয়াশার অভিযান নিয়ে একটি প্রতিবেদনে দিল্লি পুলিশ ও গুজরাট পুলিশের পেশাদারি প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলা হয়। মুম্বাই পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়েই এই অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই সন্দেহজনক জায়গার ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছিল। কিন্তু মুম্বাই পুলিশ আরও কিছু তথ্য প্রকাশ করার আগেই দিল্লি পুলিশ অতি উৎসাহী হয়ে এনকাউন্টারে নেমে পড়ে। দিল্লি পুলিশের এই নজরকাড়া অভিযান মুম্বাই পুলিশকে খেপিয়ে তুলেছিল। 'মূলচক্রী'দের দিল্লি পুলিশ যে তালিকা তৈরি করেছিল, সেটা মুম্বাই পুলিশের পছন্দ ছিল না। তারা তাদের নিজেদের 'মূলচক্রী'দের একটা তালিকা তৈরি করতে চাইছিল। (*মুসলিম ইন্ডিয়া,* নভেম্বর ২০০৮)। আশ্চর্যজনক ভাবে আতিফ (আতিক) ছাড়া দুটি তালিকার মধ্যে নামের আর কোনো মিল নেই। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এবং *সকাল,* পুনে, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮)। পরে দিল্লি পুলিশের মুখরক্ষা করতে তাদের নামের তালিকাই মেনে নিতে বাধ্য হয় মুম্বাই পুলিশ।

৮. ঔরঙ্গাবাদ সিম কার্ডের রহস্য

যে 'সন্ত্রাসবাদী'রা মারা গিয়েছিল ও তাদের সঙ্গীসাথীদের সিম কার্ড থেকে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের যোগ মেলে। এটিএস-এর তদন্তে জানা যায় সিমকার্ডগুলো মঙ্গেশ দইপোড়ে নামে একজনের। নকল কাগজপত্র দিয়ে ওই সিমকার্ডগুলো তুলেছিল ঔরঙ্গাবাদের কাছে চিট্টে পিম্পালগাঁও এলাকার গৌরি এন্টারপ্রাইজ নামে মোবাইলের দোকানের ওই মালিক মঙ্গেশ। নওয়াজ আজিজ শেখ নাম দিয়ে সিমকার্ডগুলো সে তোলে। ওই নামে ওই এলাকায় কোনো ব্যক্তি নেই বলে জানতে পেরেছিল পুলিশ। এনকাউন্টারের সময় একজন সন্ত্রাসবাদী একটি সিম কার্ড থেকে ঔরঙ্গাবাদে কারোর সঙ্গে কথা বলেছিল বলে সেটির কল লিস্ট থেকে জানতে পেরেছে পুলিশ। (মারাঠি দৈনিক *লোকমত, নাগপুর,* ৮ ডিসেম্বর ২০০৮)। এই ঘটনার ঠিকঠাক তদন্ত হলে অদ্ভুতুড়ে তথ্য বেরিয়ে আসবে, যা তদন্তের মোড়ই ঘুরিয়ে দিতে পারে।

ওপরের যে বিষয়গুলো বলা হলো, তা মাথায় রাখলে শুধু ইন্সপেক্টর শর্মার মৃত্যু সহ বাটলা হাউস এনকাউন্টারের ক্ষেত্রেই নয়, গোটা দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ড

নিয়েই যোগ্য লোককে দিয়ে আরও তদন্ত করানো উচিৎ। যে তদন্তকারী দলের মাথায় থাকবেন সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি।

৯. অনীকের পরেও অবাক হওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত সন্ত্রাসবাদী ও মাস্টার হ্যাকার তৌকিরকে রেহাই দেওয়া হলো

তৌকির ওরফে আবদুস সোবাহান কুরেশি, ওরফে আলতাফ সোবাহান ওরফে তৌফিক বিলাল। পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলো একে জয়পুর, আহমেদাবাদ, দিল্লি ও বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণের মূলচক্রী হিসেবে দেখিয়েছিল। পুলিশের দাবি মতো মার্কিন নাগরিক কেন হেউডের কম্পিউটার হ্যাক করে টিভি চ্যানেলগুলোতে ই-মেইল পাঠানোর নায়কও ছিল তৌকিরই। অথচ ২০০৯, ১৭ ফেব্রুয়ারি ই-মেইল সংক্রান্ত ঘটনায় মুম্বাই পুলিশ এর বিরুদ্ধে কোনো চার্জশিট দাখিল করেনি। তৌকিরকে সংবাদমাধ্যমের তৈরি বলে চালানো হয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৯ ফেব্র"য়ারি ২০০৯)

পুলিশের দাবি কতটা সত্যি? নিচে পুলিশ সূত্রে পাওয়া কিছু প্রতিবেদন রইল, যা থেকে পুলিশের এই দাবি আদৌ ঠিকঠাক কিনা তা বোঝা যাবে।

- প্রথমে তার ছদ্মনামকে চিহ্নিত করেছিল পুলিশ। ১৬ অগাস্ট ২০০৮-এ আহমেদাবাদ পুলিশ ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ আহমেদাবাদের বিস্ফোরণে মূলচক্রী বলে 'তওফিক বিলাল' এবং 'আবদুল সোবাহান'-এর নাম এনেছিল। বিস্ফোরণের আগে পাঠানো ই-মেইল তার হাত দিয়েই মিডিয়া অফিসে গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ১৭ অগাস্ট ২০০৯)
- 'তওফিক বিলাল' ও 'আবদুস সোবাহান' একই ব্যক্তি না আলাদা, তা নিয়ে আহমেদাবাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের মধ্যে কোনো সহমত ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরা আপোশ করে নিয়ে সিদ্ধান্তে আসে ওই দুজন একই ব্যক্তি। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ১৮ অগাস্ট ২০০৮)
- ২০০৮, ১৯ অগাস্ট *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাইতে পিটিআই-এর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। মুম্বাই এটিএস-এর একজন অফিসারকে উদ্ধৃত করে বিস্ফোরণের 'মূলচক্রী'ও ই-মেইলকাণ্ডের নায়ক হিসেবে, প্রথমবারের জন্য সেখানে 'তৌকির' নামটির উল্লেখ করা হয়।
- ২০০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লি বিস্ফোরণের দিনে, *দ্য হিন্দু* ঘোষণা করে তার লম্বা পরিচয় প্রকাশ করে। তদন্তকারী ও পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর হিসেবে তাতে উল্লেখ করা হয়।

- দিল্লি বিস্ফোরণের পর দিল্লি সংবাদমাধ্যমের তরফে তাকে ভারতের 'ওসামা বিন লাদেন' তকমা দেওয়া হয়।
- দিল্লি বিস্ফোরণে পুলিশ সন্দেহ করেছিল সেই হলো ঘটনার মূলচক্রী। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে এবং *পুধারি,* পুনে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৮)
- ২০০৯, ১৭ সেপ্টেম্বর *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* মুম্বাই-এর প্রতিবেদনে মুম্বাই এটিএস-এর অতিরিক্ত কমিশনার পরম বীর সিং-কে উদ্ধৃত করে বলা হয়, 'সোবাহান' হলো মোস্ট ওয়ান্টেড ব্যক্তি।
- ২০০৮, ১৯ সেপ্টেম্বর বাটলা হাউস এনকাউন্টারের পর, দিল্লির স্পেশাল সেলের ডিসিপি অলোক কুমার সাংবাদিকদের বলে, তৌকির হলো মূল মাথা। এই ব্যক্তিই জয়পুর, বেঙ্গালুরু, আহমেদাবাদ ও দিল্লিতে বিস্ফোরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।
- ২০ সেপ্টেম্বর আইবি সূত্র মারফত দিল্লির সংবাদমাধ্যমের কাছে খবর আসে, তৌকির পাক অধিকৃত কাশ্মীরে রয়েছে।
- ২৬ সেপ্টেম্বর, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* মুম্বাই পিটিআই-এর আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যেটি পিটিআই-এর হায়দরাবাদের প্রতিনিধি করেছিলেন। সেখানে বলা হয়, তৌকিরের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করেছে অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ।
- একই দিনে টিএনএন (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া নিউজ নেটওয়ার্ক*) আহমেদাবাদ থেকে খবর করে, গুজরাট পুলিশ আদালতে জানিয়েছে, আহমেদাবাদ বিস্ফোরণে তৌকিরই হলো মূলচক্রী।

ফলে এটা পরিষ্কার, তৌকির কোনো ভাবেই মুম্বাই পুলিশের দাবি মতো শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমের তৈরি নয়। তাকে তৈরি করেছে পুলিশই। আসল কারণটা হচ্ছে, হেউডের ই-মেইল নিয়ে বিকল্প হিসেবে কোনো কম্পিউটার জানা মুসলিমকে তুলে আনার জন্য যখন আইবি মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে চাপ দেয়, তখন ক্রাইম ব্রাঞ্চ আইবি-কে তোষামোদ করতে গিয়েই আবদুল সোবাহান ওরফে তৌফিক বিলাল ওরফে তৌকিরের নাম সামনে এনে ফেলে। কারণ তৌকির উইপ্রোর সেলিং এজেন্সি ডাটামেট্রিক্স নামে একটি সংস্থায় চাকরি করত। সে আদৌ কম্পিউটার হ্যাক করে ই-মেইল পাঠাতে ওস্তাদ কিনা, তা আর ভেবে দেখার সময় হয়নি। পরে তারা যখন দেখে এই কাজ করতে গেলে একটু বেশি পড়াশোনা জানা লোক দরকার, এবং তৌকির তার ধারেকাছেও নেই, কারণ তার শুধু কাজ চালানোর মতো কম্পিউটারের জ্ঞান ছিল, তখন তারা শুদ্ধাশুদ্ধির পথে হাঁটে। কয়েকটা চেষ্টাচরিত্র করবার পর, পুনের মনসুর পীরভোয়-এর নামটি

জুড়ে দেয়। এরপর সন্ত্রাসী হুমকির ই-মেইল নিয়ে চার্জশিট দাখিল করবার সময় ক্রাইম ব্রাঞ্চ মুম্বাই তৌকিরের নামটি ঘেঁটে ফেলে দেয়। সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে দোষ ঠেলে তারা।

যেহেতু পুলিশের তদন্তটা আগাগোড়াই ভাঁওতাবাজি, তাই মাঝেমধ্যেই এই ধরনের অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে তাদের।

❖ সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ড (১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭)

যখন হরিয়ানা পুলিশের তদন্ত শেষের মুখে তখনই কাজের ক্ষেত্রে আইবি-র সাঁড়াশি চাপ। শেষপর্যন্ত যখন হেমন্ত কারকারের অধীনে এটিএস প্রায় তদন্ত গুটিয়ে ফেলল, তখন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বাঁচাতে সবকিছু ধামাচাপা আইবি-র আইএসআই জড়িত রয়েছে বলে আইবি-র দাবিতে সুর মিলিয়ে মুখ পুড়েছিল সরকারের।

ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক দোষারোপ

হরিয়ানার কাছে পানিপথে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-এ যখন সমঝোতা এক্সপ্রেসে বোমা হামলা হলো, মৃত্যু হয়েছিল ৬৮ জন যাত্রীর। দুর্ঘটনার জন্য ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরকে দোষারোপ করতে শুরু করেছিল। ঘটনায় সীমান্তে, পাকিস্তানের সাহায্যে চলা সন্ত্রাসবাদীদের হাত রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। যাই হোক, ২০০৭-এর ৬ মার্চ দুই দেশের প্রথম জয়েন্ট টেরর মেকানিজম বৈঠকে, ভারতের তরফে শুধু বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তির ছবি তুলে দেওয়া হয়েছিল। ওই ছবি এক পাকিস্তানি নাগরিকের দাবি করে, তাকে ধরার জন্য যৌথভাবে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আসল কথা হলো তদন্তকারী সংস্থাগুলো তদন্তের কাজে এগোতে পারছিল, না কোনো প্রাথমিক অনুমান বা সন্দেহের জায়গাতেও তারা ছিল। অথচ আইবি এবং র-এর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় সরকার পাকিস্তানি জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর ওপর দায় চাপিয়ে দিয়েছিল। দেশে আর দেশের বাইরে ছড়াচ্ছিল মুসলিম বিরোধী হাওয়া।

হরিয়ানা পুলিশ তদন্ত প্রায় শেষ করে ফেলেছিল

সূত্র মারফত খবর পেয়ে ২০০৭-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে গিয়েছিলেন হরিয়ানার স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। সেখানে গিয়ে তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে এসে যায় তাদের। যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাদের হাতে এসেছিল, সেগুলো হলো:

- সুটকেসে করে বোমা রাখা হয়েছিল। আর সেগুলো কেনা হয়েছিল ইন্দোরের কোঠারি মার্কেটের একটি দোকান থেকে।
- সুটকেসগুলো যার হাতে তৈরি, সেই দর্জির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।
- বিস্ফোরক তৈরিতে যা যা লাগে, তা ইন্দোরের নয়া বাজারের বিভিন্ন দোকান ঘুরে কেনা হয়েছিল।
- প্লাস্টিক বোতল, প্লাস্টিকের ব্যাগ ও ব্যাটারি কেনা হয়েছিল সেই এলাকা থেকেই।

হরিয়ানা পুলিশ প্রত্যেক দোকানদারকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিশেষ করে সুটকেস যেখান থেকে কেনা হয়েছিল, সেই দোকানের মালিক জইনুদ্দিন তার দুই কর্মচারী হুজেইফা ও পোরান ঠাকুর এবং দুই দর্জি ফকরুদ্দিন ও ইকবাল হোসেনকেও জেরা করা হয়। সমঝোতা এক্সপ্রেস ও রেল ট্র্যাক থেকে উদ্ধার হওয়া সুটকেস তাদের দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি এই সুটকেস তাদের কাছ থেকে বানিয়েছিল কিনা। তাদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। (*দ্য স্টেটসম্যান*, মুম্বাই, ১১ মার্চ, *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই ১৩ ও ১৯ মার্চ। *দ্য হিন্দু*, মুম্বাই, ১৪ মার্চ ও *মুম্বাই মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ২৯ মার্চ ২০০৭)।

মোটামুটি এটা পরিষ্কার যে, হরিয়ানা পুলিশ তদন্ত প্রায় শেষই করে এনেছিল। কিন্তু আচমকাই সব থেমে গেল। তদন্ত নিয়ে খবরের কাগজে খবরাখবর থেকে শুরু করে পুলিশের তদন্ত, কোনো কিছুই আর শোনা যাচ্ছিল না।

সাত মাস পর রাজস্থান পুলিশও আজমির বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে মধ্যপ্রদেশ পৌঁছে গেছে বলে যখন শোনা যায়, তখন এই খবরে *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে (১৫ অক্টোবর ২০০৭) হরিয়ানা পুলিশের প্রসঙ্গ আনে। বলা হয়, ২০০৭, মার্চে যখন হরিয়ানা পুলিশ তদন্তের প্রায় দোরগোড়ায়, তখনও মধ্যপ্রদেশ পুলিশের কাছ থেকে তারা কোনো সাহায্য পায়নি। ফলে পিছু হঠতে হয় তাদের। হরিয়ানা পুলিশ এমন কী তথ্য পেয়েছিল যা নিয়ে এগোতে চাইছিল না মধ্যপ্রদেশ পুলিশ, বেশ কিছুদিন এটা রহস্যই থেকে গিয়েছিল।

হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে মুম্বাই এটিএস তদন্তের শেষ পর্যায়ে পৌঁছয়

মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে যখন সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং এবং লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিত সহ অন্যান্যরা গ্রেফতার হলো, তখনই আবার বেশ কিছু তথ্য মাটি খুঁড়েই প্রায় উঠে এলো। বেঙ্গালুরুর ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে ২০০৮, ৯ নভেম্বর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিতের নার্কো পরীক্ষা হয়। (*দ্য টাইমস অব*

ইন্ডিয়া, পুনে ১১ নভেম্বর ২০০৮)। ১৩ নভেম্বর থেকে পুরোহিতের নার্কো পরীক্ষার জেরে জবানবন্দির ভিত্তিতে, অভিযুক্তদের সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ডেও জড়িত থাকার প্রমাণ উঠে আসতে লাগল সংবাদমাধ্যমে। (*সকাল,* পুনে, ১৩ নভেম্বর ২০০৮ এবং ১৪ নভেম্বর ২০০৮, *সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৬ নভেম্বর ২০০৮, *সকাল,* পুনে, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ *পুধারি* ১৬ নভেম্বর ২০০৮, *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ১৪ নভেম্বর ২০০৮)। *পুনে মিরর* (১৯ নভেম্বর ২০০৮) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, নার্কো পরীক্ষাকারীদের পুরোহিত জানায়, সমঝোতা বিস্ফোরণকাণ্ডে দায়ী প্রবীণ তোগাড়িয়া।

মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিতের হেফাজতের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করে নাসিক আদালতে জানায়, সমঝোতা এক্সপ্রেসে ব্যবহৃত আরডিএক্স জোগাড় করে দিয়েছিল পুরোহিতই। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৬ নভেম্বর, ২০০৮, *সকাল,* পুনে, ১৬ নভেম্বর, ২০০৮, *পুরি,* পুনে, ১৬ নভেম্বর ২০০৮)

২০০৭ সালের মার্চে যে সব তথ্যপ্রমাণ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, নতুন হাতে গরম তথ্যে তার আঁচ দিতে ফের ইন্দোরের দিকে নজর দেওয়া শুরু করে দিয়েছিল হরিয়ানা পুলিশ।

কাজে সাঁড়াশি চাপ আইবি-র, তদন্তে ফাঁকফোকর তৈরি

ঠিক যখন এই চাঞ্চল্যকর মামলার সমাধান প্রায় শেষের মুখে ঠিক তখনই নিজের অবস্থান থেকে আচমকাই সরে এল এটিএস। ২০০৮, ১৭ নভেম্বর সাংবাদিক বৈঠক করার সময় এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে আইবি বা সরকারের চাপেই জানালেন, সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ডে পুরোহিত আরডিএক্স চুরি করে এনেছে এই ধরনের কোনো কথা এটিএস-এর আইনজীবী অজয় মিশার বলেননি। তার মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। (*পুরি,* পুনে এবং *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৮ নভেম্বর ২০০৮)। *টাইমস অব ইন্ডিয়ায়* বলা হয়, নাসিকে অজয় মিশার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনার পর, এই অভিযোগ নিয়ে সরকারকে আইবি-ই সতর্ক করে। তদন্তে আইবি-র ভালোরকম নজর ছিল। আইবি সতর্ক করে, তাদের খোঁজের ওপর ভিত্তি করে ঘটনায় আইএসআই-এর হাত রয়েছে বলে সরকার আগেই হইচই তুলে দিয়েছিল।

এক শীর্ষ পুলিশ কর্তাকে উদ্ধৃত করে *টাইমস অব ইন্ডিয়া* আরও বলে, শুক্রবারে এটিএস যে অভিযোগ এনেছিল, তাতে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারত। বিস্ফোরণস্থল ও অবিস্ফোরিত দুটি বোমার ফরেন্সিক পরীক্ষা দেখা গেছে, তাতে আরডিএক্স ব্যবহার হয়নি। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,*

পুনে, ১৮ নভেম্বর ২০০৮)। কিন্তু ওই একই দিনে যার এলাকায় ওই বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেই রেলওয়ের পুলিশ সুপার (আম্বালা) ভারতী অরোরা দাবি করেন, ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রমাণিত, বিস্ফোরণে আরডিএক্স ব্যবহার করা হয়েছিল। (*সকাল টাইমস*, পুনে, ১৮ নভেম্বর ২০০৮, *ট্রিবিউন ইন্ডিয়া.কম* এবং *জিনিউজ.কম* ১৭ নভেম্বর ২০০৮)।

এরই প্রেক্ষিতে স্পষ্ট বোঝা যায়, ঠিক কার আঙুলিহেলনে হরিয়ানা পুলিশের পাশে দাঁড়ায়নি মধ্যপ্রদেশ পুলিশ যেখানে ২০০৭-এর মার্চেই হরিয়ানা পুলিশ তদন্তের নিষ্পত্তি করে ফেলতে পারত।

আইবি-র উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আড়াল করা

যেহেতু আইবি-র শুরুর দিকের তত্ত্বের সঙ্গে মিলছিল না, তাই তারা চাইছিল না সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ড নিয়ে এটিএস তাদের তদন্ত এগোক। যেভাবে ঠিকঠাক তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই আইএসআই যোগ নিয়ে আইবি সরকার, মিডিয়া ও পুলিশকে ভুল তথ্য দিয়ে ভুল পথে চালানোর চেষ্টা করেছিল, সেই সব বিষয়ে সেই আইবি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই পারত সরকার। অন্তত ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও মুসলিম যোগ যেখানে রয়েছে, সেখানে তথ্য ধামাচাপা দিয়ে, ভুলভাল তথ্য জাহির করার আইবি-র যে নীতি, তাতেই তারা কাজ করে গেছে। সেই জায়গায় সমঝোতা বিস্ফোরণকাণ্ডে এটিএস-এর তদন্তে যেভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির জড়িত থাকার নতুন তত্ত্ব উঠে আসছিল, তাতে আইবি-র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারই কথা। তার মানে আইএসআই যোগের বিষয়টি নিয়ে ভারতের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষুণ্ণ হওয়া নিয়ে আইবি-র ততটাও মাথাব্যাথা ছিল না। তা সে জনগণ ও সরকারকে তারা যেভাবেই বোঝাক না কেনো। তাদের আসল চাপ ছিল সদ্য পরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার বিষয়টি। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, যেভাবে গত কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিক ভাবে পরিকল্পনা মাফিক দেশে একটা মুসলিম বিরোধিতার হাওয়া তৈরি করা গিয়েছিল, এটিএস-এর তত্ত্বে তা বড়সড় ধাক্কা খেত।

কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যা হলো, বছরের পর বছর ধরে আইবি-কে ক্রমাগত ক্ষমতা দিয়ে গেছে তারা, শেষকালে যা হাতের বাইরে চলে যায়। প্রধানমন্ত্রী সহ কোনো মন্ত্রী, কোনো আমলা, কোনো পুলিশ সংস্থার আইবি-র ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। এখন আইবি যখন চাইছিল না এই ঘটনা নিয়ে এটিএস আর কোনো তদন্ত করুক আর এখনও পর্যন্ত যা মিলেছে, তা গিলে ফেলা হোক, তখন এটিএস-ও সেই কথা মতো চলতে বাধ্য হলো।

যতক্ষণ পর্যন্ত না সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নিয়ে প্রবল হইচই শুরু না হলো, ততক্ষণ পর্যন্ত এমনতরই চলেছিল।

❖ হায়দরাবাদ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণকাণ্ড (১৮ মে, ২০০৭)

ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের বাঁচাতে তদন্তকে বেলাইন করতে অজস্র মনগড়া তত্ত্বের আমদানি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অনিচ্ছাকৃত তদন্তে সিমকার্ড উদ্ধার, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের হদিস পাওয়া গেছে। সেনায় ব্যবহৃত আরডিএক্স-টিএনটির মিশ্রণ নিয়ে সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তদন্ত করা হয়নি।

২০০৭, ১৮ মে হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ হয়। নয়জনের মৃত্যু হয়। দুটি বোমা ফাটেনি, সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে পুলিশ।

তদন্তের মনগড়া কিছু তত্ত্ব

মনগড়া তত্ত্বের ওপরে দাঁড়িয়েও যে কোনো তদন্ত করা যায়, এই ঘটনা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আইবি-র নির্দেশে স্থানীয় পুলিশ এসি ঘরে বসে নানান আজগুবি তত্ত্ব তৈরি করে গেছে। তদন্ত ইচ্ছেকৃতভাবে বিপথে নিয়ে যেতে প্রচুর নিরাপরাধ মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করে গেছে। আইবি জানত, মালেগাঁও বিস্ফোরণের জেরে পরে যা জনসমক্ষেও এসেছে, ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীই এর পেছনে জড়িত ছিল।

তত্ত্ব নং ১

১৮ মে ২০০৭-এ বিস্ফোরণ হয়। পরের দিন অর্থাৎ ১৯ মে পুলিশের হাবভাব এমন ছিল যে তারা সব তথ্যপ্রমাণ হাতে পাওয়ার পর তদন্তের নিষ্পত্তি করে ফেলেছে। পুলিশ সূত্রে নিম্নলিখিত তথ্য মিলেছে,

- বাংলাদেশের হুজি জঙ্গি মুহাম্মদ আবদুল সোহেল ওরফে বিলাল এই ঘটনার মূলচক্রী। সেই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। হায়দরাবাদের এসটিএফ হেডকোয়ার্টারে হামলা ও সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ডে পুলিশ তাকে খুঁজছিল।
- বোমা রাখার কাজে তিনজন স্থানীয় যুবক তাকে সাহায্য করেছিল।
- মসজিদের ভেতর রাখা বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর পর বিলালের সঙ্গীসাথিরা সে ঘটনার সংবাদ এসএমএস করে বাংলাদেশে পাঠায়। হাতে রিমোট নিয়ে বিলাল বিস্ফোরণের ঘটনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

- মসজিদের গ্রিলের গেটের কাছে সে দেখে, লোকজন সেখানে খুব একটা নেই। সে কারণে সেখানে ঝোলানো ব্যাগে রাখা দুটি বোমায় আর বিস্ফোরণ ঘটায়নি বিলাল।
- সেলফোনের মধ্যে যে সিম কার্ড ছিল তা কলকাতা থেকে কেনা হয়েছিল। বিলালের ভাই জলিল, কলকাতায় মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান চালাত। সেখান থেকেই সিম কার্ড কেনা হয়েছিল।
- বোমায় যে বিস্ফোরক ছিল, যথা আরডিএক্স, টিএনটি, সেগুলো ভারতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল সেগুলো। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২০ মে ২০০৭)

অর্থাৎ যেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা হলো পুলিশ ঘটনাস্থলে গেল, ওপরের সব রিপোর্ট একদিনের তদন্তেই নিষ্পত্তি করে ফেলল। শুধু তাই নয়, তিন সন্দেহভাজনকেও সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করে ফেলল পুলিশ।

তত্ত্ব নং ২

ঠিক ওই একই দিনে আরেকটি সংবাদপত্রে কিন্তু অন্যরকম তত্ত্বের কথা উঠে এসেছিল।

পুনের সকালে, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী অবশ্য মূলচক্রী একই ছিল, বিলাল। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলো একদম আলাদা।

- বিলাল হুজির নয়, জইশ-ই-মুহাম্মদের সদস্য।
- দুটি অবিস্ফোরিত বোমায় সিম কার্ড ব্যবহার হয়েছিল। সেগুলো কলকাতা থেকে কেনা হয়েছিল। তার ভাইয়ের কাছ থেকে কার্ড মেলেনি। দুটি কার্ড ছিল হাচ (এখন ভোডাফোন) সংস্থার।
- বোমা দুটি ফাটেনি কারণ দুটি সিমকার্ডে সিগনাল মেলেনি। বিলাল গেটের কাছে লোকজন দেখতে পায়নি তাই ফাটায়নি সেরকম কোনো ব্যাপার নয়।
- এই বিস্ফোরণের সঙ্গে মুম্বাইয়ের ট্রেনে ও মালেগাঁও বিস্ফোরণের মিল পাওয়া যাবে। পুলিশ যে এসটিএফ হেডকোয়ার্টারে হামলা ও সমঝোতা এক্সপ্রেসের ঘটনায় বিলালকে খুঁজছিল, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।

তত্ত্ব নং ৩

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ ক্রাইম ব্রাঞ্চের গল্প অবশ্য অন্যরকম—

- এরা আবার হায়দরাবাদ আর মুম্বাই বিস্ফোরণের সঙ্গে এর অদ্ভুত যোগাযোগের সন্ধান পায়।
- মুম্বাই বিস্ফোরণে 'মূলচক্রী' শেখ সমীর ও হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের 'মূলচক্রী' বিলালের সঙ্গে এরা যোগাযোগ বের করে ফেলল।
- কলকাতায় ফল ব্যবসায়ী সেজে সমীর লশকর-ই-তাইয়েবার সংগঠন চালাত। এসটিএফ হেডকোয়ার্টারে হামলার পর বিলালকে সেই বাংলাদেশ পাঠিয়েছিল।
- এই ধারণা অনুযায়ী তদন্ত করে পশ্চিমবঙ্গ ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানতে পারল, নকল ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে সমীর বিলালকে সাহায্য করেছিল। সিম কার্ড তুলতে সেটাই কাজে লেগেছিল। সেই সিমকার্ডেই মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। (বিলালের লাইসেন্সে যে আসানসোলের ঠিকানা দেওয়া ছিল, সেই অনুযায়ী সিআইডি সেখানে যায়, কিন্তু খালি হাতে ফিরতে হয় তাদের। বাবুলাল যাদবের নামে সিম কার্ড ও লাইসেন্স তোলা হয়। কিন্তু সেই নামে ওই এলাকায় কেউ ছিল না। এমনকি যে ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল, তার সাথেও ওই এলাকার কারও জানাশোনা ছিল না)।
- মুম্বাই পুলিশের হেফাজতে থাকা সমীরকে হেফাজতে নেওয়ার আশায় ছিল সিআইডি। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ১২ মে ২০০৭)

তত্ত্ব নং ৪

ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডস বা এনএসজি-র বোমা বিশেষজ্ঞদের মতে, হায়দরাবাদ ও মালেগাঁও বিস্ফোরণের মধ্যে অনেক মিল ছিল। তার কারণ হলো,

- শার্পনেল হিসেবে যে জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল, তা দুটি জায়গার ক্ষেত্রে এক।
- দুটি ক্ষেত্রেই আরডিএক্স ব্যবহার করা হয়েছিল। মালেগাঁওতে অবশ্য তার সঙ্গে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মেশানো হয়েছিল। আর হায়দরাবাদে মেশানো হয়েছিল টিএনটি।
- সাধারণত সেনাবাহিনীতে আরডিএক্স ও টিএনটি-কে মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করা হয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ২২ মে ২০০৭)

তত্ত্ব নং ৫

হায়দরাবাদ এসটিএফ-এর বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। এটা জানার পর শোহেব জাগিরদারের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এ সম্পর্কে সংবাদপত্র গুলোর প্রতিবেদন নেওয়া যাক—

- বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে শোহেব জায়গিরদারকে তোলা হয় জালনা এলাকা থেকে। কিন্তু সরকারিভাবে চুরির মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
- সে নাকি জবানবন্দি দেয়, দেড় কেজি বিস্ফোরক জোগাড় করে তার থেকে কিছুটা ষড়যন্ত্রকারীদের সে দিয়েছিল। (কিন্তু সে সেসব কোথা থেকে পেল, কাকেই বা দিল প্রতিবেদনগুলোতে তার কোনো উল্লেখ ছিল না)
- আরডিএক্স এসেছিল সীমান্তের ওপার থেকে।
- মুম্বাই পুলিশের হেফাজতে থাকা শেখ সমীর ও শোহেব জায়গিরদারের যোগাযোগ প্রমাণিত।
- সমীর চারজন পাক নাগরিককে এদেশে আনিয়েছিল। ২০০৭-এ তাদের হায়দরাবাদে নিয়ে গিয়েছিল সে। সেই সম্ভবত মক্কা মসজিদে হামলাকারীদের শহরে আনে। (হায়দরাবাদ পুলিশ মুম্বাই পুলিশের কাছ থেকে তার নার্কো পরীক্ষার রিপোর্ট এনে তা খতিয়ে দেখে।)
- হুজির বিলাল যেখানে হায়দরাবাদের হামলার জন্য সন্দেহভাজন হিল এবং সিমি যেহেতু মালেগাঁও বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল, পুলিশ হুজি আর সিমির মধ্যে যোগাযোগের তদন্ত শুরু করে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৬ মে, ২০০৭ এবং *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৩০ মে, ২০০৭)

তত্ত্ব নং ৬

বিলালের ছোট ভাই মাজিদ নার্কো পরীক্ষায় জানায়, হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ, লুম্বিনি পার্ক ও গোকুল চাটে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে দাউদ ইব্রাহিমের হাত রয়েছে। বিলাল নিজে দাউদের ঘনিষ্ঠ। দেশে সমস্ত বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে দাউদ তাকে আর্থিক সাহায্য করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। সুতরাং হায়দরাবাদ ও অন্যান্য শহরে আরও বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থেকে গেছে (দৈনিক *পুরি,* পুনে, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৭)

তদন্তের বিশ্লেষণ

ওপরের সমস্ত তত্ত্ব খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, তদন্তকারীরা স্রেফ ধারণা আর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সেইসব বানিয়ে চলছিল—যার ফলে নিজেদের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা উঠে আসছিল। তাছাড়া এই সব তত্ত্ব প্রমাণের জন্য কোনো ঠিকঠাক প্রমাণও তাদের হাতে ছিল না।

অন্যদিকে তদন্তে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে আসছিল, তাতে ইচ্ছেকৃত ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না:

- ড্রাইভিং লাইসেন্সের ঘটনায় কোনো গভীর তদন্তের পথে যাওয়া হচ্ছিল না। আসানসোল থেকে নেওয়া কোন সিমকার্ড বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হচ্ছিল, তার দিকেও নজর ছিল না। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২১ মে ২০০৭)। অথচ আসানসোলে গিয়ে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়ে বলে স্থানীয় কেউ ওই ব্যক্তির ছবি দেখে চিনতে পারেনি। বরং মোবাইল সংস্থার কর্মীদের জেরা করা উচিৎ ছিল, যে কীভাবে ঠিকঠাক নথি যাচাই না করেই সিম কার্ড দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, পুলিশের সেই ছবি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করাতে পারত। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিয়ে তাদের কোনো হেলদোলই ছিল না, তদন্তও তাই এগোলো না। বোঝাই যাচ্ছিল, ওপর থেকে চাপ ছিল তাদের ওপর।
- এনএসজি-র বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, আরডিএক্স-টিএনটি মিশ্রণে বিস্ফোরক বানানো হয়েছিল। এই মিশ্রণ সাধারণত সেনারা ব্যবহার করে থাকে। (দ্য *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ২২ মে, ২০০৭)। তদন্তকারী দল এই বিষয়ে খুব একটা এগোয়নি। সেনার উচ্চপদস্থ কর্তাদের কানেও বিষয়টি তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। হয় তারা ব্যাপারটাকে গুরুত্বই দেয়নি, নয়তো কেউ ইচ্ছে করে তাদের এগোতে দেয়নি।
- শেখ সমীরের নার্কো পরীক্ষার রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখছে হায়দরাবাদ পুলিশ। মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিল সমীর। কিন্তু রিপোর্ট পরীক্ষা করে পুলিশ কী পেল, তা জানা নেই।

মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ড, ২০০৮ থেকে পাওয়া তথ্য

- ২০০৮, জুলাইয়ে মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে সম্প্রতি জানা গেছে, এক অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিত আর্মি গুদাম থেকে আরডিএক্স চুরি করেছিল। সঙ্ঘ পরিবারের জঙ্গির কাছে তা

পাচার করা হয়। তা কাজে লাগে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ, আজমির দরগা কিংবা মা মসজিদ সহ অন্যান্য জায়গায়।

- জিজ্ঞাসাবাদের সময় আজমির শরিফ ও মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ স্বীকার করে পুরোহিত।
- মহন্ত দয়ানন্দ পাণ্ডে এবং মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) রমেশ উপাধ্যায়ের কথোপকথন রেকর্ড করে পুলিশ। মালেগাঁও বিস্ফোরণের চার্জশিটের সঙ্গে সেটিও জমা দেওয়া হয়। দয়ানন্দ পাণ্ডে উপাধ্যায়কে বলে, মক্কা মসজিদের বিষয়টা আমাদের ছেলেরা করেছে।

মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনায় মেলা এই সব তথ্যে নিশ্চিত হওয়া যায়, এই বিস্ফোরণের ঘটনাও অভিনব ভারত গোষ্ঠীর কৃতকার্যতার ফল। এরাই মালেগাঁও, নান্দেড়, আজমির, সমঝোতা সহ বিভিন্ন বিস্ফোরণে জড়িত। যদিও মালেগাঁও বিস্ফোরণের মতো সবকটি বিস্ফোরণের ঘটনা এতটা বিশদে তদন্ত করা হয়নি। যদি হতো তাহলে তা বৃহত্তর সন্ত্রাসবাদী মামলা হিসেবে উঠে আসত। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারপতির অধীন তদন্ত করিয়ে এই সব ঘটনার চার্জশিট দাখিল করানো উচিৎ।

নিরাপরাধ মুসলিমরা যে যন্ত্রণা পেল, তার ক্ষতিপূরণ কীভাবে দেওয়া যাবে?

আশা করা যায় সত্যি একদিন না একদিন প্রকাশিত হবেই। যাদেরকে দেশভক্ত, জাতীয়তাবাদী বলে মনে করা হয়, সেই সব সন্ত্রাসবাদীদের মুখোশ খুলবে একদিন। কিন্তু মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণকাণ্ডের যন্ত্রণাদায়ক তদন্তের ইতিহাস কোনোদিনও ভোলা যাবে না। শুরুর দিন থেকেই হুজি, সিমি, লস্করের মতো 'মুসলিম জঙ্গি সংগঠনের' ওপর দায় চাপিয়ে শয়ে শয়ে মুসলমান যুবককে বেআইনি ভাবে তুলে আনা হয়। বছরের পর বছর, জেলে ভরে রাখা হয়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অমানবিক অকথ্য অত্যাচার চলে। কিন্তু পরে কয়েকজন ধর্মনিরপেক্ষ, মানবাধিকার কর্মী, গণতন্ত্রকামী মানুষ ও সংগঠনের হস্তক্ষেপে তা যায় সিবিআই-এর দায়িত্বে। সব খতিয়ে দেখার পর বেশিরভাগ যুবককেই ছেড়ে দেওয়া হয়। যাদের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ পুলিশ চার্জশিট দিয়েছিল, তাদের বেশিরভাগকেই ছেড়ে দেওয়া হয়, নয়তো আদালত তাদের বেকসুর খালাস করে। *দ্য সানডে এক্সপ্রেস*, পুনে (২৫ জানুয়ারি ২০০৯) প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিকভাবে মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত করে হায়দরাবাদ পুলিশ। পরে তা সিবিআই-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঘটনায় যোগ রয়েছে সন্দেহে ৭৮ জন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করে। কয়েক ঘণ্টার জেরার পরেই সিবিআই তাদের বেশিরভাগকেই ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ৩২

জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়, কিন্তু স্থানীয় আদালত তা কয়েকমাসের মধ্যেই বাতিল করে। কারণ পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণের অভাব।

ছেলেগুলো শেষপর্যন্ত বিচার পেয়েছে। তাদের কাছের মানুষগুলোও নিশ্চয়ই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু এতেই সব শেষ হয়ে যায় না। সেই সব পুলিশ অফিসারের কী হবে, যারা এদেরকে মাসের পর মাস নরকযন্ত্রণা দিয়েছে, স্থানীয় আদালতের কী হবে, যারা কোনো কিছু সাতপাঁচ না ভেবে, মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যাচ্ছেতাই ভাবে ছেলেগুলোকে পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে? কী হবে সেই অদৃশ্য শক্তির, যে পর্দার আড়াল থেকে পুলিশকে আর বিচারবিভাগকে চালিত করেছে? তাদেরকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন, তাদের জনসমক্ষে নিয়ে আসা প্রয়োজন, তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। নির্যাতিতদের ঠিকমতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার। এটা করলে হয়তো একটা যুক্তিগ্রাহ্য জায়গায় মামলাটি শেষ করা যাবে।

❖ আজমির শরীফ বিস্ফোরণকাণ্ড (১১ অক্টোবর, ২০০৭)

- মুসলিম সম্পর্কে আজগুবি ধারণা ও এসি রুমে বসে নানান তত্ত্বের আমদানি
- গুজরাট-রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ যোগ খতিয়ে না দেখা
- গুয়াহাটিতে সিম কার্ডের সন্ধান, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাচাই না করা
- অবশেষে মালেগাঁও বিস্ফোরণে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে

শুরুর দিন থেকেই মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তিদের ওপর দোষারোপ

- হায়দরাবাদ ও মালেগাঁও বিস্ফোরণে যারা যুক্ত তাদের দিকেই সন্দেহের তীর।
- জইশ-ই-মুহাম্মদ ও হুজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে লশকর-ই-তাইয়েবা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে সন্দেহ।
- সুন্নি সম্প্রদায়ের ওপর রাগের কারণেই মুসলিম পর্বের সময়ে এই ধরনের হামলা চালানো হয়।
- হায়দরাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ডের মতোই টিফিন বাক্সের মধ্যে বোমা রাখা হয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১২ অক্টোবর ২০০৭)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের কৌশলী সওয়াল, অভিযুক্ত 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা মুসলিমদেরই ওপরে হামলা চালাচ্ছে। তার দাবি, যেহেতু লশকর-ই-তাইয়েবা সবসময়ে সুফি সন্তদের বিরোধিতা করে এসেছে, তাই তারাই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকতে পারে। (*সকাল*, পুনে, ১২ অক্টোবর ২০০৭)

সরকার ও তার আধিকারিকদের এই ধরনের মন্তব্য হাস্যকর, অন্তত নিম্নলিখিত কয়েকটা কারণের জন্য তো বটেই:

- যখন তদন্তকারী সংস্থাগুলো হায়দ্রাবাদ ও মালেগাঁও বিস্ফোরণের পেছনে কার হাত রয়েছে তা তখনও বুঝে উঠতে পারেনি, যখন তদন্ত তখনও চলছে, সেই সময় কী করে কেন্দ্রীয় সরকার ওইরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো মন্তব্য করে দিতে পারে, যে কোন সন্ত্রাসবাদীরা ওই সব ঘটনার সঙ্গেও জড়িত?
- কীসের ভিত্তিতে লশকর, জইশ বা হুজি এই ঘটনায় জড়িত আছে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সরকার? তাদের হাতে কি এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বা তথ্য এসেছে?
- ধর্মাচরণের ছোটোখাটো কিছু মতপার্থক্যের জেরে একজন মুসলিম মুসলিমদেরই মারবে, এটা একটা বাচ্চাও কি বিশ্বাস করবে, বিশেষ করে যখন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল?
- লশকর সবসময় সুফি সন্তদের বিরুদ্ধে, এটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের মতো একজন সিনিয়র ব্যক্তিত্ব কীসের ভিত্তিতে বলে দিলেন?

আসলে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্বরাষ্টসচিবের মন্তব্য কোনো প্রমাণের ওপরেরই দাঁড়িয়ে ছিল না। হয় নেহাত আজগুবি ধারণার ভিত্তিতে তারা এই মন্তব্য করেছিল, অথবা খুব সম্ভবত, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলো তাদের এটা বুঝিয়েছিল। এদের মূল লক্ষ্যটাই হলো দেশে একটা মুসলিম বিরোধী হাওয়া তুলে দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আরএসএস ও তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপিকে ফায়দা লুটতে দেওয়া।

দ্বিতীয় দিনে কোনো প্রমাণ ছাড়াই আরও নির্দিষ্ট ভাবে অনুমানের কথা জানানো

দ্বিতীয় দিনে কোনো বিশদ তদন্ত ছাড়াই পুলিশ, তদন্তকারী সংস্থা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব বুঝে গেল,

- জইশ-ই-মুহাম্মদের স্লিপার সেলের কয়েকজন সদস্যর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলাদেশের সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হুজির সদস্য সাহিদ বিলাল এই ঘটনা ঘটিয়েছে।
- করাচিতে থাকা বিলালকে সমঝোতা বিস্ফোরণকাণ্ডেও পুলিশ খুঁজছে। গুজরাটের বাসিন্দা রসূল খানের সঙ্গে এর যোগাযোগ রয়েছে। ঢাকা ও উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে দিয়ে যুবকদের সে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দেওয়াতে নিয়ে যেত।

- হায়দরাবাদের মতোই মোবাইল এবং টিএনটি ব্যবহার করা হয়েছিল। (ঠিক কোন কোন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, না পুলিশ, না তদন্তকারী সংস্থাগুলো না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব তার সাফাই দিয়েছিলেন)

এটাও বলা হয়েছিল, বিস্ফোরণস্থলে তাজা বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। একটি ব্যাগে বিস্ফোরক ছিল, তাতে দুটি সিম কার্ড ও মোবাইল ফোনের কিছু অংশ মিলেছে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে এবং *সকাল*, পুনে, ১৩ অক্টোবর ২০০৭)

তৃতীয় দিনে ভিন্ন তত্ত্ব

পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাগুলোর এবার সন্দেহ হতে শুরু হলো বোমা তৈরি হয়েছিল হায়দরাবাদে, সেখানকার মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ ও আজমিরে বিস্ফোরণের মধ্যে কোনো যোগসূত্র হয়তো রয়েছে। তাদের এই ধারণা হলো কতগুলো বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে:

- বিস্ফোরণস্থল থেকে সিম কার্ড পাওয়া গিয়েছিল। হায়দরাবাদের মতোই। এক্ষেত্রে বিস্ফোরণের জন্য মোবাইলের ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। দুটি ঘটনাতেই নোকিয়ার ফোন ব্যবহার করা হয়েছিল।
- দুটি বিস্ফোরণেই আরডিএক্স ও টিএনটি-র মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছিল।

সাইদ সালিম নামে বিস্ফোরণে আহত একজন হায়দরাবাদের বাসিন্দা। সে কয়েকমাস আগেই হায়দরাবাদ থেকে এখানে আসে! দরগার কাছে ঘড়ি, পারফিউমের দোকান দিয়েছিল। সে এই বিস্ফোরণে জড়িত থাকতে পারে, তার কিছু কারণ ছিল,

- তার বাড়ি হায়দরাবাদে। সে ছোটখাটো ব্যবসার জন্য আজমির চলে গেলেও, তার পরিবার ছিল হায়দরাবাদেই।
- বিস্ফোরণের কয়েকদিন আগে তার কাছে এক মহিলা এসেছিল। তারসঙ্গে একটি ব্যাগ ছিল। বিস্ফোরণের দুদিন আগে সেই মহিলা হায়দরাবাদ ছেড়ে চলে যায়। সালিমকে ওই মহিলাই বিস্ফোরক বোঝাই ব্যাগ দিয়ে গিয়েছিল বলে সন্দেহ।
- তার পকেটে তারের কিছু টুকরো পাওয়া গেছে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৪ অক্টোবর ২০০৭)

ওপরের ঘটনা প্রমাণ করে দেয়, নেহাত ভুল ধারণা, বলা ভালো, কু-সংস্কারের ওপর দাঁড়িয়েছিল গোটা তদন্তপ্রক্রিয়া। গরীব মানুষ বড় শহরে ব্যবসা করতে গেলে পরিবার নিয়ে যেতে পারে না, কারণ খরচায় পোষাবে না, এটা তো একটা

সাধারণ জ্ঞান। সালিমও সেটাই করেছে। আর যে ব্যাগ হাতে মহিলার কথা বলা হচ্ছে, ওরকম ধর্মস্থানে গেলে যে কেউই হাতে দু-একটা ব্যাগ নিয়ে থাকেন। শুধু এই সব কারণের জন্য কোনো মৃত ব্যক্তি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এমন ধারণা হাস্যকর নয় কি? যেখানে মুসলিমদের পবিত্র ধর্মস্থানে ধর্মীয় উৎসবের সময়ে বিস্ফোরণ হয়েছে, সেখানে কেউ অন্তত একবারও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ওপর আঙুল পর্যন্ত তুলল না? আর তাছাড়া যেখানে মৃতরা প্রত্যেকেই মুসলমান।

গুজরাট-রাজস্থান-মধ্যপ্রদেশ যোগ

- তাজা বোমা যে ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছিল, তাতে আহমেদাবাদ ও উদয়পুরের ১০ মে ও ১২ মে-র খবরের কাগজ ছিল। একটি কাগজ হিন্দিতে, অন্যটি গুজরাটিতে।
- বিস্ফোরকগুলো উজ্জয়িনী ও ইন্দোর থেকে প্রকাশিত সান্ধ্যকালীন পত্রিকায় মোড়া ছিল।
- রাজস্থান পুলিশ মধ্যপ্রদেশে তদন্ত করতে গিয়েছিল, কিন্তু ইন্দোর পুলিশের কাছ থেকে তারা কোনো রকম সাহায্য চায়নি। যাই হোক, ইন্দোরের এক সিনিয়র পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, রাজস্থান পুলিশ কোনো ঠিকঠাক তথ্য ছাড়াই তদন্তের মোড় ঘোরাতে মধ্যপ্রদেশ চলে এসেছিল।
- সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের পর হরিয়ানা পুলিশের একটি দল বেশ কয়েকদিন ইন্দোরে কাটায়। ওখান থেকেই সমঝোতার ঘটনায় ব্যবহৃত ছটি টাইমার বোমার জিনিসপত্র কেনা হয়েছিল। ঠিকঠাক কোনো কিছুই মেলেনি, কিন্তু মাসখানেক পরে দুই রাজ্যের পুলিশই অভিযোগ এনে ফেললো। যেখানে হরিয়ানা পুলিশ স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে সহযোগিতার অভিযোগ আনে, সেখানে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ দাবি করে, তারা সবরকমই সাহায্য করেছিল, কিন্তু এখান থেকে যা মিলবে না, সেটাকেই হরিয়ানা পুলিশ আঁকড়ে ধরে বসেছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৫ অক্টোবর ২০০৭)

ওপরের খবরগুলো থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে

- দুটি খবরের কাগজ ছাড়া অতিরিক্ত এমন কি তথ্য রাজস্থান পুলিশের হাতে এসেছিল যার ওপর ভিত্তি করে তারা ইন্দোরে গিয়েছিল?
- যেখানে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নেওয়াটাই রীতি, সেখানে তারা ইন্দোর পুলিশের সাহায্য কেনো নিল না?

- তাদের কি ইন্দোর পুলিশের ওপর কোনো বিশ্বাস ছিল না? যদি না থাকে, তাহলে কেনো?
- সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ডে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ, হরিয়ানা পুলিশকে কেনো সাহায্য করতে চায়নি? তাদের কাছে যে তথ্য আছে, তা যাচাই করার জায়গা কেনো তৈরি করে দেওয়া হলো না?
- তবে কি এই মামলায় সত্য উদঘাটিত হোক কোনো কারণে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ তা চায়নি? নাকি কোনো রাজনৈতিক নেতা ও আইবি-র চাপ ছিল তাদের ওপর?

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল

আফ্রিকাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকা প্রতিনিধিদল সূত্রে খবর, বিলালের যোগ থাকা, আজমির বিস্ফোরণে হুজির হাত থাকা এবং হায়দরাবাদ বিস্ফোরণে ব্যবহৃত সিমের সঙ্গেই কেনা আজমিরের ঘটনায় ব্যবহৃত সিম, এই সব গল্পের পুনরাবৃত্তি থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে, যেটা সংবাদমাধ্যমের কাছে গুরুত্ব পায়নি, সেটা হলো, সিম কার্ড কেনা হয়েছিল গুয়াহাটি থেকে। একজন পরিচিত আয়ুর্বেদ চিকিৎকের ছবি দিয়ে নকল ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করা হয়েছিল। তা দিয়েই কেনা হয়েছিল সিম। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৫ অক্টোবর ২০০৭)।

সিদ্ধান্ত টানা হয়েছিল, হায়দরাবাদ বিস্ফোরণে হাত ছিল তাই আজমির বিস্ফোরণে বিলাল ও হুজি জড়িত। অথচ তখনও আজমির নিয়ে ঠিকঠাক কোনোও জায়গায় পৌঁছনো যায়নি। একে বলে ন্যায়ের ফাঁকি। নকল ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে গুয়াহাটি থেকে সিমকার্ড কেনার বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজিই ছিল না তদন্তকারী দলগুলো। অথচ তারা একই জিনিস নিয়ে বারবার বলে যাচ্ছিল। নীচের বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিশদ তদন্তের প্রয়োজন:

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা কার নামে নেওয়া হয়েছিল? আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের ছবি কী করে লাইসেন্সে ব্যবহার করা হলো? ওই ব্যক্তির সঙ্গে কি কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের যোগাযোগ ছিল? কী করে তথ্যপ্রমাণ ঠিকমতো যাচাই না করেই কোনো সংস্থা সিমকার্ড চালু করে দিতে পারে? ফলে প্রশ্ন ওঠে, এই সব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিয়ে কেনো এগোনো হলো না?

এইগুলো ছাড়াও আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের ওপর ভিত্তি করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল—

- টিএনটি ও আরডিএক্স-এর মিশ্রণে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল বলে সন্দেহ ছিল পুলিশের। একই ঘটনা ঘটেছিল হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের

ক্ষেত্রেও। এনএসজি-র বোমা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিল এই ধরণের মিশ্রণ সাধারণত সেনারাই করে থাকে। ফলে আজমির বিস্ফোরণের তদন্তকারীদের এই বিষয়টা নিয়ে উচ্চতর সেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করার উচিৎ ছিল। তাদের সাহায্য চাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা সে পথে বাড়ায়নি। হয় তারা এই বিষয়টিকে পাত্তা দেয়নি, নয়তো এই বিষয় নিয়ে ভাবার বিষয়ে কেউ তাদের বাধা দিয়েছিল।

- জুলাই ২০০৮-এ মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে আসে অভিযুক্ত কর্ণেল পুরোহিত সেনা গুদাম থেকে আরডিএক্স চুরি করে তার একাংশ সঙ্ঘ পরিবারের সন্ত্রাসবাদীদের পাচার করে। এনএসজি বিশেষজ্ঞদের দেওয়া তথ্য সঠিকভাবে যাচাই করলে দোষীদের সামনে আনা যেতে পারত। এখন আশা করা যায়, এইবার অন্তত তদন্তকারী সংস্থাগুলো এই সূত্র ধরে এগিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য জায়গায় তদন্ত শেষ করতে পারবে। হয় মামলার নিষ্পত্তি হোক কোনো কারণে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ তা চায়নি অথবা কোনো রাজনৈতিক নেতা ও আইবি-র চাপ ছিল তাদের ওপর। এখন মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনায় নতুন কিছু তথ্য উঠে আসার জেরে ইন্দোরের বিষয়টা নিয়ে আরও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

অবশেষে ঝুলি থেকে বেড়াল বেরোয়। ঘটনার কারসাজি "হিন্দু (পড়ুন ব্রাহ্মণ্যবাদী) রাষ্ট্র" সন্ত্রাসীদের মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে নীচের বিষয়গুলো উঠে আসে:

- নার্কো পরীক্ষায় লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পুরোহিত স্বীকার করে, সেই আজমির ও মালেগাঁও বিস্ফোরণে বিস্ফোরক পাচার করেছিল। মহন্ত দয়ানন্দ পাণ্ডে তাকে পথ দেখান। (*সকাল,* পুনে এবং পুধারি, *পুনে,* ১৫ নভেম্বর ২০০৮)
- মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তই আজমির বিস্ফোরণে জড়িত বলে নিশ্চিত করেন তদন্তকারী এক আইপিএস অফিসার। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১২ নভেম্বর ২০০৮)
- অভিনব ভারতের সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং এবং অজয় রাহিরকার পুলিশের কাছে বলে, পুরোহিত, ওড়িশা, কর্ণাটক ও আজমির শরিফ বিস্ফোরণের ঘটনারও মূলচক্রী। পুরোহিতের ছেলেবেলার বন্ধু রাহিরকার বলে, ২০০৮-এর জানুয়ারিতে, পুরোহিত একটি ফোনে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তখন সে তার কাছেই ছিল। রাহিরকার যখন পুরোহিতকে কী

হয়েছে জিজ্ঞাসা করে, তখন সে বলে তার লোকেরা আজমিরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। (*হিন্দুস্তান টাইমস*, দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি ২০০৯)

তথ্যপ্রমাণ সহ উপরের এই বক্তব্য প্রকাশ হওয়ার পরেও, আজমির বিস্ফোরণকাণ্ডকে কেনো বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ঘোষণা করে সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মালেগাঁও বিস্ফোরণের সঙ্গে তার চার্জশিট দেওয়া হলো না, তা বোধগম্য হয়নি।

সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় রাজস্থান পুলিশ কিছু তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে,

- সূত্রের খবর, ২০০৭-এর আজমির শরীফ বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে রাজস্থান পুলিশ হিন্দু সন্ত্রাসী সংগঠন অভিনব ভারতের সদস্যদের দিকে নজর দেয়। এরাই মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত ছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৩ এপ্রিল ২০০৯)
- রাজস্থান এটিএস-এর তদন্তে উঠে আসে অভিনব ভারতই মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত। মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ ও আজমির শরীফ বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও এরাই দায়ী। রাজস্থান এটিএস-এর অফিসাররা সম্প্রতি পুরোহিত সহ অন্যান্য অভিযুক্তের নার্কো পরীক্ষা ও ব্রেন ম্যাপিং-এর রিপোর্ট নিতে মুম্বাই এসেছিলেন। তখনই তারা জানান, একই অভিযুক্তরা আজমির শরীফের ঘটনাতেও জড়িত ছিল। (*লোকমত*, মুম্বাই, ১৪ অগাস্ট ২০০৯)

আসলে উপরের তথ্যগুলো থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় ২০০৮ সালেও বিস্ফোরণের তদন্তের সময়েই আজমির বিস্ফোরণের ঘটনার পুরোপুরি নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৃহত্তর ষড়যন্ত্র আড়াল করতেই এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

মামলা থেকেই বেরিয়ে আসুক না কেনো, একটা বিষয় কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভুলে গেছে। বিস্ফোরণে মৃত দুজনের মধ্যে একজন সাইদ সালিমের ওপর যখন পুলিশ, বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছিল, সালেমের পরিবারকে সেই সময় কতটা শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক খারাপ অবস্থার মধ্যে থাকতে হয়েছিল, সেটা আমরা ভুলে গেছি। দুবছর ধরে এই যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার কী করেছিল? কয়েক লাখ টাকা কি আদৌ এর জন্য বরাদ্দ হয়েছিল? ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের তদন্ত ঠিকমতো চালিয়ে আসল দোষীদের কড়া শাস্তি দিয়েই সরকার কিছুটা এর ক্ষতিপূরণ করতে পারে। যাইহোক, ক্ষমতাশালীরা সামনে এসেছে, আদালতের হাতে তারা শাস্তিও পেয়েছে।

❖ উত্তরপ্রদেশ আদালতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ

(২৩ অক্টোবর, ২০০৭)

- উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ-এর মাধ্যমে টেবিলে বসেই আইবি-র তদন্ত
- শূন্য থেকে প্রত্যক্ষদর্শী ও তাদের বয়ানে আঁকা ছবির উদয়
- ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের জড়িত থাকা নিয়ে সমান্তরাল তত্ত্ব
- বারাণসী, ফৈজাবাদ এবং লখনউ-এর আদালত চত্বরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ। ১৫ জনের মৃত্যু, আহত ৮০।

শুরুর দিন থেকেই মুসলিম সংগঠন ও ব্যক্তিদের ওপর দোষারোপ

- পুলিশের সন্দেহ ছিল জইশ সন্ত্রাসবাদীদের ওপর আইনজীবীদের হামলার বদলা নিতেই, হুজি এই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। দেওবন্দে এই দুই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর যোগ ছিল! (*পুরি*, কোলহাপুর এবং *লোকমত*, কোলহাপুর, ২৪ নভেম্বর ২০০৭)
- পুলিশ সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের দায় নিয়েছিল ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। (*পুধারি*, কোলহাপুর, ২৪ নভেম্বর ২০০৭)
- কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করে, পূর্ব পরিকল্পনা করে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়েছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও টাইমার। (*পুরি*, কোলহাপুর, ২৪ নভেম্বর ২০০৭)

দ্বিতীয় দিনের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন, স্থানীয় পুলিশের তদন্ত ও পরের গল্পগুলোর রূপকার আইবি

- তদন্তকারী সংস্থাগুলোর সন্দেহ ছিল হুজির গুরু নামে এক ব্যক্তি এই হামলার পরিকল্পনা করে। লশকর ও জইশের স্লিপার সেলের সদস্যদের দিয়ে কাজ করায়। আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ার ছাতার তলাতেই গোটা বিষয়টি হয়। বিস্ফোরণের ঠিক আগে বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমে ইমেইল পাঠানো হয়েছিল। গুরুর ইমেইল আইডি দিয়েই সেগুলো পাঠানো হয়। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)
- গোয়েন্দাদের মতে, গত জুনে উত্তর প্রদেশের এসটিএফ, হুজির ভারতীয় শাখার প্রধান বাবু ভাইকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকেই গুরুর সন্ধান মেলে। বাবু ভাই জানায় ২০০৫-এর আগস্ট থেকে

সেপ্টেম্বরের মধ্যে গুরুর কাছে সে ২০ কেজি আরডিএক্স পাচার করে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)

- তদন্তকারী সংস্থাগুলো যদিও হুজি ও জইশের হাত থাকা নিয়ে নিশ্চিত কিছু জানাতে পারেনি। (*সকাল*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)
- বিস্ফোরণের জন্য যে দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া করা হয়েছিল, সেই দোকান চিহ্নিত করে ফেলেছে পুলিশ। সাইকেল দোকানের মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ মনে করছে সেখান থেকে পাওয়া তথ্য জঙ্গিদের ধরতে সাহায্য করবে। (*সকাল*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)
- চার সন্দেহভাজনের ছবি প্রকাশ করেছে পুলিশ। (*সকাল*, পুনে এবং *পুধারি*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)
- ইমেইল যে সাইবার ক্যাফে থেকে পাঠানো হয়েছিল তার মালিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। (*পুধারি*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)
- সন্দেহভাজন আরও ১০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। (*পুধারি*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৭)

তৃতীয় দিনের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন—আইবি-র মশলার জন্য অধীর অপেক্ষা

- প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী সন্দেহভাজনদের ছবি প্রকাশের পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।
- শনিবার সকালে (২৪ নভেম্বর ২০০৭) আজমগড়ের দুর্গামন্দির পার্কের কাছ থেকে পরিত্যক্ত গাড়ি উদ্ধার। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে তদন্তকারীরা।
- কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বা রাজ্য এসটিএফ-এর কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়ার আশায় রয়েছে তদন্তকারীরা। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৬ নভেম্বর ২০০৭)

একমাস পর তদন্তকারীদের অপেক্ষার অবসান, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থারা তাদের গল্প নিয়ে তৈরি

- কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার থেকে খবর পেয়ে শনিবার সকালে (২২ ডিসেম্বর ২০০৭) উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এসটিএফ, বারাবাঁকি স্টেশনের কাছ থেকে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করে (মুহাম্মদ তারিক ও খালিদ মুজাহিদ)।
- আরেকজন হুজি সন্ত্রাসবাদী সাজ্জাদ, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। সেটাও আইবি-র দেওয়া খবরে সাজ্জাদ বিস্ফোরক সরবরাহ করেছিল বলে সন্দেহ।

- তিন জঙ্গির কাছ থেকে তিনটি মোবাইল, সিম কার্ড ও হুজি-র নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।
- পুলিশের দাবি, এক সঙ্গীকে বিস্ফোরক পাচার করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে তারিক ও খালিদ। উদ্ধার করা হয় দেড় কেজি আরডিএক্স, ছয়টি ডিটোনেটর, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের রড। ওই দুই জঙ্গিকে যে ব্যক্তি বোমা জোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল, শনিবার সকালে (২২ ডিসেম্বর ২০০২) ট্রেনে করে বারাবাঁকি স্টেশনে নামার কথা ছিল তার।
- পুলিশের দাবি অনুযায়ী লখনউ আদালতে বিস্ফোরণ ঘটায় খালিদ। তারিক ফৈজাবাদ বিস্ফোরণের বিষয়টি দেখে আর বাংলাদেশের বাসিন্দা মুখতার ওরফে রাজ বারাণসী বিস্ফোরণের পেছনে ছিল।
- উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত ডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা) জানায়, তারিক ও খালিদ ২২ মে গোরখপুর বিস্ফোরণের ঘটনা ও গত বছর সঙ্কটমোচন মন্দিরে বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত ছিল।

আইবি-র চাপে পুলিশের মারাত্মক দমননীতি

১. শুধুমাত্র ডাক নাম মুখতার। এই অপরাধে আফতাব আনসারি নামে কলকাতার এক ইলেকট্রিশিয়ানকে ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৭-এ উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ গ্রেফতার করে। তারিক ও খালিদের মতে আদালতে বিস্ফোরণে সেই মূলচক্রী। যাই হোক, ঠিকমতো যাচাই না করেই তাকে তুলে আনা হয়েছে বলে বুঝতে পেরে পরে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮)

২. শুক্রবার (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮) জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামায় পাকিস্তানের আবদুল রহমান নামে একজন লশকর শীর্ষ নেতা তার এক সঙ্গীর সঙ্গে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। আবদুল গত বছর উত্তরপ্রদেশে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে জড়িত। (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, পুনে, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮)

৩. যেভাবে খালিদ ও তারিককে গ্রেফতার করা হয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, নির্দোষীদের ফাঁসানোর ক্ষেত্রে এ হলো উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ-এর চাল। দোকানে চাট খাওয়ার সময় ১৬ ডিসেম্বর মুহাল্লা সদরগঞ্জ (মারইয়াহু, জৌনপুর) থেকে গ্রেফতার হয় খালিদ। এসটিএফ জোর জবরদস্তি তাকে টাটা সুমো গাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। ভিড় বাজারে তাকে গ্রেফতারের সময় খালিদের কাছে কোনও অস্ত্র, বোমা কিছুই ছিল

না। অন্তত শখানেক লোক গোটা ব্যাপারটা দেখে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশও হয়। স্থানীয় পুলিশে দায়ের হয় অভিযোগও তারিককে ১২ ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয়। নিজের বাইকে করে আজমগড়ের শেরওয়ানে তাবলীগের ধর্মসভায় সে যাচ্ছিল। স্থানীয় সংবাদপত্র তাদের গ্রেফতারের সেই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু কোথাও অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ ছিল না। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে জেলাপ্রশাসক ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয় খালিদ ও তারিকের পরিবার। কিন্তু তাদের কোনো তথ্য পুলিশ প্রকাশ করেনি। (*দ্য মিলি গেজেট*, ১-১৫ মার্চ, ২০০৮)। ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৭-এ *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার* প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ দেখায় তাদের ২২ ডিসেম্বর ২০০৭-এ বারাবাঁকি স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তদন্ত সংক্রান্ত কিছু যুক্তিগ্রাহ্য প্রশ্ন

- গুরুর ই-মেইল আইডি থেকে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নাম করে যে মেইল পাঠানো হয়েছিল, সেই ঘটনার তদন্ত থেকে কী পাওয়া গেল? আসলে কে তা পাঠিয়েছিল?
- প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী যে চার সন্দেহভাজন জঙ্গির ছবি প্রকাশ করা হয়েছিল, সেটার হলোটা কী? ধৃত অভিযুক্তদের সঙ্গে তার কি মিল রয়েছে? প্রত্যক্ষদর্শীদের দিয়ে তাদের কি চেনানো হয়েছিল?
- সাইকেলের দোকানের মালিক কি কোনো তথ্য দিয়েছিল? সাধারণত পরিচিত কেউ ছাড়া, বা অপরিচিত হলে কোনো ভাবে নিজেদের জানাশোনা করানোর পর কেউ সাইকেল ভাড়া নিতে পারে। সাধারণত এভাবে সাইকেল তো কেউ ভাড়া দেয় না। এই ক্ষেত্রে ভাড়া যারা নিয়েছিল তাদের চিহ্নিত করার তো ভালোরকম সুযোগ রয়েছে, কিছু কি পাওয়া গিয়েছিল?
- আজমগড়ের দুর্গা মন্দির পার্কের কাছ থেকে যে পরিত্যক্ত গাড়ি মিলেছিল সেই ব্যাপারটার কী হলো?
- তারিক ও খালিদের এই ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ে নির্দিষ্ট কী তথ্যপ্রমাণ ছিল তদন্তকারীদের কাছে? পুলিশ যেভাবে তাদের গ্রেফতার করেছিল, তাতেও রহস্য রয়েছে। পুলিশের দাবি ছিল, বোমা তৈরির জন্য এক সঙ্গীকে বিস্ফোরক পাচার করার সময় তাদের বারাবাঁকি স্টেশনের কাছ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০০৭-এ গ্রেফতার করা হয়। আবার একই সঙ্গে পুলিশ বলছে তাদের কেউ বোমা জোগাড় করে

দেওয়ার দায়িত্বে ছিল। যার সেই দিনই বারাবাঁকি স্টেশনে আসার কথা ছিল। কোন দাবিটা সত্যি?

তাছাড়া পুলিশ জানিয়েছিল তারা ২০০৭-এর ২২ ডিসেম্বর সকালে গ্রেফতার হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরিবার এবং কয়েকশো প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি ছিল, ১৬ ডিসেম্বর খালিদ গ্রেফতার হয়েছিল, তারিক গ্রেফতার হয়েছিল ১২ ডিসেম্বর। তাদের গ্রেফতারের খবর স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। স্থানীয় প্রশাসনও তাদের পরিবারের সুরেই সুর মেলায়। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, তাহলে মোবাইল ফোন, সিমকার্ড, হুজির নথিপত্রের যে প্রমাণের কথা বলা হচ্ছে, সে সব সাজানো। মামলা খাড়া করতে গোটাটাই নাটক। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত ডিজিপি (আইনশৃঙ্খলা) তাদের গ্রেফতারের পর জানিয়েছিল যে তারা সঙ্কট মোচন মন্দিরের ঘটনাতেও যুক্ত, তা সর্বৈব মিথ্যে। কারণ সে ঘটনার চার্জশিটে তাদের কোনো নাম ছিল না। ২০০৭, ২৩ ডিসেম্বর তাদের গ্রেফতারের খবর ছড়ানোর পরের দিন উপরের তথ্যগুলো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পুলিশ যেরকম জানিয়েছিল, যে তারা কী কী কাজ করেছিল, ২০০১-০২ পর্যন্ত তাদের গতিবিধি, আগের বিস্ফোরণে তাদের ভূমিকা সেসবই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কেউই একথা অন্তত মানেনি, গ্রেফতারের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুলিশ নাকি এত কিছু জেনে গেল।

- কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মারফত খবর পেয়ে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হাতে ২২ ডিসেম্বর ২০০৭-এ যখন সাজ্জাদ পাকড়াও হয়, তার সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটে। ওই ব্যক্তি সম্পর্কে কি এমন নির্দিষ্ট তথ্য আইবি-র কাছে ছিল?
- উত্তরপ্রদেশ ধারাবাহিক বিস্ফোরণে জড়িত অভিযোগে পাকিস্তানের শীর্ষ লশকর নেতা আবদুল রহমানকে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮-এ খুন করে। তাদের এই মামলায় জড়িত থাকার কোনো রকম গঠনমূলক তথ্যপ্রমাণ আদৌ ছিল কি? নাকি আইবি-র গল্পের ফাঁকফোকর ভরাতে ডাইরি, ফোন, নথি কিংবা বিস্ফোরকের মতো কিছু জিনিসপত্র দরকার ছিল পুলিশের?

সংক্ষেপে বলা যায় এই ঘটনার তদন্ত আসলে চোখে ধূলো দেওয়া। এটা আইবি-র তৈরি করা গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। আইবি-র চাপে যে গল্প বাস্তবে আনার দায়িত্ব ছিল উত্তরপ্রদেশ এসটিএফ-এর। আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়

মুসলিমদের চাপে রাখতে, হিন্দুদের মুসলিম সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে কতগুলো মনগড়া মুসলিম সংগঠনের অস্তিত্ব জাহির করা। অথচ যার কোনো অস্তিত্ব আদপেই নেই। লক্ষ্য ছিল, মুসলিমদের সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র জড়িত থাকার নয়া তত্ত্ব

আইবি ও উত্তরপ্রদেশের এসটিএফ-এর লক্ষ্যটা যাই থাকুক না কেনো, তারা কিন্তু তদন্তের মীমাংসা হয়ে গেছে বলে জানিয়ে দিয়েছিল। প্রথমত তিনজন হুজি জঙ্গির গ্রেফতারি আর দুজন লশকর জঙ্গির হত্যার ব্যাপারটায় তদন্ত শেষ বলে মনে হয়েছিল তাদের। কিন্তু ২০০৮ দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে দিল্লি পুলিশ আবার বলে বসে, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র আতিফ আমিন উত্তরপ্রদেশের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে দায়ী। পুনের *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*-র (২১ সেপ্টেম্বর ২০০৮) প্রতিবেদনে বলা হয়, দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের জয়েন্ট সিপি করণাল সিং দাবি করে, বাটলা হাউস থেকে সইফের গ্রেফতারি এবং পরে মধ্য দিল্লি থেকে জীশানকে ধরার পর উত্তরপ্রদেশ আদালতের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। করনাল সিং-এর দাবি, সাজিদ নামে একজনের সঙ্গে বারাণসী আদালতে বোমা রাখে সাইফ। ২০০৮, ১৭ ডিসেম্বর দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে চার্জশিট দিতে গিয়ে দিল্লি পুলিশ দাবি করে, পাঁচ অভিযুক্তকে জেরা করে জানা গেছে, আতিফ (দিল্লি পুলিশের মূলচক্রী বলে যাকে চালানো হয়েছিল। বাটলা হাউস এনকাউন্টারে খুন হয় সে) ২০০৫ সাল থেকে দেশে ঘটা বিভিন্ন বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল সে। এরমধ্যে রয়েছে সঙ্কটমোচন মন্দির, উত্তরপ্রদেশ আদালত, জয়পুর ও আহমেদাবাদের ঘটনা। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

আইবি-র কোলের ছেলে দিল্লি পুলিশ তাদের পরামর্শ ছাড়া কোনো কিছু করবে এটা ভাবা বাতুলতা। কিন্তু একটা কুট প্রশ্ন আসে, আচমকা কেনো হুজি থেকে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের দিকে গোটা ব্যাপারটা সরে গেল? কবেই বা সেই পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব সামাল দিত আইবি ও পুলিশ?

হতে পারে নতুন তত্ত্ব সরকারের বিদেশ নীতি অনুযায়ী তৈরি হয়েছিল (যেখানে হুজি, ভারত সরকারের বন্ধু বাংলাদেশের ছিল), নয়তো কোনো বিদেশি শক্তির হাত ছিল। নয়তো আইবি গোটা বিষয়টা, সংবাদমাধ্যমে ই-মেইল পাঠানো, কেন হেউডের কম্পিউটার হ্যাক করা, সমস্ত কিছু, 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনে'র কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের ঘাড়ে ঠেলতে চাইছিল। এটা বোঝা যাচ্ছিল, কেন হেউডকে ক্লিনচিট দিতে ওপর থেকে আইবি-র ওপরে চাপ ছিল। আর সেই

কারণেই নানান উল্টো পাল্টা তত্ত্ব, কখনও কখনও সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলা এই সব কীর্তি চলছিল। সত্যিটা সামনে আসবে আইবি-র সংস্পর্শ ছাড়া কোনো নিরপেক্ষ তদন্তকারী সংস্থাকে মাঠে নামালে।

❖ জয়পুর বিস্ফোরণ (১৩ মে, ২০০৮)

- তদন্তে সন্দেহভাজন মীনাকে যাচাই করা হলো না
- সন্দেহভাজনদের সাতটি ছবি রহস্যজনক ভাবে তুলে নতুন ভাবে ছবি প্রকাশ
- এরমধ্যেও আইবি-র তত্ত্ব দাঁড় করার চেষ্টা
- জয়পুরের একটা বাজারে নটি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ হনুমান মন্দিরের কাছে। ৬৮ জন মৃত, আহত কমপক্ষে ২০০।

শুরুর দিন থেকেই মুসলিম ব্যক্তি/সংগঠনের ওপর দায় চাপানো

- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর বাংলাদেশের হুজি ঘটনার সঙ্গে জড়িত।
- সূত্রের আরও খবর, রাজস্থানে নিজেদের ঘাঁটি তৈরি করে ফেলেছে হুজি। আগের রামপুরের সিআরপিএফ ক্যাম্প বা উত্তরপ্রদেশের তিন শহরে বিস্ফোরণের ঘটনাতেও এদের হাত ছিল।
- আজমির বিস্ফোরণেও হুজি-র হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। বিস্ফোরণে টিএনটি-র মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছিল।
- বিস্ফোরণের ধাঁচ মালেগাঁও বিস্ফোরণের মতো। এখানেও সাইকেল ব্যবহার করা হয়েছিল। যদিও মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তকারী সিবিআই-এর দাবি ছিল এই দুটি বিস্ফোরণের মধ্যে কোনো মিল নেই।
- ২০০৬-এর মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের ঘটনাতেও হুজির হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়।
- এলটিটিই-দের মতো নতুন সাইকেল ব্যবহার করেছিল তারা। যার থেকে ধারণা করা যেতে পারে, সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের যোগ রয়েছে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, *সকাল*, পুনে এবং *পুধারি*, পুনে, ১৪ মে ২০০৮; *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, *সকাল*, পুনে এবং *পুরি*, পুনে এবং *এশিয়ান এজ*, মুম্বাই ১৫ মে ২০০৮)

তদন্তে আইবি-র অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ

- গোয়েন্দা মারফত খবর, ঘটনায় বিদেশি শক্তির হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। (*সকাল*, পুনে, ১৪ মে ২০০৮)
- পশ্চিম বাংলার অরক্ষিত সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে আরডিএক্স পাচার করে আনা হয়েছিল বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৫ মে ২০০৮)

আরও তথ্য আর অনুমানের খেলা

- আরডিএক্সের ব্যবহার উড়িয়ে দেয় সূত্র। সাইকেলে কম শক্তিশালী বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল বলে অনুমান। যদিও রাজস্থানের ডিজিপি-র দাবি ছিল ঘটনায় আরডিএক্স-ই ব্যবহৃত হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, হনুমান মন্দিরের কাছে একটি বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল।
- পুলিশ সূত্রে খবর, হনুমান মন্দিরের কাছে একটি বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল।
- ঘটনায় টাইমার ও রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হয়েছিল।
- বিস্ফোরণস্থলে ঘড়ি লাগানো টাইমার মিলেছিল।
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের লক্ষ্য ছিল ৩টি—বিশ্বকে সন্ত্রাসী বার্তা পাঠানো, ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করা এবং পর্যটকদের মুখ ফিরিয়ে দিয়ে রাজস্থানের অর্থনীতির ওপর আঘাত হানা।
- বুধবার রাতে (পরের দিন রাতে) বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর নাম করে বেশ কিছু মেইল পাঠানো হয়। বেশ কয়েকটি নিউজ চ্যানেলে। বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রস্তুতির ভিডিও সহ মেইলগুলো পাঠানো হয়েছিল।
- গুরু মেহদি নামে এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে গাজিয়াবাদের একটি সাইবার ক্যাফে থেকে মেইলগুলো পাঠানো হয়। সাইবার ক্যাফের মালিক সমভীর ওরফে মধুকর মিশ্রা গ্রেফতার হয়।
- পুলিশের দাবি, ভিডিও ক্লিপে যে সাইকেলগুলো দেখানো হয়েছে সেগুলো, আর বিস্ফোরণে ব্যবহৃত সাইকেলগুলো হয়তো এক নয়। ভিডিও ক্লিপ পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে পাঠানো হয়েছে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, *সকাল*, পুনে, *পুরি*, পুনে, ১৪ মে ২০০৮; *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, *সকাল*, পুনে, *পুধারি*, পুনে, ১৬ মে ২০০৮)

তদন্তের শুদ্ধাশুদ্ধি প্রক্রিয়া

- সাইকেলের দোকানের মালিকের কথামতো চারজন সন্দেহভাজনের ছবি আঁকিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর তিন ব্যক্তি, আজমিরের গোয়ালের মালিক, পুষ্করের এক সিটি কর্পোরেশন কর্মচারী, উদয়পুরের হোটেল ও রেস্টুরেন্টের এক কর্মী দাবি করে, তারা ওই অভিযুক্তদের দেখেছে। পুলিশ তাদের দাবি মতো তদন্ত করে আরও তিনটি ছবি প্রকাশ করে।
- ঘটনার দুদিন পর, রেলওয়ে পুলিশ অস্বাভাবিক অবস্থায় একটি পরিত্যক্ত গাড়ি উদ্ধার করে। গাড়িটি আফজল খান নামে এক ব্যক্তির ছিল। এই ঘটনায় অবশ্য পুলিশি তদন্তে কোনো কিছুই মেলেনি।
- এনএসজি ও রাজস্থান ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি দাবি করে, জয়পুর বিস্ফোরণে আরডিএক্স ছিল না।
- বুধবার রাতে (২১ মে ২০০৮) গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লি পুলিশ এক সন্দেহভাজন হুজি জঙ্গিকে গ্রেফতার করে। ৩.১ কিলো শক্তিশালী আরডিএক্স তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়।
- রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য জায়গা থেকে কয়েকশো বাংলাদেশি ও সিমি সদস্যদের আটক করে পুলিশ। এদের মধ্যেই ছিল ইমরান কাজি। ২১ মে ২০০৯-এ মহারাষ্ট্রের মুম্বাই-গোয়া রোড সংলগ্ন মানগাঁও থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে।
- সাইকেল মালিক যে বিবরণ দিয়েছিল, তা অনুযায়ী যে সাতটি আঁকা তৈরি হয়েছিল, তা দিয়ে পুলিশ কিছুই করতে পারেনি। কারোর সঙ্গেই সে ছবি মেলেনি। ফলে সেই আঁকা বাতিল করে দেয় তারা। পুলিশ কম্পিউটারের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।
- পুলিশের দাবি ছিল, দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতারের পর তারা প্রায় তদন্তের শেষ কিনারায় পৌঁছে গেছে।
- যাইহোক, এসটিএফ ওই সাতটি ছবি বাতিল করে নতুন ছবির পরিকল্পনা করে। সেই ঘটনাটি এবং আরডিএক্স না থাকার সম্ভাবনা নিয়ে এসটিএফ-এর দাবি, এই দুটি বিষয় সরকারকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে। ফলে তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়।
- যেখানে কেন্দ্রীয় সন্ত্রাস বিরোধী সংস্থাগুলোই অন্ধকারে হাতড়ে মরছে, সেখানে রাজস্থান পুলিশ প্রায় ৮ হাজার মোবাইল ফোনের কল নিয়ে তদন্তে নামে। তারমধ্যে একটিও যদি বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত

থাকে, এই আশায় চলতে থাকে মহাযজ্ঞ। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৭ মে ২০০৮, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৬ মে ২০০৮, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৮ মে ২০০৮, *সকাল*, পুনে, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ২১ মে ২০০৮, *এশিয়ান এজ*, ২০ মে ২০০৮, *দ্য হিন্দু*, মুম্বাই ২২ মে ২০০৮, *পাইওনিয়ার*, মুম্বাই, ২১ মে ২০০৮, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৩ মে ২০০৮, *পুধারি*, পুনে, ১৯ মে ২০০৮, *পুরি*, পুনে ২৩ মে ২০০৮, *সকাল*, পুনে, ২২ মে ২০০৮, *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ১৪ জুন, ২০০৮)

তথ্যসূত্র; কয়েকটা খতিয়ে দেখা হয়, কয়েকটায় অবহেলা

- বাংলাদেশের হুজিকে এই বিস্ফোরণে সন্দেহ করার কারণ হলো, জঙ্গিরা যেখান থেকে সাইকেল কিনেছিল, সেই দোকানের এক কর্মী জানায়, এক ব্যক্তি মাথার মাঝখানে চুলে খোপা করে রেখেছিল, বাংলা ভাষায় কথা বলছিল। গোয়েন্দা আধিকারিকদের মতে, এটাই নাকি তাদের দাবির পক্ষে একমাত্র প্রমাণ।
- বিস্ফোরণস্থল থেকে পাওয়া গিয়েছিল মুজফফরনগরের একটি সাইবার ক্যাফে থেকে কাটা বিমানের টিকিট। মুজফফরনগরে থাকার সময় শামিম ইসলাম নামে এক ব্যক্তি পাটনা থেকে কলকাতায় যাওয়ার টিকিটটি কেটেছিল বলে অভিযোগ। পুলিশ শামিম ইসলামের খোঁজ চালাচ্ছে।
- বিস্ফোরণে বিজয় নামে এক রিকশাচলক আহত হয়। পরে তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিজয় পুলিশকে জানায়, মীনা নামে এক মহিলা, হাওয়া মহলের কাছের একটি জায়গায় একটা নতুন সাইকেল নিয়ে যাওয়ার জন্য তার রিক্সা ভাড়া করেছিল। তাকে নাকি ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল সে। এই হাওয়া মহলের কাছেই বিস্ফোরণ হয়। আজ পর্যন্ত টিভি চ্যানেলেও এই কথা জানায় বিজয়। সেইদিন সন্ধ্যায় পুলিশ তাকে নিয়ে যায়। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয় পুলিশ ওই মহিলার খোঁজে ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছে।
- মেইল-এ যে এগু শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি আফজল গুরুকে ইঙ্গিত করেছে কিনা, তা নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে।
- তদন্তে জড়িত আধিকারিকরা জানিয়ে দেয়, যেহেতু সন্ত্রাসবাদীদের শিকড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রয়েছে, সেহেতু একমাত্র কেন্দ্রীয়

সংস্থাগুলোর তরফে আসা তথ্য হাতে পেলেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আইবি-র তথ্যসুত্রে (মনগড়া গল্প) তদন্ত এগোয় ও শেষ হয়

- ঘটনার 'মূল সন্দেহভাজন শাহবাজ হুসেন নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। সে উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি জেলার বাসিন্দা। পুলিশের মতে গুজরাট সহ পাঁচ রাজ্যে সন্ত্রাসী হামলায় সে হলো অন্যতম মূলচক্রী। আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত আজমগড়ের (উত্তরপ্রদেশ) আবুল বাশার এবং গুজরাটের সাজিদ মনসুরির সঙ্গে তার বেশ ভালো যোগাযোগ রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থান এটিএস-এর যৌথ অভিযানে সে গ্রেফতার হয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৭ অগাস্ট, ২০০৮)

২০০৮-এর ২২ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট দাবি করে, তারা জয়পুর ধারাবাহিক বিস্ফোরণের সমস্ত জট ছাড়িয়ে ফেলেছে। তাদের গল্প ছিল নিম্নরূপ—

- দশজন জঙ্গি ১৩ মে তিনটি দলে ভাগ হয়ে জয়পুরে আসে। এদের মধ্যে আটজনকে শনাক্ত করা গেছে। তাদের ব্যাগে হাতে তৈরি বোমা, সাইকেল ও যাতায়াত খরচ বাবদ সাড়ে চার হাজার নগদ টাকা ছিল।
- বিস্ফোরণস্থলে অনুসন্ধান চালানোর জন্য এর আগে ১১ মে-তেও তারা জয়পুর এসে ঘুরে যায়।
- বিস্ফোরণ ঘটানো ও সেগুলো রাখার কাজে জড়িত ছিল, আতিফ, সাজিদ (দুজনেই বাটলা হাউস এনকাউন্টারে মারা গিয়েছিল), সাইফ (পুলিশ হেফাজতে), সাদাব (দিল্লি এনকাউন্টারের সময় পালায়), খালিদ, আরিফ, সাজিদ ভাই, সলমান এবং আরও দুজনের পরিচয় মেলেনি। সেই দুজনকে সাদাব চিনত বলে মনে করছে পুলিশ। সাদাবের গ্রেফতারির পরেই তাদের পরিচয় জানা যাবে।
- তারা তিনটি দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আরিফ, সলমান ও আরেকজন জঙ্গি একটি দলে। এর মাথা ছিল আতিফ। সাদাব আরেকটি দলের দায়িত্বে ছিল। সেই দলে ছিল খালিদ ও আরেকজন জঙ্গি। সাজিদ ভাই, সইফ ও সাজিদ ছিল তৃতীয় দলটিতে।
- বোমা রাখার পর তারা ছড়িয়ে যায়। আলাদা ভাবে জয়পুর স্টেশনে পৌঁছয়। শতাব্দী এক্সপ্রেসে করে এরপর তারা দিল্লিতে ফিরে যায়।

- পরিকল্পনা যারা করেছিল আর কাজটা যারা ঘটিয়েছিল, তাদের মধ্যে যোগাযোগ রাখছিল কয়মুদ্দিন। এর সঙ্গে দেখা করতে আতিফ ৯ মে আরেকবার জয়পুরে এসেছিল।
- পরিকল্পনাকারীদের কয়েকজন যেমন, তৌকির ওরফে সোবাহান, সাজিদ মনসুরি, শাহাবাজ হুসেনকে চিনত আতিফ। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

তদন্তে ফাঁকফোকর ও সন্দেহজনক কিছু ঘটনা

- ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের' নাম করে যে মেইলটি পাঠানো হয়েছিল, সেটির গোড়াটা ঠিক কোথায়, তা খোঁজার জন্য ঠিকঠাক কোনো চেষ্টা করা হয়নি।
- বিস্ফোরণে বিজয় ও মীনার ভূমিকা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল, তা নিয়ে কীরকম তদন্ত হয়েছিল সেটা জানা যায়নি। আর যদি তদন্ত হয়েই থাকে, তাহলে সেখান থেকে মিললটা কী?
- এটা ঠিক বোঝা গেল না, স্থানীয় পুলিশ নিজেরা যে তথ্যসূত্র পেয়েছিল, তাই দিয়ে কেনো তারা তদন্ত চালিয়ে নিয়ে গেল না। কেনো তাদের আইবি-র তথ্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হলো। নাকি তাদের কাছে কোনো নির্দেশ ছিল, যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তরফে সবুজ সংকেত না মেলা পর্যন্ত, তারা তদন্তে এগোতে পারবে না। সংবিধানেও একটি বিশেষ ধারা রয়েছে এর জন্য।
- আইবি-র কাছ থেকে খবর পেয়ে ২০০৮-এর ২১ মে এক হুজি জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশ। তাদের কী হলো জানা যায়নি। বাংলাদেশের অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে হুজি জঙ্গিরা আরডিএক্স পাচার করেছিল, আইবি এহেন তত্ত্ব খাড়া করার তালে ছিল। আর সেই তত্ত্ব মাথায় রেখেই ২০০৮, ২১ মে ৩.১ কেজি আরডিএক্স সহ এক 'হুজি জঙ্গি'কে গ্রেফতার করে তারা (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৫ মে, ২০০৮)। কিন্তু একই সময়ে এনএসডি ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেন, জয়পুর বিস্ফোরণে আরডিএক্স ব্যবহার করা হয়নি। (*সকাল*, পুনে, ২১ মে ২০০৮)। অথচ এহেন রিপোর্টের আগেই তারা আরডিএক্স সহ হুজি জঙ্গিকে গ্রেফতার করে ফেলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিল তারা। সে কারণে তড়িঘড়ি এই তত্ত্বকে সরিয়ে, নতুন তত্ত্বের আমদানি করতে উঠেপড়ে লেগেছিল

আইবি। স্থানীয় পুলিশ সন্দেহভাজনদের ছবি আচমকা তুলে নেওয়ায় বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে।

- সাইকেলের দোকানের মালিকের কাছে শুনে পুলিশ যেভাবে চটজলদি সাত অভিযুক্তের ছবি প্রকাশ করেছিল, তারপরেও কেনো তা দুদিনের মধ্যে তুলে নেওয়া হলো?
- *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* মুম্বাই (১৬মে ২০০৮)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী সন্দেহভাজনদের ছবি তুলে নেওয়ার কারণ হলো, সাইকেল দোকানের মালিকের বর্ণনার সঙ্গে সেগুলো নাকি খাপ খায়নি। তাহলে প্রশ্ন কি ওঠে না, যে ঠিকমতো যাচাই না করেই কীভাবে ছবিগুলো আচমকা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিল? নাকি পুলিশ আগেভাগে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে ঠিক করে রেখেছিল, আর তার সঙ্গেই যাতে ছবি মিলে যায়, তারা সেই চেষ্টায় ছিল?
- আইবি-র নির্দেশে আহমেদাবাদ পুলিশ ১০ জনকে গ্রেফতার করে। তারপর দাবি করা হয়, জয়পুর বিস্ফোরণ সহ অন্যান্য বিস্ফোরণের তদন্তের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এরপর কম্পিউটারে অভিযুক্তদের ত্রিমাত্রিক বা থ্রি ডাইমেনশনাল ছবি তৈরি করা হয়। একই সময়ে পুরোনো ছবিগুলো তুলে নেওয়া, এই গ্রেফতারি আর নতুন ছবি তৈরির মধ্যে কোনো যোগাযোগ রয়েছে কি? নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয়, তাহলে এটা কি বলা যায়, যে আইবি-র নির্দেশেই পুরোনো ছবি তুলে নিয়ে নতুন ছবি তৈরি করা হয়েছে। আহমেদাবাদে যে লোকগুলোকে দাঁড় করা হয়েছিল, তাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতেই কি এই কাণ্ড?
- ঠিক কোন সময় ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি হয়েছিল, কখনই বা তা প্রকাশ করা হলো? আগের আঁকা ও পরের আঁকার মধ্যে কোনোরকম কি মিল রয়েছে? নাকি দুটো একদমই আলাদা?
- আহমেদাবাদ পুলিশ রাজস্থান এটিএস-এর হাতে যাদের তুলে দিয়েছিল, তাদের সঙ্গে ছবির কি কোনো মিল রয়েছে?
- ধৃত ব্যক্তিদের কি ওই সাইকেলের দোকানের মালিককে দিয়ে নতুন করে চেনানো হয়েছিল? যদি তাই হয়, তাহলে সে কি তাদের সবাইকে চিনতে পেরেছিল, নাকি কয়েকজনকে? আইবি আর আহমেদাবাদ পুলিশের নির্দেশ মতো দিল্লি পুলিশ, এনকাউন্টারে যাদের মেরে ফেলেছিল, অথবা যাদের পলাতক হিসেবে ঘোষণা করেছিল, তাদের মধ্যেই কেউ কি গিয়েছিল সেই সাইকেলের দোকানে?

- আহমেদাবাদ পুলিশ ২০০৮, ১৬ অগাস্ট দাবি করেছিল, জঙ্গিদের বেশ কয়েকজনকে তারা গ্রেফতার করে। আর সেই গ্রেফতারিতেই জয়পুরসহ বেশ কিছু জায়গায় বিস্ফোরণের তদন্তের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। সেইমতো ২০০৮ এর ২৩ সেপ্টেম্বর প্রায় একমাস পরে এটিএস রাজস্থানও আবার কীভাবে ঘোষণা করে, তারা তদন্তের নিষ্পত্তি করে ফেলেছে? ঘটনার মধ্যে যে ফাঁকফোকর রয়েছে, সেগুলো ভরাট না করা পর্যন্ত এই ধরনের কথা বলতে আইবি কি তাদের নিষেধ করেনি? কিরকম ফাঁকফোকর? দিল্লিতে এনকাউন্টারে দুজন মারা যায়, দুজন পালায়, একজন গ্রেফতার হয়। আর এই এনকাউন্টার হয়েছিল কবে? ১৯ সেপ্টেম্বর। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জবানবন্দি, মোবাইল ফোনের রেকর্ডস, থেকে শুরু করে যারা নিহত হয়েছিল তাদের লেখা ডাইরি, অস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধারের মতো সাজানো গোছানো প্রমাণ ছাড়া, এটিএস অভিযুক্তদের সম্পর্কে আর এমন কি মারাত্মক প্রমাণ হাতে পেয়ে গিয়েছিল?

৪. নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ড (৫ এপ্রিল ২০০৬)

আপনাআপনিই অভিযুক্তের আসল চেহারা ফাঁস

২০০৬-এর এপ্রিলে নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত আপনাআপনিই হয়ে গিয়েছিল। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্থার অভিযুক্ত জঙ্গিটি একদম হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। নেহাত কপালের ফেরে অভিযুক্তের আসল চেহারা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ফলে হস্তক্ষেপ বা তদন্ত বিকৃতির ব্যাপারে আইবি-র কোনো কিছুই করার ছিল না।

২০০৬ এপ্রিলে মাঝরাতে নান্দেড়ে, অবসরপ্রাপ্ত পিডব্লিউডি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার লক্ষণ গুন্দয়া রাজকোন্দরের বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। দুজন মারা যায়। তাদের মধ্যে একজন লক্ষণের ছেলে নরেশ রাজকোন্দর ও অন্যজন হিমাংশু পানসে। আরও চারজন আহতদের মধ্যে ছিল, মারুতি কেশব বাগ, যোগেশ দেশপাণ্ডে ওরফে ভিদুলকর, গুরুরাজ তুপতেওয়ার ও রাহুল পাণ্ডে। শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্তারা ওই জায়গায় গিয়েছিল, তবে স্থানীয় পুলিশ থানার একজন এএসআই-কে দিয়ে এফআইআর করানো হয়েছিল। এক আহতের জবানবন্দির ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়। সেখানে বলা হয়, মৃত নরেশ রাজকোন্দর বাড়িতে বেআইনি বাজির ব্যবসা চালাত। রাজকোন্দর আর মারুতি কেশব ওই সব বাজির খুব কাছেই সিগারেট খাওয়াতে বিস্ফোরণটি হয়। এই গল্পে যাতে একটু সত্যি ব্যাপারস্যাপারের মশলা দেওয়া যায়, সেই কারণে ওই বাড়িতে পরে বিপুল পরিমাণ বাজি রেখে দেওয়া হয়, যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। অথচ তাদের মাথায় এটা কাজ করেনি, এত বড় বিস্ফোরণের পরেই ওইসব বাজি ওই বাড়িতে অক্ষত থাকে কী করে! তাও জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার সংবাদমাধ্যমের কাছে ওই বাজি তত্ত্বই আওড়াতে থাকে। কিন্তু সেই তত্ত্বে এত বেশি ফাঁকফোকর, যে পুলিশও তাতে সন্দেহ করতে শুরু করে দেয়।

নান্দেড়ে জেলাপ্রশাসক, আইজিপি রেঞ্জের হেডকোয়ার্টার। কিছু আইবি অফিসারেরও ঘাঁটি ওখানে। সেই জায়গায় বিস্ফোরণের মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনার এফআইআর করছে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ ইনস্পেক্টরের ন্যায় অধঃস্তন পুলিশকর্মী, এটা বিশ্বাস করাটা একটু অস্বস্তিকর নয় কি? আর কোন কোন ধারা এফআইআর-এ আনা হয়েছে সেটাও বোধকরি আঁচ করা যায়। বিস্ফোরণের পর তাই কী কী হতে পারে, সেই সবই তাই একটু মাথা খাটালেই বুঝে যাবেন।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ, আহতদের জবানবন্দি থেকে শুরু করে কোন কোন সংগঠন এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, সেই সব তথ্য সম্পর্কে মুম্বাইতে

তার ওপরওলাদের অবহিত করাবেন জেলাশাসক। স্থানীয় আইবি অফিসাররাও মুম্বাই ও দিল্লিতে তাদের কর্তাব্যক্তিদের গোটা বিষয়টি জানাবেন। এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আইবি-তে নিজেদের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। সেই সময় সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবে, সেই মতো আইবি রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে দেবে, যে ব্যাপারটা বেশ সংবেদনশীল ঘটনা, আচমকা কোনো সিদ্ধান্তে আসাটা বেশ বিপজ্জনক ব্যাপার। এবং আহতরা যে জবানবন্দি দিয়েছে ঠিক তার ভিত্তিতেই অভিযোগ দায়েরের পরামর্শ দেওয়া হবে।

একইসঙ্গে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোকেও ব্যবহার করা হবে। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর আচার আচরণ একদম ছকে বাধা। সংবাদমাধ্যমে যেহেতু ব্রাহ্মণ্যবাদীদেরই রমরমাটা বেশি, তাই কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা বা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে তাই পুলিশকে ঘিরে ধরে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়। তারা নিজেরা ঠিক যেমনটা চাইছে, সেরকম ভাবেই প্রশ্নগুলো ধেয়ে আসে, ইঙ্গিত দেওয়া হয়, পুলিশ ঠিক এই রাস্তা ধরেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাক। আর যদি পুলিশ অন্য রাস্তা ধরে, এবং সেটা সত্যির ওপর ভিত্তি করে হলেও, তাহলে তাতে কী হতে পারে, কতটা পুলিশকে নিয়ে উল্টোপাল্টা খবর বেরোতে পারে, সেটারও মোটামুটি একটা ইঙ্গিত থেকে যায়। স্থানীয় পুলিশ ভালো মতোনই জানে, স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরের ওপর ভিত্তি করেই একটা ধারণা তৈরি করে ফেলবে তার ওপরওয়ালারা, সরকার ও সাধারণ মানুষ। সেই কারণেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংবাদিকদের জুতোতেই পা গলায় তারা। এর পাশাপাশি যারা একটু অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংবাদিক, তারা মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য দলের নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা করে, কোনটা করা ঠিক হবে, আর কোনটা হবে ভুল। এটাই স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও সরকার-প্রশাসনের চেনা রাস্তা। সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি সেটাই হয়। নান্দেড়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোছানো চাল চালছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি। আর তার ফলও মিলছিল। বাজির তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই এফআইআর-ও দায়ের করিয়ে নিতে পেরেছিল তারা।

তবে সেই ঘটনা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাময়িক জয় ছিল মাত্র। বিস্ফোরণের তীব্রতা, বিস্ফোরণস্থলে পাওয়া বিস্ফোরকের নমুনা, যারা মারা গিয়েছিল ও আহত হয়েছিল, তাদের নিয়ে যা তথ্য হাতে এসেছিল, তাতে একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝে যেত বাজি নয়, আসলে সেখানে বোমা বিস্ফোরণই হয়েছে। অগত্যা নান্দেড় রেঞ্জের আইজিপি ঘটনার সত্যতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। মিডিয়াকে এরপর জানানো হয়, মৃতদের শরীর থেকে বোমার টুকরো মিলেছে, ঘটনাস্থলে মিলেছে

তাজা পাইপ বোমা। পুলিশকে ভুল পথে চালানোর জন্যই বাজির গল্প ফেঁদেছিল আহত ব্যক্তি।

আরও তদন্তে জানা যায়, আহত ও নিহতরা আরএসএস ও বজরং দলের সক্রিয় সদস্য। তারা বিভিন্ন ধরনের বোমা তৈরি আর ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিল। বিভিন্ন মসজিদে তারা হামলা চালাত। এমন ভাবে বিষয়টিকে দেখাত, যাতে কোনো মুসলিম সংগঠনের হাত রয়েছে তার পেছনে। যার বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেই লক্ষণ রাজকোন্দর পরিচিত আরএসএস নেতা। তাছাড়াও অভিযুক্তের বাড়ি থেকে ডাইরি, গুরুত্বপূর্ণ নথি, কিছু মুসলিম ধর্মস্থানের ম্যাপ, মোবাইল নম্বর উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তার ভিত্তিতেই ১৬ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে তারা প্রত্যেকেই এক এক করে জামিনও পেয়ে যায়। আর বাকি কিছু সন্দেহভাজন ছিল, তারাও আগাম জামিন নিয়ে নেয়।

প্রায় মাস খানেক ধরে ভালোভাবে স্থানীয় পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে। কিন্তু বিনাদ্বিধায় বাজি বিস্ফোরণের তত্ত্বে সায় দিয়ে তারা জনগণ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হারিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, যেহেতু বিস্ফোরণের তদন্তের জাল আরও বড় হচ্ছিল, তাই মামলা চলে যায় মহারাষ্ট্র পুলিশের এন্টি টেররিস্ট স্কোয়াড বা এটিএস-এর হাতে। যার দায়িত্বে ছিল আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিশ্বাসভাজন ডিজিপি কেপি রঘুবংশী। স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাকে নিয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত ছিল। এটুকু আস্থা ছিল, রঘুবংশী তদন্তের সরকারি নিয়ম কানুনের দায়রায় থেকেই ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে দিতে পারবে।

ঘটনাস্থলে পাওয়া নথিপত্র, ডাইরি, ম্যাপ, নকল দাড়ি, মুসলিমদের পোশাক, টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বরের মতো জিনিসপত্র থেকে অনেক প্রমাণ হাতে এসেছিল। ফলে এটিএস-এর পক্ষে সেগুলো উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। প্রমাণ হিসেবে সেগুলোকে ধরেই তদন্ত এগোতে হতো তাদের। তার থেকেও বড় কথা অভিযুক্তদের নার্কো পরীক্ষা করাতে হতো, স্থানীয় পুলিশ আরও কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছিল, তাদেরও জবানবন্দি নিতে হতো। এটিএস-এর সামনে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বজরং দল ও সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ হস্তগত হয়েছিল। সঙ্ঘ পরিবারের সন্ত্রাসী জাল নষ্ট করার জন্য সে সমস্ত প্রমাণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ২০০৬ সালের ২৪ অগাস্ট এটিএস যখন তাদের প্রথম চার্জশিট পেশ করল, তখন দেখা গেল তদন্ত শুধুমাত্র নান্দেড় বিস্ফোরণেই আটকে রাখা হয়েছে এবং তার সঙ্গেই ২০০৩ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ঘটা পরভানি, পূর্ণা ও জালনার ঘটনাকেও ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে। আসলে ওই ঘটনাগুলো আপনা আপনিই এরসঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল। আলাদা করে সেগুলোকে জুড়তে কোনো কষ্ট

করতে হয়নি। কিন্তু এর বাইরেও যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের আরও বড় সন্ত্রাসী জাল ছড়ানো ছিল, তার দিকে হাত বাড়ানোই হলো না। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু ছিল না, কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী-আইবির যোগসাজশ তো জানা কথা। তাছাড়া এটিএস প্রধান রঘুবংশী যেভাবে আইবি-র কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল, তাতে তো এটাই হওয়ার ছিল।

২০০৬-এর ২৪ তাগাস্ট যে প্রথম চার্জশিট দাখিল করা হয় তাতে সাতজন অভিযুক্তের নাম ছিল। রাহুল পাণ্ডে, লক্ষণ রাজকোন্দর, সঞ্জয় চৌধুরি, রামদাস মুলঙ্গে, উমেশ দেশপাণ্ডে এবং মৃত হিমাংশু পানসে এবং নরেশ রাজকোন্দর। তাদের বিরুদ্ধে ৩০৪, ২৮৬, ৩৩৮, ২০১, ২০২, ২০৩, ২১২, ১২০, ৩৪, ১০১ ধারা সহ এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্স আইন ১৯০৮-এর ৩, ৪, ৫, ৬ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। এছাড়াও আনলফুল পোজেশন অব আর্মস আইনের ৩, ২৫ ও ৩৫ ধারা, অ্যাটেম্পট টকমিট অর অ্যাবেটিং আ টেররিস্ট আইনের ১৮ নং ধারা, আনঅথোরাইজড পজিশন অব বোম্ব আইনের ২৩ নং ধারার মতো বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছিল।

আরও তদন্তের পর ২০০৬, ১১ নভেম্বর অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করে এটিএস। তাতে চারজনের নাম ছিল—মারুতি বাগ, যোগেশ বিদুলকর, গুরুরাজ জয়রাম এবং মিলিন্দ একতাতে। কিন্তু ঘটনার শিকড়ে যাওয়ার জন্য এটিএস-এর সদিচ্ছার কোনো প্রমাণ এই চার্জশিটেও ছিল না।

তদন্তে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্য

এটিএস বিভিন্ন নথিসহ যে দুটি চার্জশিট দাখিল করে, তাতে বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছিল।

- অভিযুক্তরা নান্দেড়ে বোমা জড়ো করে রাখছিল। অভিযুক্তরা পরভানির মুহম্মদিয়া মসজিদে বিস্ফোরণ (নভেম্বর ২০০৩), জালনার কাদরিয়া মসজিদে (অগাস্ট ২০০৪), পরভানি জেলার পূর্ণা এলাকায় মীরাজুল উলুম মাদ্রাসা/মসজিদে (অগাস্ট ২০০৪) বিস্ফোরণেও জড়িত ছিল।
- ৫-৬ এপ্রিল, ২০০৬-এ যে বোমাগুলো ফেটে গিয়েছিল, সেই বোমাগুলো ঔরঙ্গাবাদের একটি মসজিদে বিস্ফোরণের জন্য রাখা ছিল। হিমাংশু পানসে ও মারুতী বাগ ২০০৪-এর মে-তে ওই মসজিদ ও তার আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখেও এসেছিল।
- পুলিশ অভিযুক্তদের বাড়ি ও অন্যান্য জায়গায় অভিযান চালায়। তাতে দেখা যায়, হিমাংশু পানসে, নরেশ রাজকোন্দর, মারুতী বাগ, যোগেশ বিদুলকর, গুরুরাজ, রাহুল পাণ্ডে, সঞ্জয় চৌধুরি, রামদাস মুলাঙ্গে এবং

লক্ষণ রাজকোন্দররা প্রত্যেকেই আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সক্রিয় ও কট্টর সমর্থক-সদস্য ছিল।

- ওই সব সংগঠন এদের মাথায় ঢুকিয়েছিল, মুসলিম কট্টরপন্থী সংগঠনগুলো' নিরাপরাধ হিন্দুদের ওপর নাকি হামলা চালায়। হিমাংশু পানসে ও রাহুল পাণ্ডে জিমনাশিয়াম খুলে তরুণ যুবকদের মাথায় তাদের মতো করে হিন্দুত্বের তত্ত্ব ঢোকাত। এছাড়াও তারা নান্দেড়ে বজরং নগরে সঙ্ঘের একটি শাখা অফিসও খুলে ফেলেছিল।
- হিন্দুদের প্রতি কেমন করে মুসলিমরা অবিচার করছে, সেই ধারণা ছড়িয়ে বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা করে মুসলিম বিরোধী পরিবেশ তৈরি করছিল তারা। 'হিন্দুরা হিন্দুত্বের প্রতি কিছু করুক, তা নিয়ে জনগণকে উৎসাহ দিতে শুরু করেছিল তারা। শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের প্রায় প্রত্যেকটা উৎসব পালন করা সেগুলোতে জনসমাগম বাড়ানোর কাজ চলছিল।
- বদলা নেওয়ার জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। এরপর ২০০৩ সালে গুনে ফোর্ট সিংগড়ের কাছে আকাঙ্খা রিসোর্টে জড়ো হয়েছিল বাগ, পানসে, চৌধুরি ও বিদুরকার। মিঠুন চক্রবর্তী নামে একজনের কাছ থেকে তিন ধরনের বোমা তৈরি শিখেছিল তারা। যারমধ্যে ছিল পাইপ বোমা তৈরির প্রক্রিয়াও কীভাবে বোমা ফাটানো যাবে সেই সব শেখানোর পর পাসের হাতে বিস্ফোরক তুলে দিয়েছিল মিঠুন। ওই ক্যাম্প থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই পরনির মুহাম্মদিয়া মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটায় তারা।
- গোয়ায় প্রায় বছর দুয়েক ধরে ভিএইচপি বা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কাছ থেকেও প্রশিক্ষণ নিয়েছিল হিমাংশু পানসে।
- এই সব প্রশিক্ষণ শিবির ছাড়াও আরএসএস, ভিএইচপি ও বজরং দল আরও তিনটি শিবিরের ব্যবস্থা করে। পুনের বাসিন্দা বাণিজ্যবাহী জাহাজের এক অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন শান্তকুমার ভাটের বয়ানে এই তথ্য উঠে এসেছিল। ২০ এপ্রিল ও ১৮ মে ২০০৬ এটিএস-এর কাছে জবানবন্দি দিয়েছিল শান্তকুমার। তার মতে,

ক) ২০০০ এপ্রিল-মার্চে, পুনের সরস্বতী মন্দির স্কুলের পেছনে বজরং দলের অফিস থেকে তার কাছে ফোন আসে। বজরং দলের সারা ভারত শরীরশিক্ষা শাখার প্রধান মিলিন্দ পারান্দে তাকে অনুরোধ করে, সে যদি দলীয় সদস্যদের একটু প্রশিক্ষণ দেয়। মিলিন্দ পুনেতে এই শিবির উপলক্ষ্যেই এসেছিল। শান্ত কুমার কেশর্ট স্টিক বা জিলেটিন স্টিক ব্যবহারের প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। ভাট সেই শিবিরে

গিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে স্বীকার করে। হিমাংশু পানসের নেতৃত্বে কমপক্ষে ও ৪০ থেকে ৫০ জন সদস্য সেই শিবিরে অংশ নিয়েছিল।

খ) মিলিন্দ পারান্দে এরপর নাগপুরের ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলে জাতীয় স্তরের প্রশিক্ষণ শিবিরেও প্রশিক্ষণের জন্য ভাটকে অনুরোধ করেন। সে প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য পারান্দে ও তার তিন শিষ্য ৩০০টি জিলেটিন স্টিক নিয়ে এসেছিল। আরএসএস ও বজরং দলের সেই ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১১৫ জন সদস্য অংশ নিয়েছিল। সে প্রশিক্ষণ শিবিরেও ভাট গিয়েছিল। জিলেটিন স্টিকের ব্যবহার নিয়ে প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। অবশ্য ভাটের এটাও দাবি ছিল, যেভাবে উদ্যোক্তারা সদস্যদের ভুল পথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেটা দেখে সে একটু হতাশই হয়েছিল। সে প্রশিক্ষণ শিবিরে দুজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মী ও একজন প্রাক্তন আইবি কর্তাও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে খবর পাওয়া যায়।

গ) কোলহাপুরের গদাহিংলাজ এলাকায় আরেকটি প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্যও ভাটকে ড়াকা হয়েছিল। সেই শিবিরের মাথা ছিল শঙ্কর বৈদ্য নামে এক ব্যক্তি।

- পানসের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় নকল দাড়ি, নকল গোঁফ, শেরওয়ানি, ইত্যাদি। মুসলিম ছদ্মবেশ ধারণ করতেই এই সব ব্যবহার করা হতো।
- হিমাংশু পানসের বাড়ি থেকে পাওয়া নথি এবং প্রত্যক্ষদর্শী অতুল ভিনোদ কামতিকরের মোবাইল নম্বর ৯৮২২২৯৭৪৯৪-এর কথোপকথন শুনে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জানা যায়, মারুতি বাগ ২০০৬-এর ৫ এপ্রিল কোনো একটা কাজে ঔরঙ্গাবাদ গিয়েছিল। তার জন্য শচীন সুরেশ কদমের দোকান দূত মোটর্সে একটি বাইকও তৈরি রাখা হয়েছিল।
- বাগের পকেট ডাইরি থেকে পাওয়া ম্যাপ থেকে বোঝা যাচ্ছিল হিমাংশু পানসে, মারুতি বাগ, সোনাওয়ানে সহ আরও তিন জন ২০০৪ মে-তে ঔরঙ্গাবাদে মসজিদ পরিদর্শনে গিয়েছিল।
- ষড়যন্ত্রমূলক সেই কাজে হাত ছিল গোবিন্দ নাগাচার্য পুরানিক নামে নান্দেড়ে এক বিএসএনএল কর্মীরও। ২০০০ সাল থেকে আরএসএস প্রশিক্ষণ শিবিরে সে যাতায়াত করে আসছিল, আরএসএস-এর সে সক্রিয় সদস্যও বটে। নান্দেড় বিস্ফোরণের আগে ও পরে অভিযুক্তদের

জিনিসপত্র দেওয়া নেওয়া থেকে শুরু করে টাকা পয়সা দিয়েও সাহায্য করে আসছিল সে। যদিও সে খুব সহজেই আগাম জামিন পেয়ে যায়।

- নান্দেড়ের বাসিন্দা শ্রীকর শিব সম্ভা সোনওয়ালে অভিযুক্তদের বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সে খুব ভালো করেই জানত ২০০৩ সালের নভেম্বরে পারভানি মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল হিমাংশু পানসে এবং মারুতি বাগ। কিন্তু পুলিশের কাছে সেই কথাগুলো প্রকাশ করেনি। সে যদি পুলিশকে সব জানাত তাহলে হয়তো এই চক্রটা পুলিশের হাতে ধরাও পড়তে পারত এবং এতগুলো অপ্রীতিকর ঘটনাও আর ঘটত না।
- আরেক অভিযুক্ত সঞ্জয় চৌধুরি নার্কো পরীক্ষার সময় জানায়, পারভানি বিস্ফোরণের আগে হিমাংশুর কথা মতো পুনে গিয়েছিল সে। গুরুত্বপূর্ণ এক লোকের সঙ্গে দেখা করেছিল সঞ্জয়। ওই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি তার সঙ্গে দেখা করতে পুনে স্টেশনে আসে, তাকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যায় ক্ষত্রিয় লজে। আসল নামেই সঞ্জয় সেই লজে ঘর বুক করে। হিমাংশুর কথা মতো সেখানে দু-তিনদিন থাকে সে। আর এর সমস্ত খরচাপাতি জুগিয়েছিল হিমাংশুই।
- সঞ্জয় আরও জানায়, বজরং দলের বর্ষীয়ান নেতা বালাজি পাখারে সহ আরএসএস-এর মুম্বাইয়ের বেশ কিছু নেতা হিমাংশুকে মাঝেমধ্যেই ডেকে পাঠাতো। মুম্বাই ও পুনের বজরং দল ও আরএসএস এইসব কীর্তিকলাপ চালানোর জন্য হিমাংশুকে টাকা পয়সাও জোগাত।
- সঞ্জয় আরও পুলিশকে জানায়, ঔরঙ্গাবাদের মসজিদে বিস্ফোরণের পরেই ২০০৬-এ সঙ্কটমোচন মন্দিরে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা শুরু হয়ে যায়। হিমাংশু জানায় ওপরতলার কোনো নেতার কাছ থেকে ফোন পাওয়ার পরেই এই হামলা চালাবে সে। ওই সব ওপরওয়ালার নেতাদের আদেশ-উপদেশের জন্য হিমাংশুর আলাদা সিম কার্ড ছিল।
- গ্রেফতারির পর সঞ্জয়ের কাছে বজরং দলের নেতা, নান্দেড়ের বালানি পাখারের ফোন এসেছিল। সঞ্জয়কে সে আশ্বাস দেয়, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, খুব শিগগিরই জামিন হয়ে যাবে তার।
- আরেক অভিযুক্ত রাহুল পাণ্ডে নার্কো পরীক্ষায় জানায়, ওয়ারাদ এলাকার যোগেশ, বারাণসীর মুকেশ ও নান্দেড়ের গোবিন্দ পুরানিক, হিমাংশুকে এই পরিকল্পনায় সাহায্য করেছিল।
- রাহুল আরও জানায়, ভিএইচপি নেতা প্রবীন তোগাড়িয়া তাদের এখানে এসে বক্তব্য রাখে। তোগাড়িয়ার এই যাতায়াতের সব ব্যবস্থা হিমাংশুই করেছিল।

আরও জানা যায়, ডিসেম্বরে যোগীর সঙ্গে গোয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল হিমাংশু। কেপি রঘুবংশী আর তার দলবল বুঝতে পেরেছিল, সন্ত্রাসী সংগঠন আরএসএস, ভিএইচপি ও বজরং দলের বিরুদ্ধে পাহাড় সমান প্রমাণ তথ্য সামনে রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সেই সব তথ্যের পাহাড় পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। অযৌক্তিক কিছু জিনিস সামনে আনা হয়। যেমন,

- ২০০১ সালে আরএসএস-বজরং দলের যে প্রশিক্ষণ শিবিরটি নাগপুরের ভোসলা মিলিটারি স্কুলে হয়েছিল, সেই স্কুল সম্পর্কে কোনো কিছুই খতিয়ে দেখা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই স্কুলটি এখনো চলছে।
- পুনের আকাঙ্ক্ষা রিসোর্টের মালিকানা নিয়ে কোনো খোঁজ খবর হয়নি। সেখানেই ২০০৩ সালে প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। কাদের শিবির, কেনো শিবির, কারাই বা এলো কিছুরই খোঁজ নেওয়া হয়নি।
- মিঠুন চক্রবর্তী কে? আকাঙ্ক্ষা রিসোর্টে এই লোকটি শুধু বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ দিয়েছিল তা নয়, সদস্যদের হাতে বিস্ফোরকও তুলে দিয়েছিল সে। যেভাবে তার আসল পরিচয় গোপন রাখা হয়েছিল, তাতে বোঝাই যায় সে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই ছিল।
- সারা ভারত স্বাস্থ্যশিক্ষা শাখার প্রধান মিলিন্দ পরান্দে ২০০০ সালে পুনেতে সদস্যদের নিয়ে প্রথম প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করে। পরের বছর নাগপুরেও ৩০০ জিলেটিন স্টিক নিয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।
- নাগপুর শিবিরে অংশ নেওয়া মিলিন্দ পারান্দের তিন শিষ্য সম্পর্কে কোনো তদন্ত হয়নি। ২০০০ সালে পারান্দের শিবিরে যে ৪০ কিংবা ৫০ জন অংশ নিয়েছিল, তাদের নামধাম সম্পর্কে কোনো প্রমাণই হাতে আসেনি।
- নাগপুর শিবিরে বজরং দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল যে দুই প্রাক্তন সরকারি কর্মী, তাদের চিহ্নিত করার খুব একটা উদ্যোগ দেখা যায়নি। (পরে মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে হেমন্ত কারকারে তাদের গ্রেফতার করেছিলেন। যদি এই মামলাতেই তাদের গ্রেফতার করা হতো, তাহলে অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত।)
- নাগপুরের সেই শিবিরে যে প্রাক্তন আইবি অফিসার অংশ নিয়েছিল তার পরিচয় গোপন রাখা ছিল। মিঠুন চক্রবর্তীর মতো তারও পরিচয় সামনে আনা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই আইবি-র কাছ থেকে সাহায্য না পেলে এটিএস তাকে ছুঁতেও পারত না। এবং ছুঁতে পারেও নি।

- কোলহাপুরের গদাহিংলাজে যে শিবিরটি হয়েছিল তা নিয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। কে তা অনুষ্ঠিত করে, কে টাকা পয়সা জোগায়, ইত্যাদি জানা যায়নি। অংশগ্রহণকারীদের কেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তাও জানা যায়নি।
- গদাহিংলাজ প্রশিক্ষণ শিবিরের প্রধান ব্যক্তি শঙ্কর বৈদ্যর পুরোনো ইতিহাস ঘেঁটে দেখা হয়নি।
- গোয়াতে মূল চক্রী হিমাংশু পানসে ভালোরকম প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঠিক কোথায় সে প্রশিক্ষণ নিল, কারা দিল, কারা কারাই বা নিল, কেই বা তার আয়োজক, সেই সম্পর্কে বিশদ কোনো তদন্তই হয়নি।
- অভিযুক্ত আরেক প্রত্যক্ষদর্শী অতুল কামকিরের মোবাইল ৯৮২২২৯৭৪৯৪ নম্বরটি থেকে যোগাযোগ রাখা হচ্ছিল। কিন্তু সেই ফোন কল কখন করা হয়েছিল, ঘটনার আগে ও পরে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, সেসব জানা যায়নি।
- এই অতুল বিনোদ কামতিকর অভিযুক্তের সমস্ত পরিকল্পনা জানত। অথচ তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো না।
- ২০০০ সালে থেকে আরএসএস-এর শিবিরে যোগ দিয়ে আসা গোবিন্দ নাগাচার্য্য অভিযুক্তকে বিভিন্ন সাহায্য করার কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তার দিকে হাত বাড়ানোর প্রয়োজন মনে করেনি পুলিশ।
- শ্রীকর শিবসম্ভা সোনওয়ালে ছিল হিমাংসু পানসের সঙ্গী। ওই দলের নেতা। ঔরঙ্গাবাদ মসজিদে বিস্ফোরণের আগে সে সেখানে পরিদর্শনে যায়। পারভানি মসজিদ বিস্ফোরণ ব্যাপারেও সে জানত। কিন্তু একে অভিযুক্ত বলে দাবি করা হয়নি।
- সঞ্জয় চৌধুরিকে নিতে আসা পুনের সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ক্ষত্রিয় লজ, যেটি আবার পরে পারভানি বিস্ফোরণের সময়েও ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই সব নিয়ে কোনো তদন্তই হয়নি।
- নান্দেড়ে বজরং দলের নেতা বালাজী পখারের নির্দেশ পেত হিমাংশু পানসে। সঞ্জয় চৌধুরী পুলিশ হেফাজতে থাকার সময় সে তাকে ফোনও করে। সেই ব্যক্তিকেও অভিযুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ।
- এক অভিযুক্ত রাহুল পাণ্ডে যেরকম দাবি করেছিল, ওয়ারাদের যোগেশ এবং বারানসীর মুকেশের সাহায্য নিয়েই হিমাংশু নানান কাণ্ডকারখানা চালাত। সেই নিয়েও কোনো তদন্ত হয়নি।

- ভিএইচপি নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু এটা জানা যায়নি আদৌ তোগাড়িয়াকে জেরা করা হয়েছিল, নাকি তার বক্তব্যের কোনো সিডি অন্তত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।
- গোয়াতে যে যোগীর সঙ্গে হিমাংশু বেড়াতে গিয়েছিল, সেই যোগীকে চিহ্নিত করার কোনো চেষ্টা হয়নি। বছর দুয়েক ধরে গোয়াতে যে পানসে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, সেই কথা মাথায় রাখলে তো এই ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।
- নরেশ রাজকোন্দরের মোবাইল ফোন থেকে কাকে ফোন করা হয়েছিল বা কারা ফোন করেছিল, সেই সম্পর্কে কোনো তদন্ত হয়নি।
- আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হিমাংশুর সেই আলাদা বিশেষ সিম কার্ড, যেখান থেকে নানান রকম নির্দেশাবলী আসত, সেটি আদৌ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল কিনা জানা নেই। যদি হয়ে থাকে, তাহলে কারা ঘনঘন ফোন করত, বা ফোন থেকে কোথায় ফোন যেত, সেই সব নম্বর যোগাড় করে তো আরও তদন্ত করা দরকার ছিল। (ভেসলা মিলিটারি স্কুল, আকাঙ্খা রিসোর্ট, মিঠুন চক্রবর্তী ও প্রাক্তন আইবি অফিসারের বিষয়টি নিয়ে, মুম্বাই হামলার পরবর্তী সময়ের তদন্ত ও মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

এই সব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তদন্তে কাটছাঁট ও এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি ছাড়াও, এটিএস প্রধান রঘুবংশী আরও ভয়ঙ্কর কাজ করে। মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের আতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখে সে জানায়, ধৃত ২১ জনের মধ্যে সে শুধু সাতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ দিন তিনেক আগে, ২৯ জুলাই, ২০০৬ নান্দেড়ের কালেক্টরের কাছ থেকে সবার বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। পরে ১১ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয় ১৬৯ সিআরপিসি ধারা অনুযায়ী। বলা হয়, তাদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই। এটা বেশ অবাক করার মতোন ঘটনা। কারণ সপ্তাহ তিনেক আগেই কালেক্টরের কাছ থেকে এটিএস অনুমতি চায়। তাতে বলা হয় তাদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, তার ভিত্তিতে অস্ত্র আইন, ও বিস্ফোরক আইনে চার্জশিট রুজু করতে চাইছে তারা। সাধারণের ধারণা মতো এটিএস-এর এই মত বদল যে কোনোরকম রাজনৈতিক চাপে, তা মোটেই নয়। অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই বিজেপির মূল সংগঠন সঙ্ঘ পরিবারের সদস্য। এই বিজেপি-ই সেই সময় কেন্দ্র ও রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল। তাহলে মত পরিবর্তন কেনো? এর

একটাই যুক্তিগ্রহ্য ব্যাখ্যা, এরা প্রত্যেকেই কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী, আর ব্রাহ্মণ্যবাদী আইবি, রঘুবংশীকে চাপ দিয়ে তাদের বেকসুর প্রমাণে বাধ্য করে।

উটের পিঠে যে খড় বলে একটা কথা আছে, রঘুবংশীর কাজকর্ম অনেকটা সেরকমই। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ ও মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে এটিএস ও পুলিশের এই একপেশে তদন্ত নিয়ে বিস্তর হইচই শুরু হয়েছিল, অগত্যা মামলা সিবিআই-এর হাতে নিতে বাধ্য হয় সরকার। তখন সিবিআই-এর অন্তত ধর্ম বা সম্প্রদায় নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তারা গভীরে গিয়ে ষড়যন্ত্রের শিকড়ে পৌঁছে যেতে পারত। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি-র মাথাব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার সংস্থা নয় আইবি। সিবিআই-তে যেহেতু সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুপ্রবেশের কোনো জায়গা ছিল না, কিন্তু ব্যক্তি ধরে ধরে মাথা খাওয়ার জায়গাটা অসম্ভব মোটেই নয়। পরে দেখা গেছে আইবি, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে তাদের লোকদের ধরে সিবিআই-এর মধ্যে নিজেদের পছন্দের লোক দিয়ে একটা দল তৈরি করে ফেলে। কিছু কিছু শব্দ এইসব কাজে তারা ব্যবহার করে, যেমন সিক্রেট অপারেশন, কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অপারেশন, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ইত্যাদি।

আইবি সিবিআই-এর মধ্যে নিজেদের যে টিম তৈরি করেছিল, তা ভাবনার থেকেও বেশি কাজে দিয়েছিল। আইবি যা আশা করেছিল সিবিআই তার থেকেও একধাপ এগিয়ে গেলে আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সহ সবাইকেই প্রায় চমকে দিল। সিবিআই মামলার গুরুত্ব অনেকটা লঘু করে দিল। বিভিন্ন তথ্য সরিয়ে ফেলল। নানান তত্ত্ব আমদানি করল।

- সিবিআই এই মামলাকে বজরং দল আর সঙ্ঘ পরিবারের বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনেই করল না। এমনকি, নান্দেড়ের সঙ্গে পারভানি, জালনা ও পূর্ণা বিস্ফোরণ মামলাকেও তারা যুক্ত করল না। অথচ তার আগেই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে, একই জঙ্গি গোষ্ঠী প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। এখানেই শেষ নয়, তারা আলাদা চার্জশিট দাখিল করল। আর তাতে ষড়যন্ত্রের ১২০বি ধারা ও ইউএপিএ ধারাটি উড়িয়ে দেওয়া হলো। অথচ এটিএস-ই এই দুটি ধারা সংযোজন করে।
- অভিযুক্তদের সঙ্গে আরএসএস-বজরং দল-ভিএইচপি যোগাযোগের বিষয়টি বেশ সচেতন ভাবেই এড়িয়ে গেল সিবিআই।
- যার বাড়িতে বিস্ফোরণ, যার বাড়ি থেকে একগাদা তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার হলো, সেই লক্ষণ রাজকোন্দরকেই অভিযুক্তের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো। অথচ আগের চার্জশিটে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

- আকাঙ্ক্ষা রিসোর্ট ও ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলে অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল বজরং দলের সদস্যরা। ওই সব বিষয় নিয়ে কোনোরকম তদন্ত হলো না।
- দেশের আর কোনো জায়গায় এইরকম শিবির চলেছিল কিনা, বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তার কোনো তদন্ত হলো না।
- এটিএস-এর মতো সিবিআই-ও মিঠুন চক্রবর্তী সম্পর্কে কোনো তথ্য তালাশ সচেতন ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল। খোঁজ নেওয়া হয়নি সেনা আধিকারিক, প্রাক্তন আইবি আধিকারিক সম্পর্কেও। অথচ এরাই অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

এমনকি আকাঙ্ক্ষা রিসোর্ট প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল হোতা রাকেশ ধাওয়াড়েকে গ্রেফতার করেনি সিবিআই। অথচ পরে হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে ২০০৮ সালের মালেগাঁও বিস্ফোরণে এটিএস তাকে গ্রেফতার করেছিল। সম্ভবত মিঠুন চক্রবর্তীর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তার গায়ে হাত পড়েনি। এছাড়াও এটিএস-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর রাকেশ জালনা পুলিশকে দুজন অধ্যাপকের কথা জানায়। ওই দুই অধ্যাপক ড. শরদ কুন্তে এবং অধ্যাপক ড. দেও, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিয়েছিল। সেই দুই ব্যক্তিকে নিয়েও কোনো তদন্ত করেনি সিবিআই। www.indiatoaday.in-এ (৩ জানুয়ারি ২০০৯) কৃষ্ণকুমারের বক্তব্য অনুযায়ী, মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তের মধ্যে দিয়ে, নান্দেড় বিস্ফোরণে সিবিআই-এর ঢিলেঢালা তদন্তের চেহারা বেরিয়ে পড়ছে। মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত রাকেশ ধাওয়াড়ে জালনা পুলিশকে জানিয়েছিল, পুনের দুজন রসায়নের শিক্ষক (কুন্তেও দেও) হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সন্দেহভাজনদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। কিন্তু সিবিআই সেইসব ছুঁয়েও দেখল না।

একটা বিষয় প্রত্যেককেরই বোঝা উচিত, ওপরের বিভিন্ন তথ্য এড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব আমদানির বিষয়টি আদৌ কোনো রাজনৈতিক চাপের জেরে হয়নি। কারণ কেন্দ্রে হোক বা রাজ্যে তখন ছিল কংগ্রেস সরকার। প্রধান বিরোধী দল বিজেপির মূল শাখা সদ্য পরিবারের সদস্যদের আড়াল করে কংগ্রেসের অন্তত কোনো ফায়দা হতো না। আসলে সিবিআই-এর যে টিম তৈরি করা হয়েছিল, তা আইবি-র লোকেরাই ঠিক করিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি-র আঙুলি হেলনেই তারা কাজ করে গিয়েছিল।

যদিও একজন অফিসার, যিনি আইবি-র কাছে নিজের মাথা বিকিয়ে দেননি, তাদের পাত্তাই দেননি। এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে, যিনি মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত করেছিলেন, কেপি রঘুবংশীর জায়গায় ২০০৮-এর

জানুয়ারিতে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তার সন্দেহ হয়েছিল, ২০০৬-এর নান্দেড় বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে বিস্তর ফাঁকফোকর রয়েছে। নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সিবিআই এড়িয়ে গিয়েছিল যেমন, অভিযুক্তদের জবানবন্দি, অভিযুক্তের বাড়ি থেকে পাওয়া মুসলমানি টুপি, নকল দাড়ি, নরেশ রাজকোন্দর ও হিমাংশু পানসের মোবাইল থেকে করা ফোন, এইসব। নান্দেড় মামলার ঘটনা নিয়ে ২০০৮-এর ২৫ ডিসেম্বরে সিবিআই সদর দফতরে তার টিমকে পাঠান কারকারে। মিঠুন চক্রবর্তী ও প্রাক্তন আইবি আধিকারিককে নিয়ে সেই তদন্তও শুরু করে দেন তিনি। কিন্তু তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই ২৬/১১ মুম্বাই হামলায় দুর্ভাগ্যজনক ভাবে খুন করা হয় কারকারেকে।

৫. মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ড (২০০৮)

(মুম্বাই বিস্ফোরণকাণ্ডের আগের তদন্ত)

সঠিক ও সৎ তদন্ত, প্রথমবারের জন্য রাস্তা দেখালেন হেমন্ত কারকারে

২০০৮ এর ২৯ সেপ্টেম্বরে মালেগাঁও-এর জনবহুল ভিকু চকে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৬ জনের, আহত হন ১০০-রও বেশি। যথারীতি এই মর্মান্তিক বিস্ফোরণের আগুন থিতিয়ে যাওয়ার আগেই শুরু হয়ে যায় দোষারোপের পালা। কখনো আঙুল ওঠানো হয় সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর দিকে, আবার কখনো বা অন্যান্য তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোর দিকে। ২০০৬-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনার মতো ফের পুলিশি ধরপাকড়ের বিষয়টি নিয়ে মালেগাঁও এর মুসলিমরা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। সেবার কোনো প্রমাণ ছাড়াই অনেকদিন ধরে নির্বিচারে মুসলিম ছেলেদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য শুধু মালেগাঁও কেনো গোটা দেশেই এই পরিস্থিতি ছিল। এ ঘটনার পরেই মালেগাঁওতে আসেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আর পাতিল ও অন্যান্য মন্ত্রীরা। মালেগাঁও-এর শিশু মহিলা সহ সবাই সেবার রাস্তায় নেমে আসেন। তাদের হাতে হেনস্থা হতে হয় নেতা মন্ত্রীদের। পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে ওঠে শ্লোগান।

কিন্তু পরিস্থিতি যে বদলে গেছে, তা কেউ ভাবতেই পারেনি। এর পেছনে থাকা লোকজন, তাদের নেতারা কিংবা মুসলিম সম্প্রদায়ও আশা করতে পারেনি, যে এই ঘটনা এবার আইবি বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের লেখা গল্পের মতো করে চলবে না। তাদের তৈরি করা গল্পে তার বিচারও হবে না। কোনো ভাবেই এই মামলাকে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না কারণ তদন্তের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে। সৎ, কর্মনিষ্ঠ একজন পুলিশ অফিসার। কারকারেকে কারোর আঙুলে নাচানো বা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখানো কিংবা লোভ দেখিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া একরকম অসম্ভবই ছিল।

হেমন্ত কারকারের মতো একজন কর্মনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার জানতেন, এই ঘটনা অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই ঘটনার তদন্ত অনেকটা মাকড়সার জাল বোনার মতো। যেখানে তদন্তকারী সংস্থা ছিল মাকড়সা, আর তার বোনা জালগুলো হলো তদন্তে উঠে আসা এক একটি তথ্য। আর পুরো বোনা জালটি হলো চার্জশিট। আর সেই জালে পোকামাকড়ের মতো যে ধরা পড়বে, সেই হলো অভিযুক্ত। তিনি ঠিক কী করেছেন বা করতে চলেছেন, সে সম্পর্কে কারকারে ভালো মতনই সব জানতেন, দূরদৃষ্টি আর সাহস, এই দুটোতে ভর করে তদন্তে নেমে পড়লেন

অফিসার। বাইরের কোনো চাপ, কোনো হইচই-এ কান না দিয়ে তিনি তদন্ত শুরু করে দিলেন। শুরু করলেন, সেখান থেকে যেখান থেকে একজন দায়িত্ববান অফিসারের তদন্ত শুরু করা উচিৎ মাকড়সার জালের একদম মধ্যিখানের জায়গা যেরকম, সেরকম এই তদন্তের মাঝখানটি হলো বিস্ফোরণস্থল। এলএমএল ফ্রিডম মোটরসাইকেল, বেয়ারিং নং এমএইচ-১৫-৪৫৭২। এরমধ্যেই রাখা ছিল আইইডি, বিস্ফোরণ যে আইইডি-তেই ঘটানো হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের এতটাও বোকা ভাবার কারণ নেই যে তারা গাড়ির আসল নম্বর প্লেট বা আসল সরঞ্জাম ব্যবহার করবে। তারা অন্য গাড়ির যন্ত্রাংশ এই গাড়িতে লাগিয়ে দেয়, নম্বর প্লেট পাল্টায়। তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতে চ্যাসিস ও ইঞ্জিন নম্বরও পাল্টে দেওয়া হয়। কিন্তু ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও ডিলারদের নথিপত্রের সাহায্যে পৌঁছে যায় সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং চন্দ্রপ্রতাপসিং ঠাকুরের (৩৮) কাছে। সাধ্বীর আদি বাড়ি মধ্যপ্রদেশে হলেও গুজরাটের সুরাটে সে থাকে। তদন্তে মেলে, সাধ্বী প্রায় এক দশক আগে এবিভিপি-র সক্রিয় সদস্য ছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা শাখা দূর্গা বাহিনীর কার্যনির্বাহী সচিব ছিল। ওই বাইকটি আসলে তারই ছিল। কিন্তু খাতায় কলমে প্রমাণ রাখার জন্য দেখানো হয়েছিল, আসলে ওই বাইক আগেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। আরও জানা যায়, সাধ্বীর বাইকটি যে বিক্রি করেছিল, সেই মনোজ শর্মা ওরফে যোশী একজন আরএসএস মেম্বার ছিল। ২০০৩-এর ফেব্রুয়ারিতে মধ্যপ্রদেশের মহও এলাকায় জোড়া খুনের মামলাও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তার প্রতিপক্ষই তাকে গুলি করে মেরেছিল। মুম্বাই টাইমস অব ইন্ডিয়ার (২৯ অক্টোবর ২০০৮) রিপোর্ট অনুযায়ী, এই মনোজ শর্মা ছিলেন সাধ্বীর বেশ ঘনিষ্ঠ।

প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুরকে প্রাথমিক জেরা করে পুলিশ আরও দুই ব্যক্তির সন্ধান পায়। শ্যামলাল সাহু ও শিবনারায় কালাং সারাসিং। এরা দুজনেই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। এদের মধ্যে সাহু বিজেপি-র সদস্য। এরাই সাধ্বীকে এই কাজে সাহায্য করেছিল। ২৩ অক্টোবর ২০০৮-এ এই তিনজনকেই পুলিশ আটক করে এবং পুলিশ হেফাজত হয় এদের। বিশদ তদন্ত চলে। তদন্তে উঠে আসা প্রত্যেকটা তথ্য ও প্রমাণ নিয়ে পুরোটাই খুব বিচক্ষণ ভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে দেখেন হেমন্ত কারকারের এটিএস। ধীরে ধীরে গোটা পরিকল্পনাটা আপনা আপনিই ফাঁস হতে থাকে।

মালেগাঁও-এর তদন্ত চলাকালীন কিছু সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পড়লে জানা যাবে, কতটা কর্মনিষ্ঠ, বিচক্ষণ, ধারাবাহিক ও নিরপেক্ষ ভাবে কারকারে তার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার তদন্তে কোনো ফাঁক ছিল না। সম্পূর্ণ সৎ, সোজাসাপটা এবং স্বচ্ছ। তদন্তের ধারায় কোনো পিছুটান বা প্রভাব, ঘুরপাঁচ বা

অনবরত পাল্টে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না। মামলাটি ছিল পরিষ্কার জলের মতো, যার গোটাটাই তথ্য ও প্রমাণ এর উপর নির্ভরশীল। একটি ঘটনার জট খুলে দিতে পারলেই আরও ঘটনার জট ছাড়ানো অসম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত তদন্তে উঠে এলো এই ঘটনা, এক নারকীয় ও দেশ বিরোধী চক্রান্ত।

বিভিন্ন ম্যাগাজিন আর কাগজ একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত এই মামলাটির কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো—

১. রমেশ উপাধ্যায় নামের এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা প্রধানকে পুলিশ পুনে থেকে গ্রেপ্তার করে। এক সময় সে আরএসএস-এর প্রাক্তন সেবা সেলের সদস্য ছিল। পুলিশের সন্দেহ এই রমেশ উপাধ্যায়ই আরডিএক্স সরবরাহ করেছিল। (*পুনে মিরর*, ২৮ নভেম্বর ২০০৮)।

২. সমীর কুলকানি নামে একজনকে পুলিশ ভোপাল থেকে গ্রেপ্তার করে। তার আসল বাড়ি মহারাষ্ট্রে। পুলিশের অনুমান বোমা তৈরির রাসায়নিকের জোগান দিয়েছিল সে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৯ অক্টোবর ২০০৮)।

৩. নাসিকের ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলের প্রাক্তন কমান্ডার, মেজর প্রভাকর কুলকার্নিকে পুলিশ আগে থেকেই সন্দেহের তালিকায় রেখছিল। পুলিশের সন্দেহ ছিল, ২০০১ সালে স্কুল চত্বরে এই প্রভাকরই, মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১ নভেম্বর ২০০৮)

৪. নাসিকের ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলের কমান্ডান্ট, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল শৈলেশ রাইকরকে পুলিশ জেরা করে। পুলিশের সন্দেহ ছিল বিস্ফোরণের ১৫ দিন আগে মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের একটি বৈঠক হয়। তাতে উপস্থিত ছিল শৈলেশ। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ২ নভেম্বর ২০০৮)।

৫. পুনে থেকে অজয় রাহিরকার ও রাকেশ ধাওয়াড়েকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই গোষ্ঠীর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারটা দেখত রাহিরকর। আর রাকেশ ছিল অস্ত্রশস্ত্র জোগাড়ের দায়িত্বে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৪ নভেম্বর, ২০০৮)

৬. অস্ত্র জোগাড় করার অভিযোগে ডোম্বিভালি থেকে চিন্তামণি মাত্রে নামে একজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৪ নভেম্বর, ২০০৮)

৭. নান্দেড় ও পারভানি বিস্ফোরণে অস্ত্র বিশেষজ্ঞ রাকেশ ধাওয়াড়ে জড়িত ছিল বলে দাবি এটিএস-এর (*সকাল*, পুনে, ১১ নভেম্বর, ২০০৮)। (ধাওয়াড়ে পরে পারভানি ও জালনা বিস্ফোরণকাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিল, যদিও নান্দেড় মামলায় তার কিছু হয়নি।)

৮. সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের ব্রেন ম্যাপিং পরীক্ষা হয়েছিল। তাতে বেশ কিছু সত্যি কথা উগরে দিয়েছিল সে। এর আগেও তার নার্কো পরীক্ষা হয় (*দ্য সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ২ নভেম্বর, ২০০৮)

৯. মালেগাঁও বিস্ফোরণে চক্রী হিসেবে ২০০৮, ৪ নভেম্বর গ্রেফতার হয় লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিত। অভিনব ভারতের প্রাক্তন মেজর রমেশ উপাধ্যায়কে বেশ কিছু এসএমএস পাঠিয়েছিল সে। তার সূত্র ধরেই পুরোহিত নজরের খাতায় আসে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৭ নভেম্বর, ২০০৮)

১০. দক্ষিণপন্থী হিন্দু সংগঠন অভিনব ভারতের সহ প্রতিষ্ঠাতা ছিল পুরোহিত! সে পরে স্বীকার করে, ঘটনার মূল চক্রী সে-ই। বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আরডিএক্স-ও সেই জোগাড় করে। এটিএস-এর সন্দেহ বিস্ফোরকের ব্যবহার নিয়ে যুবকদের প্রশিক্ষণেও হাত ছিল পুরোহিতের। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৭ নভেম্বর, ২০০৮)

১১. ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলের কমান্ডান্ট অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এস এস রাইকরের সঙ্গে পুরোহিতের যোগ নিয়ে নিশ্চিত হয় এটিএস। পুলিশের সন্দেহ, অভিনব ভারতের জন্য অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতে সাহায্য করেছিল রাইকর।

১২. শুরুর দিকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পুরোহিতের কাজকর্ম নিয়ে খুশি ছিল না ভিএইচপি নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া। তার আশঙ্কা ছিল এই অভিনব ভারত হিন্দুত্ব শক্তিকে হয়তো ভাগ করে দেবে। এই নিয়ে এপ্রিল ২০০৮ সালে তোগাড়িয়া পুরোহিতের সঙ্গে মুম্বাইয়ের একটি হোটেলে আলোচনাও করে। কিন্তু অভিনব ভারতকে গুটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পুরোহিত তাতে সায় দেয়নি। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ১৯ নভেম্বর, ২০০৮)

১৩. নান্দো বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে জানা যায়, ২০০৩ সালে পুনেতে যে ৫৮ জন যুবক অপ্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তাদের নামধাম রাখা ছিল রোহিতের একটি ল্যাপটপে। যদিও মধ্যপ্রদেশের পামধীতে পুরোহিতের বাড়ি থেকেই সেই ল্যাপটপ খোয়া যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। অথচ এই ষড়যন্ত্রের জন্য সেই ল্যাপটপ দারুণ রকম কাজে আসতে পারত।

(*সকাল*, পুনে, ৮ এবং ৯ নভেম্বর ২০০৮, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ৯ নভেম্বর, ২০০৮)

১৪. ২০০৮, ৯ নভেম্বর বেঙ্গালুরুর ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পুরোহিতের নার্কো পরীক্ষা করা হয়। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে ১১ নভেম্বর, ২০০৮)

১৫. বন্দুক ও নকল ভারতীয় সেনার আইডি কার্ড বানানোর অভিযোগে মুম্বাইয়ের মাতঙ্গা থানার পুলিশ, উত্তরপ্রদেশের সুধাকর চতুর্বেদী নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। পরে জানা যায় ওই ব্যক্তি অভিনব ভারতের কোঅর্ডিনেটর ছিল। পরে নার্কো পরীক্ষায় সে স্বীকার করে, সেও মালেগাঁও বিস্ফোরণে অংশ নিয়েছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১২ নভেম্বর, ২০০৮)

১৬. ভোসল মিলিটারি স্কুলের কমান্ডান্ট এস এস রাইকর তদন্তকারীদের জানায়, নাসিক ক্যাম্পাসের এই স্কুলে অভিনব ভারতের সদস্যদের একটি বৈঠক হয়েছিল। বিস্ফোরণের দুসপ্তাহ আগে, ১৫ সেপ্টেম্বর এই বৈঠক হয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৩ নভেম্বর, ২০০৮)

১৭. পুরোহিতের ল্যাপটপটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা গিয়েছিল। মালেগাঁও চক্রান্তের তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তাতে রয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। অভিনব ভারতের বেশ কিছু সদস্যের কথা যেমন রয়েছে, তেমনই পুনের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়া যুবকদের সম্পর্কেও তথ্য ওই ল্যাপটপ থেকে মিলবে বলে আশা পুলিশের। (*পুধারি*, পুনে, ১৪ নভেম্বর, ২০০৮)

১৮. একজন আইপিএস অফিসার জানান, মালেগাঁও বিস্ফোরণে যে অভিযুক্ত, তার সঙ্গে যোগ রয়েছে নান্দেড়, আজমির ও সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের ঘটনার। তদন্তে অন্তত সেটাই উঠে আসছে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১২ নভেম্বর, ২০০৮)

১৯. পুরোহিত নার্কো পরীক্ষায় স্বীকার করে আজমির ও মালেগাঁও-এর ঘটনায় সে বিস্ফোরকের জোগান দিয়েছিল। মহন্ত দয়ানন্দ পাণ্ডের নির্দেশ মতোই সব কাজ হয়। (*সকাল*, পুনে এবং *পুধারি*, পুনে, ১৫ নভেম্বর, ২০০৮)

২০. সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণেও পুরোহিতের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের। পুরোহিত ও প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে জেরা করতে পুনেতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে হরিয়ানা পুলিশের। সেবার ইন্দোরে তদন্ত প্রায় মরে গিয়েছিল। হরিয়ানা পুলিশ সেই ইন্দোর থেকেই নতুন উদ্যোগে

তদন্ত শুরু করতে চায়। সমঝোতা এক্সপ্রেসে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল, তা ইন্দোরেই তৈরি করানো হয়েছিল (*সকাল*, পুনে, ১৩ ও ১৪ নভেম্বর ২০০৮, *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৪ নভেম্বর, ২০০৮)

২১. নার্কো পরীক্ষা চলাকালীন পুরোহিত পুলিশকে বলে, সমঝোতা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী প্রবীন তোগাড়িয়া। তোগাড়িয়াই নাকি পুরোহিতকে বলে, ড. দেব বলে একজনের সঙ্গে কথা বলতে বিস্ফোরণের পর কত আরডিএক্স বাকি রয়েছে, সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে। (*পুনে মিরর*, ১৯ নভেম্বর, ২০০৮)

২২. কানপুরে জম্মু সারদা পীঠের মহন্ত স্বামী দয়ানন্দ পাণ্ডেকে গ্রেফতার করে এটিএস। মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। (*সকাল*, পুনে, ১৩ নভেম্বর ২০০৮)

২৩. ২০০৮-এর ১২ এপ্রিল পুরোহিত, পাণ্ডে আর সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং বৈঠক করে। সাধ্বীকে বিস্ফোরণের জন্য আরডিএক্স জোগাড় করতে বলে দয়ানন্দ। ফরিদাবাদ আর পুনেতেও বৈঠক হয়েছিল। (*পুধারি*, পুনে, ১৬ নভেম্বর, ২০০৮)

২৪. এটিএস প্রধান কারকারে জানান, পাণ্ডে ও অন্যান্য অভিযুক্তরা ভোঁসলা মিলিটারি স্কুল, নাসিকের দেওলাদি ক্যাম্প, ইন্দোর ও জম্মু-কাশ্মীরে বৈঠক করে। পাণ্ডে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে জড়িত। (*পুনে মিরর*, ১৫ নভেম্বর, ২০০৮)

২৫. কাশ্মীরের ৪২ রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে পোস্টিং ছিল কর্ণেল পুরোহিতের। পাণ্ডে তার সঙ্গে ভালোরকম যোগাযোগ রেখে চলেছিল। মালেগাঁও বিস্ফোরণে যে আরডিএক্স ব্যবহার করা হয়েছিল, সম্ভবত তা কাশ্মীর থেকেই পাচার হয়ে আসে। (*পুনে মিরর*, ১৫ নভেম্বর, ২০০৮)

২৬. সরকারি আইনজীবী নাসিক আদালতে বলেন, সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ডে যে আরডিএক্স ব্যবহৃত হয়েছিল, তার জোগান দিয়েছিল পুরোহিত। নাসিকের দেওলালি ক্যাম্পে যখন তার পোস্টিং হয়, তখন সে এই কাজটি করে। (*সকাল*, পুনে, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৬ নভেম্বর ২০০৮)

২৭. সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণকাণ্ডে আরডিএক্স ব্যবহার নিয়ে মত বদলেছিল এটিএস। এবং অবশ্যই তা চাপের মধ্যে পড়ে। কারণ আইবি কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করছিল। যেহেতু সরকারি কৌশুলি আদালতে জানিয়ে দিয়েছিল, যে সমঝোতার ঘটনায় পাকিস্তানের

আইএসআই-এর হাত রয়েছে, তাই এখন আরডিএক্স-এর অন্য তত্ত্বটি চাপে পরে গেছে। আর তাছাড়া এই আইএসআই-এর তত্ত্ব, আইবি-ই কেন্দ্রকে গিলিয়েছিল। এক আইবি-র আধিকারিকের কথায়, বিস্ফোরণস্থল থেকে পাওয়া নমুনা আর দুটি অবিস্ফোরিত বোমার ফরেন্সিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মোটেই আরডিএক্স ব্যবহার হয়নি। কিন্তু এটিএস উল্টোকথা বলে চলেছে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৮ নভেম্বর ২০০৮)

২৮. অথচ ওই একই দিনে, সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের ঘটনা যাঁর এলাকার মধ্যে পড়ছে সেই রেলওয়ে এসপি ভারতী অরোরা পরিষ্কার করে দেন, বিস্ফোরণে আরডিএক্স ব্যবহার করা হয়েছিল। ফরেন্সিক সায়েন্স টেস্ট ল্যাবরেটরি তা নিশ্চিত করেছে। (*সকাল টাইমস*, পুনে, ১৮ নভেম্বর ২০০৮)

২৯. এদিকে সিবিআই ডিরেক্টর আবার বলেছিলেন, বছর দুয়েক আগে নান্দেড় বিস্ফোরণের সঙ্গে মালেগাঁও বিস্ফোরণের একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৪ নভেম্বর, ২০০৮)

৩০. সমঝোতা এক্সপ্রেস, মক্কা মসজিদ ও আজমির দরগা শরীফের ক্ষেত্রে সুটকেস লকের মধ্যে রাখা একই রকম টাইমার ডিভাইসে বোমাগুলো তৈরি হয়েছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৮ নভেম্বর, ২০০৮)

৩১. পুরোহিত আরও জানায়, স্বামী অসীমানন্দ সুনীল যোশী সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তাকে দেয়। এই যোশীই সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের বাইকটি বিক্রি করেছিল ২০০৭, ১১ অক্টোবর আজমির শরীফ বিস্ফোরণকাণ্ডে সেও জড়িত ছিল (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ২৪ নভেম্বর, ২০০৮)

৩২. পুরোহিত দাবি করে সে ২০০৮-এর ৫ অক্টোবর প্রজ্ঞা সিং-এর সঙ্গে দেখা করে। তাকে জানায় যে তাদের লোক ওড়িশাতে খুনখারাবি চালিয়েছে। দুটো চার্চেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। মালেগাঁও বিস্ফোরণও তাদের লোকই করিয়েছে বলে প্রজ্ঞাকে খবর দেয় পুরোহিত। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ২৪ নভেম্বর, ২০০৮)

৩৩. মালেগাও বিস্ফোরণকাণ্ডে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে MCOCA-এ অভিযোগ দায়ের। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২১ নভেম্বর ২০০৮)

৩৪. নাসিকের MCOCA-আদালত মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তের হেফাজত নামঞ্জুর করে। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৫ নভেম্বর ২০০৮)

৩৫. পুলিশ জানায়, রাকেশ ধাওয়াড়ে ও অন্যান্য অভিযুক্তরা মালেগাঁও বিস্ফোরণের জন্য ১০ লক্ষ টাকা তোলে। এছাড়াও হাওয়ালার মাধ্যমে লেনদেন হওয়া আরও ২০ লক্ষ টাকার বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৪ নভেম্বর ২০০৮)

৩৬. পুরোহিত সিবিআই-কে জানায়, সে (মালেগাঁও বিস্ফোরণের) মাস দুয়েক আগে চারটি অস্ত্র কিনতে ধাওয়াড়েকে ৩.২ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ২৪ নভেম্বর, ২০০৮)

৩৭. এটাও বেরিয়ে পড়ে যে অজয় রাহিরকার পুরোহিতকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিল। এছাড়াও নাসিকের এক বিল্ডারকে সে আড়াই লক্ষ টাকাও দিয়েছিল। মোটা অঙ্কের টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে লেনদেন হয়েছিল, আর এর মূল মাথা ছিল পুরোহিত। (*পুধারি,* পুনে, ১৬ নভেম্বর, ২০০৮)

৩৮. বিস্ফোরণ ঘটাতে যে টাকা এসেছিল, তার উৎসটি ঠিক কোথায়, তা জানার জন্য গুজরাটের বেশ কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নিয়ে খোঁজখবর করে এটিএস। এটিএস মনে করত গুজরাট থেকেই মূলত এই টাকা এসেছে। (*পুনে মিরর,* ১৮ নভেম্বর, ২০০৮)

৩৯. প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা নেওয়া করতে পাণ্ডের হাইপ্রোফাইল যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে থাকতে পারে পুরোহিত। (*পুনে মিরর,* ১৮ নভেম্বর, ২০০৮)

৪০. হিন্দু সংগঠন 'অভিনব ভারতে' টাকা ঢেলেছিল এরকম পুনের বেশ কিছু শিল্পপতিকে নিয়ে তদন্ত করছিল এটিএস। এটিএস-এর এক আধিকারিক জানান, পুনের শ্যাম আপ্তে নামে এক ব্যক্তি এই অনুদান আদায়ের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করে। সেই শিল্পপতিদের কাছে টাকা দেওয়ার বিষয়টি বলে থাকে। (*হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই, ২৬ নভেম্বর, ২০০৮)

৪১. পুনের দুজন ইতিহাসবিদের ওপর নজর ছিল এটিএস-এর (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৮ নভেম্বর ২০০৮)। এদের মধ্যে একজনের নাম নিনাদ বেড়েকর (*পুধারি,* সোলাপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

৪২. নান্দেড় বিস্ফোরণের পর ২০০৬ সালে পুনের বাসিন্দা সনৎকুমার ভাটে পুলিশের কাছে জানায়, সম্ভবত অবসরপ্রাপ্ত এক আইবি অফিসারের সঙ্গে চরমপন্থী হিন্দু সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে।

৪৩. পরে প্রকাশ হয় প্রজ্ঞা সিং-এর সঙ্গে সাবরি ধান আশ্রমের মহন্ত ও দঙ্গসের (গুজরাট) ভিএইচপি নেতা অসীমানন্দ স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

যোগাযোগ রয়েছে। প্রজ্ঞা সিং ও পুরোহিত মাঝেমধ্যেই তার সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা চালাত। মালেগাঁও বিস্ফোরণের পর পরই তাদের মধ্যে কথা হয়। স্বামী নিজের ড্রাইভার সুনীল দাহাড়ের সিমকার্ড ব্যবহার করে এই সব কথাবার্তা চালাত। পুলিশ দাহাড়ে সহ আশ্রমের আরেক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনার পর পরই পলাতক হয়ে যায় অসীমানন্দ স্বামী। (*সকাল,* পুনে, ১০ ও ১১ নভেম্বর ২০০৮)

৪৪. এটিএস এর সূত্র আবার গুজরাটের তিনজন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাকে নিয়ে খোঁজখবর চালায়। এদের সঙ্গে অভিযুক্ত ও ধৃত সমীর কুলকানির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এই কুলকানি অভিনব ভারতের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৯ নভেম্বর ২০০৮)

৪৫. ষড়যন্ত্রে গোরক্ষপুরের (উত্তরপ্রদেশ) বিজেপি সাংসদ যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপি বিধায়ক দাস আগরওয়ালও সামিল ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। (*সকাল,* পুনে, ১৩ নভেম্বর ২০০৮)

৪৬. পুরোহিত সিবিআই-কে জানিয়েছিল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রবীন তোগাড়িয়া অভিনব ভারত তৈরিতে সাহায্য করেছিল। তাতে আর্থিক সাহায্যও দিয়েছিল।

- নাসিকে স্থানীয় এক ভিএইচপি নেতা ভিনায়কের বাড়িতে ২০০৬, ফেব্রুয়ারিতে তোগাড়িয়ার সঙ্গে প্রথম দেখা করে পুরোহিত।
- ওই বছরেই ডিসেম্বরে তোগাড়িয়ার সঙ্গে পুরোহিত আবার মুম্বাইতে দেখা করে। মুম্বাইয়ের বিস্ফোরণের বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করে সে।
- ২০০৭ মার্চ-এপ্রিল নাগাদ তোগাড়িয়া তাকে ২ লক্ষ টাকা দেয়। পরে তা অভিনব ভারতের সমীর কুলকানির হাতে যায়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ২৪ নভেম্বর ২০০৮)

৪৭. নান্দেড় বিস্ফোরণে যে আরএসএস সদস্য মারা গিয়েছিল, ধাওয়াড়ে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে সিবিআই-কে জানিয়েছিল পুরোহিত। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ২৪ নভেম্বর ২০০৮)

৪৮. এটিএস আদালতে জানায়, দুজন হাই প্রোফাইল অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে হিন্দুপন্থী সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে। (*সকাল,* পুনে, ১১ নভেম্বর ২০০৮, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১২ নভেম্বর ২০০৮)

৪৯. দিল্লির একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার ২৬-এ জানুয়ারির দিন ফরিদাবাদে দয়ানন্দ পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করে। সেখানেই মালেগাঁও বিস্ফোরণের ছক কষা হয়েছিল। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৩ নভেম্বর ২০০৮)

৫০. পুনের আরও তিন ব্যক্তিকে জেরা করতে পারে এটিএস, হিমানি সাভারকর, অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল জয়ন্ত চিটালে ও প্রাক্তন বিজেপি কর্পোরেটর মিলিন্দ একবোটে। এ ছাড়াও একজন খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ও সেনার এক পদস্থ অফিসারও নজরে রয়েছে। (*সানডে হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই, ২৩ নভেম্বর ২০০৮)

৫১. ২০০১-এ নাগপুরে ভোঁসলা মিলিটারি স্কুলে যে ৫৪ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তাদের নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে এটিএস। অনুমান, নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ড ও মালেগাঁও-এর দুটি বিস্ফোরণের ঘটনায় এদের কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে।

৫২. বজরং দলের যে সদস্যরা নাগপুরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তারা ২০০৩ সালে পুনের সিংঘাড়ে আরেকটি প্রশিক্ষণ নেয়। প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল প্রধান ছিল রাকেশ ধাওয়াড়ে, দুটি শিবিরেই পুরোহিত অংশ নিয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ১৩ নভেম্বর, ২০০৮)। তদন্তে উঠে আসে, ২০০০ সালে পুনে, ২০০১ সালে নাগপুর ও ২০০৩ সালে পুনের কাছে সিংঘাড়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল বজরং দল।

৫৩. সিবিআই ২০০৬ সালের নান্দেড় বিস্ফোরণের তদন্ত ফের শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তেই বোঝা গিয়েছিল সিবিআই প্রচুর তথ্য আলোচনার মধ্যেই আনেনি।

৫৪. ২০০৮-এর ২৫ নভেম্বর দিল্লির সিবিআই হেডকোয়ার্টার্সে এটিএস-এর তদন্তকারী দল যায়। ২০০৬-এর নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ড নিয়ে তথ্য অনুসন্ধানই ছিল তাদের লক্ষ্য। এই ঘটনাতেও কীভাবে প্রজ্ঞা সিং জড়িত রয়েছে, সেই তদন্ত করতে চাইছিল এটিএস। (*সকাল টাইমস,* পুনে, ২৬ নভেম্বর ২০০৮)

৫৫. সেনার গোয়েন্দা অফিসার থাকাকালীন বা অন্য সময় পুরোহিত ঠিক কেমন ছিল তা খুঁজে দেখতে সেনা সদর দফতরেও খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করে এটিএস। (*সকাল টাইমস,* পুনে, ২৬ নভেম্বর ২০০৮)

৫৬. তদন্তকারী দলের সন্দেহ ছিল মালেগাও বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের হয়তো পুনের খাদকি এলাকায় সেনার অস্ত্র গুদামে অবাধ যাতায়াত

ছিল। আর তাই মাথাদের চোখে ভালো সাজার জন্য পুরোহিত কোনো সীমান্তপারের জঙ্গির নাম ভাঙ্গিয়ে ওই গুদাম থেকে বিস্ফোরক সরিয়েছিল। (*হিন্দুস্তান টাইমস*, মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)

৫৭. পুলিশ MCOCA আদালতকে ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর জানায়, মহন্তদরানন্দ পাণ্ডে, সাধ্বী প্রজ্ঞা, পুরোহিত ও অন্যান্যদের সঙ্গে অনেকবার আলোচনায় বসে। পাণ্ডের ল্যাপটপ থেকে সে সবের ভিডিও ক্লিপস, অডিও মিলেছে। সরকারি আইনজীবী আদালতে জানায় যে পাণ্ডে, পুরোহিত ও প্রজ্ঞাকে দেখা গেছে, তারা আরডিএক্স, রাসায়নিক বোমা ও সেসবের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছিল। (*মহা মুম্বাই* (মহারাষ্ট্র টাইমস), মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর, ২০০৮)

যেহেতু ঘটনা পরম্পরা আকর্ষণীয় দিকে মোড় নিচ্ছিল, আমি রোজকারের খবরের কাগজ প্রায় গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু ওপরের এতগুলো খবরের মধ্যে তদন্তের সবথেকে চাঞ্চল্যকর যে ঘটনাগুলো, সেগুলো আমার হাড় হিম করে দিয়েছিল।

- বিশ্বহিন্দু পরিষদ নেতা প্রবীন তোগাড়িয়ার যোগাযোগ
- পুরোহিতের নার্কো পরীক্ষায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
- মহন্ত দয়ানন্দ পাণ্ডের গ্রেফতারি
- পুরোহিতের ল্যাপটপ ও দয়ানন্দ পাণ্ডের বিস্ফোরণের তথ্য হাতে আসা
- নান্দেড়, মালেগাঁও ২০০৬, আজমির দরগা ও সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণে সন্দেহভাজনরা যেভাবে জড়িত ছিল
- মালেগাঁও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে MCOCA আইনে অভিযোগ দায়ের
- প্রাক্তন আইবি আধিকারিকের সঙ্গে উগ্র হিন্দুবাদী সংগঠনের যোগ, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণে তাদের অংশ নেওয়া
- অভিযুক্তদের সঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলোর যোগাযোগ
- পুনের দুই ঐতিহাসিকদের সঙ্গে সন্দেহভাজনদের যোগাযোগ
- হিমানী সাভারকার, প্রাক্তন কর্নেল চিটালে ও প্রাক্তন বিজেপি কর্পোরেটর মিলিন্দ একবোটের মতো কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জেরা
- নান্দেড় বিস্ফোরণের ঘটনায় দিল্লির সিবিআইও সেনাসদর দফতরে এটিএস-এর যাওয়া এবং মামলার পুনর্তদন্ত নিয়ে সিবিআই-এর সিদ্ধান্ত
- সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর কাছে যেভাবে টাকা পয়সা আসত

ওপরের খবরগুলো পড়ার পর আমার মনে হয়েছিল হেমন্ত কারকারে একটা সত্যি আর ঠিকঠাক তদন্ত চালাতে পেরেছিলেন। এবং মৌচাকের যে জায়গাটায়

তিনি ঢিলটি মেরেছিলেন, তা যত সাহসী অফিসারই হোক না কেনো, যত বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই হোক না কেনো, কারোর অতো সাহস হবে না। সে কারণেই আমার ব্যাপারটা বেশ অন্যরকম লেগেছিল, আর তাই পরের দিনের খবরের কাগজের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। এরপরেই মুম্বাই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল, আর গোটা মামলাটাই থমকে গেল।

৬. কারকারে হত্যা রহস্য

২৬/১১ মুম্বাই হামলার ঘটনা মিথ্যে নয়, কিন্তু সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনা রহস্যজনক

২৬/১১ মুম্বাই হামলার পেছনে ঠিক কারা ছিল, কারাই বা চালাল তা নিয়ে বিস্তর তত্ত্ব রয়েছে। শুধুমাত্র লশকর-ই-তাইয়েবা, বা লশকর-আইএসআই, কিংবা আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের অস্ত্রশস্ত্রে লশকরই হামলা চালিয়েছিল কিনা সেসব আলোচনায় ঢুকতে চাইছি না। তত্ত্ব আরও আছে, যেমন তালিবান এবং আল-কায়েদা বা শুধু আল-কায়েদাই এর পেছনে জড়িত রয়েছে, ইহুদিবাদী-মোসাদ রয়েছে এর পেছনে, ইহুদিবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মিলিত চক্রান্ত হতে পারে, কিংবা বৈরুত বা লেবাননের মতো সিআইএ-মোসাদের মিলিত অভিযান হওয়াও অসম্ভব নয়। এখানেই শেষ নয়, ইসলামি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সিআইএ হাত মিলিয়ে এই কাণ্ড করে থাকতে পারে, ষড়যন্ত্র হতে পারে ইহুদিবাদী ও WASP-র (হোয়াইট, অ্যাংলো স্যাক্সন, প্রোটেস্ট্যান্ট, এরাই কার্যত আমেরিকায় ছড়ি ঘোরায়) আর নয়তো এটা নেহাতই ওই জঙ্গি ভাড়া করে যেরকম হামলা হয় সেরকম। যেখানে হাত থাকতে পারে তালিবানের অথবা আমেরিকার কিংবা ইজরায়েলের বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মতো নানান জনের। যারই পরিকল্পনা হোক, বা যেই এর পেছনে থাকুক না কেনো, একটা জিনিস সত্যি, ঘটনার তাজ-ওবেরয় হোটেলের পর্বটা একদম বাস্তব। এবং সেই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে অবশ্যই পাক যোগ রয়েছে। হামলার এই পর্বটি নিয়ে কারোর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু সিএসটি-সিএএমএ হসপিটাল-রঙ্গভবন লেনের ঘটনাটি নিয়ে এত জোর দিয়ে কারোর বলার কিছু নেই, কারণ ওই পর্বটি বেশ রহস্যজনক। আমি শুধু ওই পর্বটি নিয়েই আলোচনা করতে চাইছি। এবং অবশ্যই সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে। এটা সত্যি কথা, যে সব খবরই একদম একশ শতাংশই ঠিক, তা মোটেই নয়। কিন্তু একই সঙ্গে তাদের তো নেহাত হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। একটু নামী খবরের কাগজে যে খবর বেরোয় তার ভেতরের খবরগুলো একটু বুঝে শুনে, একটু নিজের জ্ঞানগম্যি ও যুক্তি খাটালেই আমরা কোথাও না কোথাও একটা পৌঁছতে পারি। সেরকমই সিএসটি-সিএএমএ হসপাতালের পর্বটি নিয়ে কিছু প্রতিবেদনের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ রইল।

পর্ব ১

সিআইএ ও র-এর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সূত্র চেপে দিয়েছিল আইবি আর নৌ সেনার গোয়েন্দা দফতরে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদী উপাদান

খবররের কাগজে সেই সময় প্রকাশিত খবরগুলো একটু খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যাবে, মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় গোয়েন্দাদের মধ্যে সামঞ্জস্যে বড়সড় ঘাটতি ছিল। খবর যা বেরিয়েছিল তাতে স্পষ্ট, আইবি-র মতো সংস্থা, যারা কিনা সরকারকে উল্টোপাল্টা, আজগুবি, ধোঁয়াশা ভরা তথ্য সরবরাহ করতেই অভ্যস্ত, সেই আইবি ইচ্ছে করে অনেক নির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণাদি চেপে গিয়েছিল। অথচ সেই তথ্য মুম্বাই পুলিশ ও যাদের আরও বেশি মাথাব্যথা, সেই পশ্চিমা নৌ কমান্ডের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের। শুধু তাই নয়, সন্দেহভাজন জঙ্গিদের মোবাইল নম্বর হাতে থাকে সত্ত্বেও তাতে নজরদারি চালানো হয়নি, আর যদিও বা তা করা হয়েছিল, সেই সময় পর্যন্ত অন্তত তা কাজে লাগানো হয়নি। যে যে সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত খবরগুলো প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো হলো—

১.	*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে	১ ডিসেম্বর ২০০৮
২.	*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে	৩ ডিসেম্বর ২০০৮
৩.	*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে	৩ ডিসেম্বর ২০০৮
৪.	*মারাঠি দৈনিক সকাল,* পুনে	৩ ডিসেম্বর ২০০৮
৫.	*হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই	১১ ডিসেম্বর ২০০৮
৬.	*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই	১৫ ডিসেম্বর ২০০৮
৭.	*হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই	২৪ ডিসেম্বর ২০০৮
৮.	*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই	২৬ ডিসেম্বর ২০০৮
৯.	*হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই	১০ জানুয়ারি, ২০০৯

ওপরের খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংযোজনী ১-এ দেওয়া রয়েছে।

মেট্রো সিনেমা
পশ্চিম
দক্ষিণ
উত্তর
পূর্ব
রঙ্গ ভবন
তিলক রোড
ঘটনাস্থল
জিটি হাসপাতাল
কামা হাসপাতাল
আজাদ ময়দান
মহাপালিকা মার্গ
কামা নতুন ভবন
পেছনের গেট
এস বি আই ভবন
সিঁড়ি
এখানে প্রথম কারকারে আসেন
ক্যাপিটাল সিনেমা
মুম্বাই কর্পোরেশন
টাইমস অব ইন্ডিয়া ভবন
ফুট ওভার ব্রিজ
ডি.এন. রোড
আন্ডারগ্রাউন্ড সাবওয়ে
ডি.এন.রোড
জে জে উড়াল সেতু
প্রধান সি এস টি ভবন
প্ল্যাটফর্ম
১
২
৩
৪
৫
৬
সিঁড়ি
সি এস টি
সাব আর্বান লোকাল লাইন
বন্দর মসজিদ (উত্তর দিক)
রেল স্টেশন
খোলা জায়গা
স্থানীয় প্রবেশ পথ
জনসমাবেশ
জি.পি.ও
প্ল্যাটফর্ম ১/২/৩
সি এস টি প্রধান রেখা (বহি রেখা)
১৩
১৪
১৫
শহীদ ভগত সিং রোড
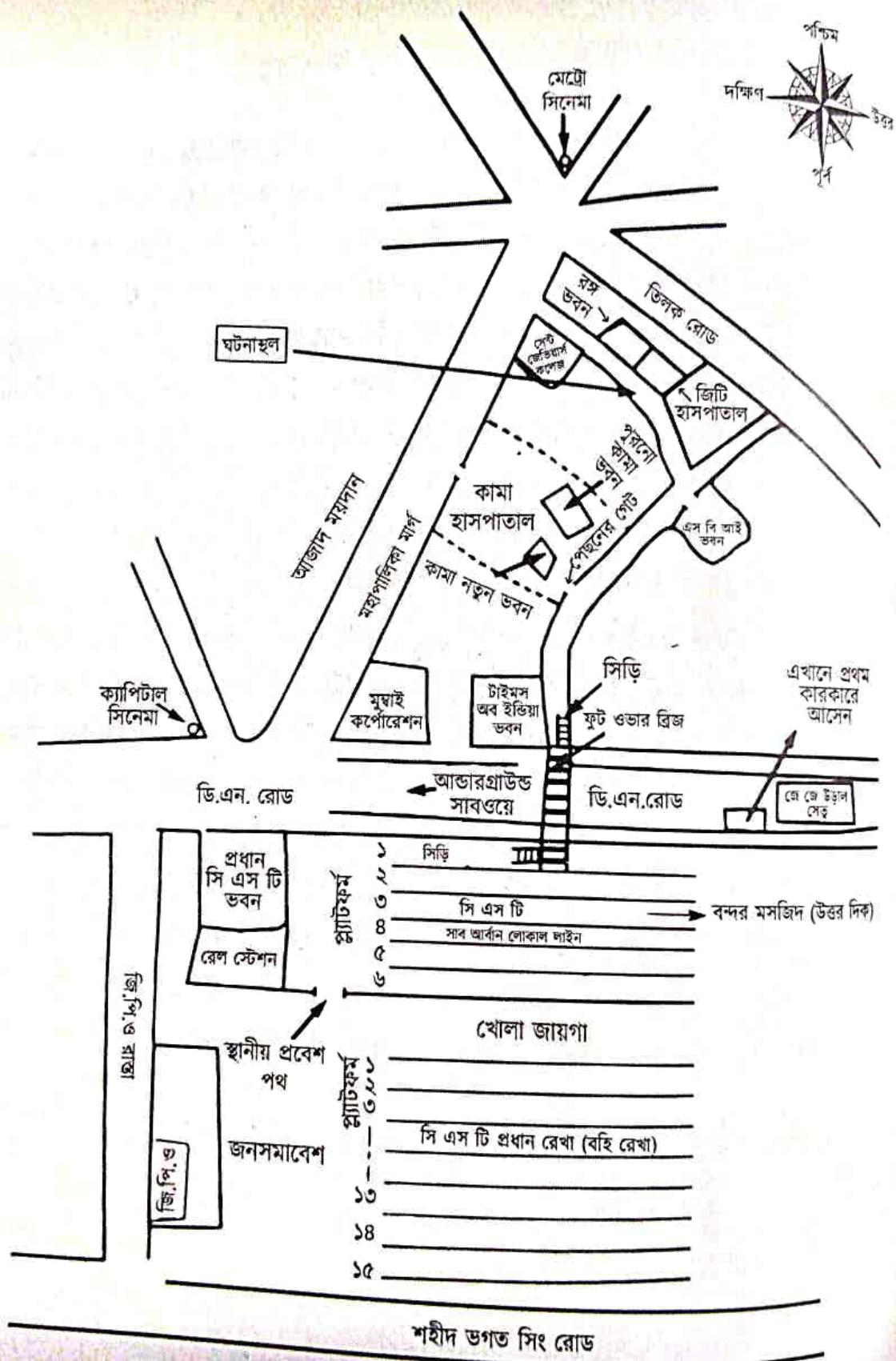
জঙ্গী আক্রমণে আক্রান্ত স্থান এবং হেমন্ত কারকারের হত্যাস্থানের মানচিত্র

১. ওপরের খবরের কাগজগুলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর বিশ্লেষণমূলক সংক্ষিপ্তসার

১. ২০০৮-এর ১৮ নভেম্বর, আমেরিকা 'র'-কে সতর্কবার্তা পাঠায়। তারা জানায়, বোটে করে ভারতীয় জলসীমায় ঢোকার চেষ্টা করছে লশকর জঙ্গিরা। শুধু তাই নয়, সমুদ্রপথের কোথায় তাদের অবস্থান, কোথা দিয়ে তারা আসছে সেই সমস্ত কিছুও বলে দেওয়া হয়েছিল। করাচি থেকে বোটটি ২০ থেকে ৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে থাকলেও, ভারতীয় বায়ুসেনা খুব সহজেই ব্যবস্থা নেওয়ার অবস্থায় ছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই, ১৫ ও ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮)

২. সংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে এই খবর পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৯ নভেম্বর 'র' এই খবর আইবি-কে জানিয়ে দেয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই, ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮)

৩. আইবি-র জয়েন্ট ডিরেক্টর প্রভাকর অলোক, ২০ নভেম্বর নৌ সদর দফতরে (নৌ গোয়েন্দার প্রিন্সিপাল ডিরেক্টরের মাধ্যমে) এবং উপকূলরক্ষী বাহিনীর কাছে এই খবর পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, মুম্বাই পুলিশ কিংবা মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে এই খবর পাঠানো হয়নি। অথচ তাদেরকেই আগে সতর্ক করার কথা ছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই, ১৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮)

৪. নৌ গোয়েন্দাবাহিনীর প্রিন্সিপাল ডিরেক্টরের উচিত ছিল পশ্চিমা নৌ কমান্ডের কাছে খবরটি পৌঁছে দেওয়া। কারণ তাদের ওপরেই মুম্বাইয়ের উপকূল রক্ষার ভার। কিন্তু সে তাদের কাছে খবরটি পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই, ১৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮)

৫. নৌ গোয়েন্দার প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর নৌ সেনাপ্রধানকে পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। নৌ সেনাপ্রধানের কাছে যে সেরকম কোনো তথ্য ছিল না, তা বোঝা গিয়েছিল মুম্বাই হামলার ঘটনায় তার প্রতিক্রিয়া থেকেই। ১২ তারিখ আইবি ও ১৮ তারিখ 'র'-এর কাছ থেকে তার কাছে যে তথ্য গিয়েছিল, তিনি তার ভিত্তিতেই জানিয়েছিলেন, এই হামলার শক্তপোক্ত কোনো তথ্য তার কাছে অন্তত ছিল না। তিনি এটাও পরিষ্কার করে দেন, যে ভারতের ওপর সন্ত্রাসবাদী হামলা হতে পারে বলে যদি কোনো তথ্য আসে, তাহলে আলাদা করে কিই বা করার থাকতে পারে। এ নিয়ে নতুন করে তো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। ২০শে নভেম্বর নৌ গোয়েন্দার

প্রিন্সিপাল ডিরেক্টরের হাতে যে তথ্য এসে পৌঁছেছিল, নৌ সেনাপ্রধান নিশ্চয়ই সেই তথ্য হাতে পাননি। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে এবং *সকাল*, পুনে, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮)

৬. ২১ নভেম্বর অবশ্য উপকূল রক্ষী বাহিনী সন্দেহভাজন লস্করের বোটটির খোঁজে তল্লাশি চালায়। কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দারা যা তথ্য দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী এগিয়েও কিছু পাওয়া যায়নি। আর কোনো তথ্য রয়েছে কিনা জানতে উপকূলরক্ষী বাহিনী যোগাযোগ করে আইবি-র জয়েন্ট ডিরেক্টর প্রভাকর অলোকের সঙ্গে। অলোক তাদেরকে আরও কিছু তথ্য দেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু আর কখনই দেয়নি। (*হিন্দুস্তান টাইমস*, ১১ ডিসেম্বর, ২০০৮, *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ১৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০০৮)

৭. এছাড়াও শীর্ষমহলের তরফে (সম্ভবত ক্যাবিনেট সচিবের মারফত) আইবি-র হাতে গোপন একটি নোট পাঠানো হয়। তাতে প্রায় ৩৫টি মোবাইল নম্বরের কথা বলা হয়েছিল। যেগুলো লশকর জঙ্গিদের ছিল বলে সন্দেহ। সেগুলোর ওপর নজরদারি চালানোর কথা বলা হয়েছিল সেই নোটটিতে। এই নোট ২১ নভেম্বর আইবি-র হাতে এসেছিল, অর্থাৎ বিস্ফোরণের আগের দিন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আইবি ওই সব নম্বরের ওপর নজরদারি চালায়নি। এই গাফিলতি খুবই খারাপ এই কারণে, যে ওই ৩৫টি নম্বরের মধ্যে অন্তত তিনটি নম্বর থেকে সন্ত্রাসবাদীরা, পাকিস্তানে তাদের সঙ্গীদের সাথে কথা বলে যাচ্ছিল। (*হিন্দুস্তান টাইমস*, ১০ জানুয়ারি, ২০০৯)

৮. মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্যে আঘাত হানার পর এবং এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে ও আরও দুই পুলিশ কর্মীর হত্যার পর মাঠে নামে আইবি। কলকাতা থেকে বেশ কিছু ফোন করা হয়েছিল। কলকাতা থেকেই ৩৫টির মধ্যে ৩২টি সিম কার্ড কেনা হয়। এরপর মুম্বাই পুলিশকে সতর্ক করা হয়, কল রেকর্ড করার কাজও শুরু হয় সেই সব দুর্ঘটনার পর। (*হিন্দুস্তান টাইমস*, ১০ জানুয়ারি, ২০০৯)

২. কোটি টাকার প্রশ্ন

মুম্বাই পুলিশ ও মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে মুম্বাই হামলা সংক্রান্ত তথ্য থাকা সবথেকে জরুরি ছিল। কিন্তু আইবি তাদের কাছে কেনো সেই সব তথ্য দিল না, যেখানে আইবি-র কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য ছিল? শুধু তাই নয়, মার্চ ২০০৭ থেকে

২০০৮ নভেম্বর পর্যন্ত অন্তত পাঁচবার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৮)

কেনো নৌ গোয়েন্দা বিভাগের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর, তথ্য জানা সত্ত্বেও তা পশ্চিমা নৌ কমান্ড বা নৌ সেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জানাল না? (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে ও *সকাল,* ৩ ডিসেম্বর ২০০৮)। নৌ গোয়েন্দা বিভাগের প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর কি নিজে এই কাজটি করেছিল? নাকি তথ্য আটকাতে কেউ এতে নাক গলিয়েছিল? নাকি তারা এই কাজটি করেছিল অন্য কারোর নির্দেশে?

কোথাও থেকে সত্যি মিথ্যে যাই খবর হোক না কেনো, ফোনে আড়ি পাতা আইবি-র অভ্যেস। সেই আইবি একদম ঠিকঠাক খবর পাওয়া সত্ত্বেও কেনো সন্দেহভাজন ৩৫টি মোবাইল নম্বরের ওপর নজরদারি চালাল না? হামলার ৫ দিন আগে তাদের হাতে এই নম্বরগুলো এসে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্যে হামলা চালিয়ে এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে ও বাকিদের খুন করা পর্যন্ত কেনো অপেক্ষা করছিল আইবি? (হিন্দুস্তান টাইমস, মুম্বাই, ১০ জানুয়ারি, ২০০৯) নাকি তারা সেই নম্বরের ওপর নজরদারি চালিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে পাওয়া তথ্য কোনো সন্দেহজনক কাজে লাগিয়েছিল তারা?

আইবি সাধারণত মুম্বাইয়ের ওপর কড়া নজর রেখে থাকে। হামলার ৪০ দিন আগে সংবেদনশীল সমুদ্র সৈকতগুলো থেকে নজরদারি তুলে নিয়েছিল পুলিশ। এই বিষয়টি কেনো নজরে এলো না আইবি-র? (*হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই, ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৮) আর যদি সে বিষয়টি তাদের নজরে এসেই থাকে, তাহলে তারা কেনো পুলিশকে বলল না যে, এখন অন্তত নজরদারি তোলার কোনো জায়গা নেই, উল্টো তা আরও বাড়ানো উচিত, কারণ সমুদ্রপথে সন্ত্রাসীদের আসার ঠিকঠাক খবর তাদের হাতে ছিল?

৩. যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার

আসলে এই ঘটনায় দোষী যারা, তারা হলো,

১. আইবি-র জয়েন্ট ডিরেক্টর (প্রভাকর অলোক) মুম্বাই পুলিশের কাছে তথ্য চেপে গিয়েছিল। আর সে তথ্য এমন তথ্য, যার জেরে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন ছিল। আর সেই দায়িত্বে থাকার কথা ছিল মুম্বাই পুলিশেরই।

২. নৌ গোয়েন্দার প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর অথবা তাকে প্রভাবিত করেছিল এমন কেউ! তারাই পশ্চিমা নৌ কমান্ডের কাছে খবর পৌঁছতে দেয়নি। খবর যায়নি নৌ সেনার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছেও। এবং

৩. আইবি-র একজন সিনিয়র অফিসার। যে ব্যক্তিটি সিএসটি-সিএএমএ হসপিটাল-রঙ্গভবন লেনের দুর্ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত 'র'-এর মারফত পাওয়া ৩৫টি মোবাইলের ওপর নজরদারি চালায়নি।

যদি ঘটনার ঠিকমতো তদন্ত করা হয়, তাহলে অবশ্যই বোঝা যাবে ওই ব্যক্তিরা কোনো না কোনো ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। যাদের লক্ষ্য ভারতকে হিন্দু (পড়ুন ব্রাহ্মণ্যবাদী) রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। আর তারা যে তথ্যটি বেমালুম চেপে দিয়েছিল, সেগুলো কিন্তু কোনো মতেই তাদের গাফিলতি ছিল না। বরং হিন্দু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সাফ করে দেওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। আর এটাই প্রায় ফাঁস করে দিয়েছিলেন তৎকালীন এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে।

আইবি এবং 'র' কী তথ্য পেয়েছিল, কীই বা তারা সরকারকে দিয়েছিল, সেই বিষয়টি সামনে এসেছিল মহারাষ্ট্র সরকারের তৈরি দুই সদস্যের প্রধান প্যানেলের রিপোর্টে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (৩১ মে ২০০৯)-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাক্তন 'র' আধিকারিক ভি বালাচন্দ্রন ও প্যানেলের দ্বিতীয় সদস্যকে তাদের প্রাক্তন সহকর্মী চেন্নাইয়ের একজন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ বি রামনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। প্যানেলের রিপোর্ট নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল, সেগুলো যাচাই করতেই প্যানেল সদস্যদের রামনের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর কথা বলা হয়। রামনকে পাঠানো মেইলে, বালাচন্দ্রন লিখেছিলেন, "গোপন তথ্যগুলো হস্তগত করার ক্ষেত্রেও রাজ্য পুলিশের সূত্রকেই কাজে লাগাতে হয়েছিল। কারণ আইবি ওর কোনো তথ্যই আমাদের দেয়নি। সম্ভবত সেই তথ্য তারা তাদের কাছেই রেখে দিয়েছিল, অথবা রাজ্য পুলিশকে দিয়েও (না দিয়েও) থাকতে পারে।"

'র', তাদের তরফে যে কাজ করার সেটা কিন্তু করেছিল। কিন্তু আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ওপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে প্যানেলের কাছে তথ্য দেওয়া বন্ধ করিয়েছিল।

পর্ব ২

সিএসটি-তে ১৬টি সিসিটিভি ফুটেজ বিকৃত করা হয়েছিল

১. *ডিএনএ*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর ২০০৮

স্টেশনে যে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো ছিল তাতে দুজন জঙ্গির চেহারা ধরা পড়ে তারমধ্যে একজন আজম আমীর কাসভ এবং আবু দেরা ইসমাইল খান।

২. দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, পুনে, ২৮ নভেম্বর, ২০০৮

৭/১১ ট্রেন বিস্ফোরণের পর যে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো লাগানো হয়েছিল, তাতে গোটা গোলাগুলির ঘটনাটা ধরা পড়েছিল। রেলওয়ে এবং অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে তদন্তের জন্য স্পষ্ট ফুটেজ ছিল।

৩. *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১২ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনালে (সিএসটি) থাকা সিসিটিভিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ধরা পড়েছিল। সে সব ফুটেজ নিশ্চয়ই তদন্তের কাজে আসত কিন্তু হেরিটেজ রেলওয়ের মেন সেকশনে থাকা ১৬টি সিসিটিভি ফুটেজে নাকি কোনো রেকর্ডিং-ই হয়নি। ২৬ নভেম্বর সিএসটি-তে ঢুকে দুজন জঙ্গি গুলি চালিয়ে অন্তত ৫৬ জনকে হত্যা করেছিল। অথচ সিসিটিভি ক্যামেরা কোনো কাজে লাগেনি।

২. ঠিক ওই সেকশনেই (দূরপাল্লার ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে) লাগানো ১৬টি ক্যামেরা সেই সময় কাজ করছিল না। অথচ স্টেশনে থাকা সিসিটিভিগুলো দিব্যি কাজ করছিল। ফলে সন্দেহ, শুধুমাত্র যান্ত্রিক গোলযোগের কোনো কারণ নাও থাকতে পারে।

৩. স্টেশনে মোট ৩৮টি সিসিটিভি লাগানো ছিল। এরমধ্যে ১৬টি মেইন লাইনে (দূরপাল্লার ট্রেনের প্লাটফর্মে) এবং ২২টি সাব-আর্বান লাইনে।

৪. *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮

১. মেইন লাইনের ১৬টি ক্যামেরা যেখানে সন্ত্রাসী হামলা রেকর্ড করতে পারেইনি, সেখানে সাব-আর্বান স্টেশনের যাত্রীদের দুটি ঢোকার গেটের মুখে লাগানো সিসিটিভি-র মুখ ঘোরানো ছিল কংকর্স হলের দিকে।

২. এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দুটি গেটে মেটাল ডিটেক্টর বসানো ছিল। তারমধ্যে দিয়ে ঢোকার সময় নজরদারি চালাত সিসিটিভিগুলো। এছাড়া মেইন লাইন আর সাব-আর্বান সেকশনের মধ্যেকার কিছু জায়গাও সেই ক্যামেরা দুটিতে ধরা পড়ত। কিন্তু সেগুলো এমনভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যে সাব-আর্বান স্টেশনের বাইরের জিনিস কিছু তারমধ্যে ধরা পড়ছিল না।

উপসংহার

হামলার পর দুদিন ধরে যে সব প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয় সিএসটি-তে যেসব সিসিটিভি ফুটেজ লাগানো ছিল, তাতে গোটা হামলার

ঘটনা ধরা পড়েছিল। ধরা পড়েছিল সন্ত্রাসীদের ছবিও। এবং সেই ফুটেজের ওপর ভিত্তি করেই রেলওয়ে ও অন্যান্য আধিকারিকরা তদন্ত চালাতে পারবেন। কিন্তু ঘটনার ১৫দিন পর খবর বেরোতে শুরু করে, যেখানে হামলা হয়েছিল সেই সিএসটি-র মেনলাইন সেকশনে যে ১৬টি সিসিটিভি বসানো ছিল, ওই দিনটিতেই ঠিকমতো কাজ করেনি। ফলে গোটা ঘটনা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

এই দুরকম প্রতিবেদন আমাদের দুটি তত্ত্বের সামনে হাজির করায়। হতে পারে যে পরিকল্পনার সময় পরিকল্পনাকারীদের মাথায় এটা আসেনি যে যেখানে এই কাণ্ডটি ঘটানো হবে, সেখানে হয়তো সিসিটিভি থাকতে পারে। আসলে ওইখানেই হয়তো সন্ত্রাসীদের ছদ্মবেশে কারোর এসে গোটা ঘটনাটি ঘটানোর কথা ছিল, আর অন্য কাউকে সন্ত্রাসবাদী বলে চালিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে, গোটা ব্যাপারটাই সিসিটিভিতে ধরা পড়ে গেছে, এবং তা রেলওয়ে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের হাতে পড়ে গেছে, তখনই আইবি-র হয়তো উদয় হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, টপ সিক্রেট, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এই ধরনের চেনা বুলি আওড়ে সেই সব সিসিটিভির ফুটেজ হাতিয়ে নেয়। অবশ্যই রেলকর্তাদের তারা বলে থাকবে, যে তাদের কাছেই এই গোপনতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটেজগুলো নিরাপদে থাকতে পারে। এবং তারপরেই আইবি ঘোষণা করায়, ১৬টি ক্যামেরা কাজই করছে না।

অন্য যে তত্ত্ব মাথায় আসে সেটা হলো এই সিসিটিভির ব্যাপারটি হয়তো তাদের মাথাতেই ছিল। মেইন লাইন সেকশনে যেখানে গুলি চলে তার পুরোটাই ছিল সিসিটিভি নজরদারিতে। আর যেখান দিয়ে হামলাকারীরা ঢুকবে বা বেরোবে সেই দুই গেটেও ছিল সিসিটিভি। সম্ভবত প্রত্যেকটার ফুটেজই বিকৃত করা হয়েছিল। তারা চায়নি আসল হামলাকারীদের চেহারা জনসমক্ষে আসুক। আর তাছাড়া এটা তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি এর আগেও এই ধরনের কাজ করেছিল। আহমেদাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ড বা সুরাটের অবিস্ফোরিত বোমার ঘটনার ক্ষেত্রেই তো এই ধরনের ঘটনা দেখা গিয়েছিল। যেখানে তালসারি টোলের ওপর দিয়ে চুরি হওয়া গাড়িগুলো গিয়েছিল। যেগুলো মামলার ভালো সূত্র হতে পারত। সেই টোলেরই সিসিটিভির ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পর্ব ৩

সিএসটি-র সন্ত্রাসবাদীরা যে সিম কার্ড ব্যবহার করেছিল, তার সাথে সাতারা যোগ

১. *মহারাষ্ট্র টাইমস* (অনলাইন নিউজ), ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. সাতারা জেলার এক ব্যক্তির সিম কার্ড মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় ব্যবহার হয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে ওয়াই তালুকার কুম্ভরওয়ড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে আটক করে মুম্বাই নিয়ে আসে এটিএস। এছাড়াও ওই সিম কার্ড নম্বরের সঙ্গে সাতারার এক মহিলারও যোগ ছিল।

২. ২৬ নভেম্বর সিএসটি-তে রেলওয়ে পুলিশের সঙ্গেই ছিল দুই সন্ত্রাসবাদী। তাদের মধ্যে একজনের মোবাইল ফোন মাটিতে পড়ে যায়। যখন পুলিশ সেটি বাজেয়াপ্ত করে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে, তখন জানা যায়, সন্ত্রাসীরা এই ফোন থেকেই কথাবার্তা চালিয়েছিল, আর এই সিম কার্ড সাতারা জেলার কোনো ব্যক্তির। মুম্বাইয়ের এটিএস অশোক গোরে নামে একজনকে আটক করে। তার নামেই সিমকার্ডটি নেওয়া হয়েছিল। তাকে তালুকার কুম্ভরওয়াড়ি থেকে করে মুম্বাই আনা হয়। সে পুলিশকে জানায়, ফোনটি রত্নাগিরি এলাকায় সে হারিয়ে ফেলেছিল। যদিও পুলিশে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। যদিও জেরার পর পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু যেহেতু সিম কার্ড রহস্যের সমাধান তখনও হয়নি, তাই তার ওপর নজরদারিও বন্ধ করা হয়নি।

৩. সিএসটি-তে আরেকটি বিএসএনএল-এর সিম কার্ড পাওয়া গেছে। সেটি আবার সাতারার এক মহিলার। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে জানায়, তার ছেলে সেই সিম ব্যবহার করছিল। এটিএস তার ছেলে সম্পর্কেও খোঁজ খবর নেয় কিন্তু ওই সিমকার্ডটি সন্ত্রাসবাদীরা ব্যবহার করছিল কিনা, সেটা জানা যায়নি।

২. *পুরি*, পুনে, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮

১. সূত্র মারফত খবর, এটিএস-এর আইজি দিলীপ শ্রীরাও, সাতারার দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে জেরা করেন। (জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া সিম কার্ডের প্রেক্ষিতে এই জেরা)

২. সাতারা জেলার দুই ব্যক্তির নাম সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় সে জেলায় (মহারাষ্ট্র) বিস্তর হইচই হয়। এটিএস জানায় তারা ওয়াই তালুকার এক যুবক ও সাতারার এক মহিলা সম্পর্কে খোঁজখবর করে।

৩. এটিএস অফিসাররা সাতারার আরও বেশ কয়েকজনের নাম জানতে পারে। সূত্রের খবর, এটিএস সাতারা শহরের একজন বেশ পরিচিত ব্যক্তিকে জেরা করে।

৩) *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১০ ডিসেম্বর ২০০৮

পাকিস্তান থেকে লশকর-ই-তাইয়েবার লোকেরা গোটা বিষয়টির ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল। আজমল কাসভ ও ইসমাইল খান সিএসটিতে হামলার সময় লশকর নেতাদের ফোন করার সময় পায়নি (অথচ সিএসটিতে পুলিশের সাথে থাকা জঙ্গিরা ফোনে যোগাযোগ করতে পেরেছিল। আর সেই ফোনের সঙ্গে সাতারা যোগের কথা উঠে আসে। *মহারাষ্ট্র টাইমস* অনলাইন নিউজে যে কথা আগেই বলা হয়েছে।)

যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার

এসটি-তে যে দুই জঙ্গি তাণ্ডব চালিয়েছিল, তারা কিন্তু আজমল কাসভ ও ইসমাইল খান ছিল না। সাতারার সিম কার্ড সঙ্গে রাখা জঙ্গিরাই সেই কীর্তি চালিয়েছিল। সম্ভবত তাদের সঙ্গে মহারাষ্ট্রের যোগ ছিল। পুলিশ যে মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছিল বলে চার্জশিটে দেখিয়েছিল, তারমধ্যে ওই মোবাইল ফোন দুটির কিন্তু কোনো উল্লেখ ছিল না। কারণ ক্রাইম ব্রাঞ্চ মুম্বাই ও আইবি-র মাথায় এটা অন্তত ছিল যে ওই দুই ফোন যদি জনসমক্ষে এসে যায়, তাহলে তাদের বানানো গল্প ফাঁস হয়ে যাবে। গোটা দেশকে ভুল রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে হইচই হবে। তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাবে।

পর্ব ৪

সন্ত্রাসবাদী ও তাদের পাক হ্যান্ডলারদের কথোপকথনের যে ২৮৪টি কলের তথ্য মিলেছে, তা করা হয়েছিল ভিওআইপি-র (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল টেকনোলজি) মাধ্যমে। কাসভ বা ইসমাইল খান, একটিও কল রিসিভ করেনি।

১. *সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১২ জানুয়ারি, ২০০৯

১. ৫৮ ঘণ্টা ধরে যে অবরুদ্ধকর পরিস্থিতি ছিল, তার মধ্যে জঙ্গিরা ২৮৪টি কল রিসিভ করেছিল। এরমধ্যে ৪১টি ফোন কল তাজের জঙ্গি ও তাদের পাকিস্তানের যোগাযোগ বা হ্যান্ডলারদের মধ্যে হয়েছিল।
২. ওবেরয় ও ট্রাইডেন্ট হোটেলের সন্ত্রাসবাদীরা ৬২টি কল রিসিভ করেছিল। নরিম্যান হাউজের জঙ্গি পেয়েছিল ১৮১টি কল।

২. চার্জশিট
আদালতে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ যে চার্জশিট দাখিল করেছিল, তাতে ফোনের বিস্তারিত বিবরণ ছিল।

উপসংহার

এরমধ্যে একটি কলও রিসিভ করেনি আজমল কাসভ ও ইসমাইল খান। অথচ এদের বিরুদ্ধেই সিএসটি-তে হত্যালীলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে, কারকারে ও অন্যান্যদের খুনের অভিযোগ রয়েছে। পাকিস্তান থেকে ট্রলারে করে কাফে প্যারেডে নামা জঙ্গিদের মধ্যে কিন্তু এই দুই ব্যক্তি ছিল না।

পর্ব ৫

সন্ত্রাসবাদীরা মারাঠি ভাষায় স্বচ্ছন্দ ছিল

১. *মহারাষ্ট্র টাইমস*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর ২০০৮

১. সিএএমএ হাসপাতালে যে দুজন জঙ্গি ঢুকেছিল তাদেরকে হত্যা করা হয়। তারা যখন হামলা চালায়, সেই সময় দুজন নিরাপত্তারক্ষী সেখানে ছিলেন। এছাড়াও আরেকজন কর্মচারী, হাসপাতালের ইউনিফর্ম ছাড়া কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একজন সাবলীল মারাঠি ভাষায় এসে তাকে প্রশ্ন করে, আপনি কি এখানে কাজ করেন? ওই কর্মচারী জঙ্গিটির পা জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন, আমি এখানে কাজ করি না, আমার বউয়ের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এরপর প্রায় হুমকির সুরেই তাকে ফের জঙ্গিটি প্রশ্ন করে, আপনি কি সত্যি বলছেন? ওই ব্যক্তি জবাব দেয়, মায়ের দিব্যি, আমি সত্যি বলছি। ওই ব্যক্তিকে আর প্রাণে মারেনি জঙ্গিরা।

২. ওই কর্মচারী সিএএমএ কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য বিভাগে গোটা বিষয়টি জানায়।

৩. বলা হয়েছিল, ওই সন্ত্রাসীরা অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অশোক কামতে, এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে ও বিজয় সালাসকারের হাতে মারা পড়েছিল।

২. *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ২৯ নভেম্বর ২০০৮

১. বুধবার রাতে সিএএমএ হাসপাতালের এক কর্মচারীকে এক জঙ্গি প্রশ্ন করেছিল, "তুঝা ইথে কায় আহে?" (তুমি এখানে কী করছ?)। কর্মচারীর মাথায় তখন বন্দুক তাক করা। তিনি মারাঠিতেই বলেছিলেন,

আমার এক আত্মীয় এই হাসপাতালে ভর্তি আছে। রেহাই মিলেছিল তার।

২. সন্ত্রাসীরা মারাঠি ভাষায় কথা বলছিল, এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য প্রশাসনের মুখপাত্র ভূষণ গগরানিই (সিনিয়র আইএএস অফিসার) বলেছিলেন, যে কর্মচারীরা ওই সন্ত্রাসবাদীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তারাই এই ঘটনা জানিয়েছেন। বুধবার এক সন্ত্রাসীর সঙ্গে তারা মারাঠি ভাষাতেই কথা বলেছিলেন।

৩. রাজ্য প্রশাসন পুলিশকে এই বিষয়টি জানায়, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। জানান গগরানি।

৩. *হিন্দুস্তান টাইমস*, ৫ ডিসেম্বর ২০০৮

১. চন্দ্রকান্ত তিখে সত্যিই একজন নায়ক। বছর পঞ্চাশের এই মানুষটি কামা অ্যান্ড অ্যালব্লেস হাসপাতালে জেনারেটর অপারেটর হিসেবে কাজ করেন। যখন বন্দুকের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তখন তিখে ছিলেন হাসপাতালের সামনে অন্যান্য কয়েকজন কর্মচারী ও রোগীদের কিছু আত্মীয়ও সেখানে ছিলেন।

২. আওয়াজ যখন কাছে আসছিল, তিখে ও অন্যান্যরা ছুটে হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে যান। অনেকেই হাসপাতালের মধ্যে লুকোনোর জন্য ছুটে আসছিলেন। তিখেও তাদের পেছনেই ছুটছিলেন। বারান্দায় কাসভ ও খানের মুখোমুখি পড়ে যান তিনি।

৩. তার দিকে বন্দুক তাক করে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এখানে সে কী করতে এসেছে, তিখে তাদের বলেন, আমি রাতের বেলা এই হাসপাতালে ডিউটি করি। সমস্ত দরজা বন্ধ রয়েছে কিনা সেটা দেখা আমার দায়িত্ব।

৪. কাসভ আর খান তিখের কাছে জানতে চায়, সে হিন্দু না মুসলিম। তিখে বলেন, সাহেব, ম্যায় হিন্দু হুঁ (আমি হিন্দু)। তখন জঙ্গিরা তাঁকে হাসপাতালের বাইরে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিতে বলে। তিখে তাদের হাসপাতালের নীচের দিকে নিয়ে যান।

৫. মাঝপথে আসার আগেই তিখে ছুট লাগান। সদানন্দ দাতে নামে এক পুলিশকর্মীকে দেখতে পান তিনি। তাদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। এরমাঝে গ্রেনেড বিস্ফোরণে জখম হন তিখে।

৬. হাসপাতাল থেকে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। এরপর তারা যায় গিরগাঁও চৌপট্টির দিক। সেখানেই খানকে নিকেষ করা হয়, পাকড়াও হয় কাসভ।

উপসংহার

সিএসটি-সিএএমএ হাসপাতালে তাণ্ডব চালানো তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীর কেউ বিদেশি ছিল না। তারা মারাঠিভাষী ছিল এবং হিন্দু বিরোধীও ছিল না।

পর্ব ৬

সিএসটি-তে যে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২২ জন মুসলিম

১. *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর ২০০৮

পাকিস্তানের ফরিদাকাদে একজন অশিক্ষিত দিনমজুর আকমল (আজমল) পুলিশকে জানায়, তাকে ও তার জিহাদি বন্ধুদের ফিদায়ি মিশনে যোগ দেওয়ার জন্য মগজ ধোলাই করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল, মুসলিমদের এড়িয়ে যতজনকে পারো খুন করো।

২. *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ২৯ নভেম্বর ২০০৮

১. মুম্বাই পুলিশের হাতে একমাত্র জীবিত জিহাদি কাসভ ধরা পড়েছিল। তার দেওয়া চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করার সময় *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার* প্রতিবেদনে বলা হয়, এলোপাথাড়ি খুন করার জন্য তাদের তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ করে সাদা চামড়ার বিদেশিদের। যদিও মুসলিমদের এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

২. একই দিনে, *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* খবর প্রকাশ করে, আব্বাস আনসারি নামে একজন, তার স্ত্রী ও পরিবারের চার সদস্য সহ সিএসটি-তে নিহত হয়েছেন। ঈদ উপলক্ষ্যে তারা বাড়ি আসছিলেন।

৩. মারাঠি দৈনিক *লোকসত্তা,* ৮ ডিসেম্বর, ২০০৮

মুম্বাইয়ের সিএসটি স্টেশনে মৃত ৪০ শতাংশই মুসলিম।

৪. *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৩ ডিসেম্বর ২০০৮

গত বুধবার টার্মিনাল স্টেশনে দুই বন্দুকধারী সন্ত্রাসী তাদের এলোপাথারি গুলিতে ২২ জন অসহায় মুসলিমকে হত্যা করে। সিএসটিতে যাত্রী ও আরপিএফ সহ ৫৮ জনের মৃত্যু হয়।

পরে জানা যায় ৫৮ নয়, ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে এই সিএসটি-র ঘটনায়। এর মধ্যে ৬ জন হয় পুলিশ নয়তো অন্যান্য কর্মচারী। এক্ষেত্রে সিএসটি-তে ৪৬ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে ২২ (৪৮ শতাংশ) জনই মুসলিম। এর মধ্যে আবার যাঁরা মাথায় টুপি ও দাড়ি রেখেছিলেন, কিংবা যাঁরা বোরখা পরেছিলেন, তাদেরই মৃত্যু হয়েছে বেশি।

উপসংহার

সিএসটি-র দুই জঙ্গি জিহাদি হতে পারে না। কারণ তাদেরকে মানুষ মারতে বলা হয়েছিল। মুসলিমদের রেহাই দেওয়ার নির্দেশ ছিল।

পর্ব ৭

ফাঁদে ফেলা হয়েছিল কারকারেকে

২০০৮-এর ৭ ডিসেম্বর, এনডিটিভি ইন্ডিয়া, আইবিএন ৭ ও আজ তক চ্যানেল, পুলিশ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের টানা ১০-১৫ মিনিট বারবার শুনিয়ে যায়। ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর হামলা হওয়ার ঠিক আগের কিছু সময়ে, কন্ট্রোল রুম পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ওডিসিপি কোন ১-এর মানে বিভিন্ন নির্দেশ ও কথাবার্তা চলছিল। রাত দশটা পনেরো থেকে বারো পনেরো মিনিট পর্যন্ত এই বার্তা চালাচালি চলে। কি বার্তা ছিল? সিএমএ হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সেন্ট্রাল রিজিয়ন (সদানন্দ দাতে) এনকাউন্টারে আহত হয়েছে। এনকাউন্টার চলে গিরগাঁও চৌপট্টিতে। (বইয়ের সংযোজনী ২-এ পুলিশের কথাবার্তার এই অংশটির বিস্তারিত দেওয়া রয়েছে)

ওয়্যারলেসে সিনিয়র অফিসারদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে অভিযান চালাচ্ছিলেন পুলিশ কমিশনার ও যুগ্ম পুলিশ কমিশনার। তারা কেউই হেমন্ত কারকারে কী করছেন না করছেন, সেই সম্পর্কে কিছু জানতে পারেননি। জয়েন্ট সিপি শুধুমাত্র জানতে পেরেছিলেন কারকারে হয়তো সিএসটি-তে রয়েছেন কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো তথ্য ছিল না। এই বিষয়টি থেকে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে—

১. হেমন্ত কারকারের ওয়্যারলেস অপারেটর নীতিন মাথানে ১৬/১১ হামলার মামলায় বিশেষ আদালতের শুনানিতে জানান, রাত দশটা নাগাদ কারকারের দাদরের বাড়ি থেকে তিনি, কারকারে ও তার দলের পাঁচজনকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সিএসটি-র হজ হাউসে আসার পর, কারকারে তার সিনিয়র অফিসার ভসন্ত কোরেগাঁওকর, সঞ্জয়

মোহিতে ও কেপি রঘুবংশীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা কারারেকে জানায়, সিএসটি-তে জঙ্গিরা গুলি চালিয়েছে। এখন তারা ফুট ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। (কিন্তু পর্ব ৯-এর ৩-এ দেখতে পাবেন, ওই দুই জঙ্গি ফুট ওভারব্রিজে ওঠেইনি) মাথানে কারকারেকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ও টুপি পরে নিতে বলেন। তিনি সিএএমএ হাসপাতালের পেছনের গেটের দিকে এগিয়ে যান। (এই রাস্তা ধরেই ফুটব্রিজে ওঠা যায়) গুলি চলাকালীনই ওই টিমের সঙ্গে (সিএএমএ হাসপাতালে) যোগ দেন কমতেও সালাসকর। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৬ জুলাই ২০০৯)

ওপরের ঘটনা বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে দেয়—

- হজ হাউসে দেখা করার কথা যারা বলেছিল, সেই অফিসাররা কারা?
- কেন কেপি রঘুবংশী কারকারেকে বলতে গেলেন যে ফুটব্রিজের ওপর দিয়ে দুই সন্ত্রাসী যাচ্ছে, যেখানে এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি? কেনো সে নিজে এগিয়ে গেল না?

২. যেখানে একে অপরকে কভার করতে করতে কারকারে, কামতে, মোহিত ও সালাসার সতর্কভাবে ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন (দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া লেন), সেখানে কামা হসপিটালের দুটো বাড়ির সংযোগস্থলে ছতলায় দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটে। মোহিতে সেই দিকে ছুটে যান! কানা হসপিটালে সন্ত্রাসীদের গুলিতে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। কারকারে, কামতেও সালাসকার যখন পেছনের গেট থেকে বিষয়টি দেখতে পান, তখন আরেক দিক থেকে স্পেশাল ব্রাঞ্চও পাল্টা গুলি চালাচ্ছিল। তারা এগিয়ে যাওয়ার সময়ই পাইনি এসিপি-র কোয়ালিশ গাড়িটি তাদের পেছন দিক থেকে আসে...(*লোকমত*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর ২০০৮)

৩. (শ্রীমতি কামতের বই *টু দ্য লাস্ট বুলেট* থেকে এটা এখন পরিষ্কার, যে সন্ত্রাসীরা এসবি অফিসের দিক থেকে অশোক কামতের গাড়ির দিকে (তিনি তখন গাড়িতে ছিলেন না) গুলি চালাচ্ছিল। গাড়িটি ডগ স্কোয়াডের অফিসের সামনে রাখা ছিল। কোনো খাতাতেই গুলির সঠিক সময় সম্পর্কে কিছু লেখা ছিল না। যদিও শ্রীমতি কামতে মোটামুটি ভাবে ধরে নিয়েছিলেন, সম্ভবত বারোটা ছয় নাগাদ গুলি চলে। রঙ্গভবন লেনে কোয়ালিশ লক্ষ্য করে যে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, এই ঘটনা তার

ঠিক পরেই। জরগ নামে গাড়ির ড্রাইভার বা গাড়ির অপারেটর প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে কন্ট্রোল রুমে ফোন করেছিলেন। ওই ফোনের সময়টা ধরেই মোটামুটি একটা আন্দাজ করা হয়েছে। কিন্তু লোকমতের রিপোর্ট অনুযায়ী, রঙ্গভবন লেনের গুলি চালনার ঘটনার আগেই কামতেদের ওখানে গুলি চলে। এই তত্ত্ব বেশ যুক্তিগ্রাহ্যও বটে।)

৪. কন্ট্রোল রুম বারোটা এক মিনিট নাগাদ পিটার ডিবিমার্গে (সিনিয়র ইন্সপেক্টর ডিবি মার্গ পুলিশ স্টেশন) ফোন করে। ইন্সপেক্টরকে মেট্রো সিনেমায় আসতে বলা হয়। কারণ লাল রঙের গাড়িতে তিনজন সন্দেহভাজন জঙ্গি মেট্রো সিনেমার কাছে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছিল। (*টু দ্য লাস্ট বুলেট*, পৃ ৪৭)

৫. দুই স্থানীয় বাসিন্দা রঙ্গভবন লেনের কথা কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানান। তারা তাদের মোবাইল থেকেই বারোটা পাঁচ নাগাদ ফোন করেন। তিপ্পান্ন সেকেন্ড কথা হয় (*টু দ্য লাস্ট বুলেট*, পৃ ৫৬)। সুতরাং বারোটা দুই থেকে চারের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে।

ওপরে যেভাবে পর পর ঘটনাগুলোর কথা বলা হলো, তা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার, কামড়ে ও সালাসকারকে সঙ্গে নিয়ে *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ভবনের পাশের রাস্তা দিয়ে গিয়ে যখন কারকারেরা কাম হসপিটালের পেছনের গেটে পৌঁছান, তখন এসবি অফিসের দিক থেকে গুলি ছুড়ে কারকারেদের নজর ঘোরানো হয়। এর ফলে তারা যখন এসবি অফিসের কাছে রঙ্গভবন লেনের টি আকৃতির জায়গায় পৌঁছেন, তারা তখন কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠিয়ে দেন, জঙ্গিরা মেট্রো সিনেমার কাছে একটি লাল রঙের গাড়িতে রয়েছে। কারকারে, কামতে ও সালাসকারের মতো অফিসারদের কাছ থেকে বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ডিবি মার্গের পুলিশ নিশ্চয়ই ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। কারণ ঘটনাস্থল তাদের একদম কাছেই ছিল। আর তাছাড়া তারা আরও শর্টকাটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যায়। ঠিক এভাবেই হেমন্ত কারকারে ও অন্যান্য অফিসারদের কায়দা করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে আসা হয়, এবং রঙ্গভবন লেনে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে খুন করা হয়। জঙ্গিরা ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে সেখানে অপেক্ষা করছিল বলে শ্রীমতি কামতের বইয়ে বলা হয়েছে।

ওপরের ঘটনাগুলো একটু বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কেউ একজন ওই তিন অফিসারের ওপর নজর রাখছিল। এবং সেই কীভাবে কোথায় কী করা হবে, সেটা ঠিক করে দিচ্ছিল। নীচের কিছু প্রশ্নের ঠিকমতো তদন্ত হওয়া প্রয়োজন—

১. কন্ট্রোল রুমে সেন্ট জর্জ সিনেমার কাছে একটি লাল গাড়ি রয়েছে বলে প্রথমে খবর আসে। কে এই খবরটি দিল? দ্বিতীয়ত মেট্রো সিনেমার কাছে যে গাড়ি আছে, সেটাই বা কে জানাল?

২. শ্রীমতি কামতে যে সময়ের কথা বলছেন, ওই সময়ের মধ্যে এসবি ২ অফিস এবং কামা হাসপাতালের পেছনের গেটের কাছের বিল্ডিং-এ কোন কোন সিনিয়র অফিসার ছিল? কার নির্দেশে তারা সেখানে গিয়েছিল? তাদের কী কাণ্ড করতে বলা হয়েছিল? তারা কোন জায়গায় রয়েছে, সেটা কি কন্ট্রোল রুম জানত?

পর্ব ৮

২০১৬ সালের আগেই নেপালের কাঠমান্ডুতে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছিল আজমল কাসভ

১. *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮

১. আইনজীবী সিএম ফারুক দাবি করেন, মুম্বাই হামলায় জীবিত অভিযুক্ত আজমল কাসভকে ২০০৬ সালে নেপালী গোয়েন্দা বাহিনীর সহায়তায় কাঠমুন্ডু থেকে গ্রেফতার করে ভারতীয় গোয়েন্দারা। রাওয়ালপিন্ডি থেকে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে *দ্য নিউজ*।

২. আইনজীবি সিএম ফারুক দাবি করেন, আজমল কাসভসহ ২০০ জনকে ২০০৬-এর আগে গ্রেফতার করে নেপাল পুলিশ। এই নিয়ে কাসভ নেপালের সুপ্রিম কোর্টে আবেদনও করেছিল। সে আবেদনের উত্তরদাতাদের মধ্যে ছিল নেপালী পুলিশ ও ভারতের হাইকমিশন।

৩. পাকিস্তান ও ভারত সরকারকে এই নিয়ে ফারুক চিঠি লেখেন, এবং নেপালে এই নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনও করেন।

৪. *দ্য নিউজ*-এর রিপোর্ট আরও জানায়, যারা গ্রেফতার হয়েছিল, তারা সবাই বৈধ কাগজপত্র নিয়েই নেপালে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় গোয়েন্দাদের স্বভাবই হলো নেপাল থেকে পাকিস্তানিদের গ্রেফতার করে এনে, মুম্বাই হামলার মতো ঘটনায় তাদের জড়িয়ে দেওয়া।

২. *লোকমত*, কোলহাপুর, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৮

এই বিষয়ে বলতে গিয়ে নেপালের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানান, এরকম কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ভারতীয় গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তেমন কোনো তথ্য সরকারের কাছে নেই।

৩. *সকাল*, পুনে, ২১ ডিসেম্বর ২০০৮

১. নেপালের বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে বলা হয়, সে দেশ থেকে কাসভকে গ্রেফতারের ঘটনা ভুয়া। নেপালকে বদনাম করার জন্য এই রিপোর্ট পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম করেছিল।

২. বিদেশমন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়, কাসভকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে পাকিস্তানি আইনজীবির আবেদন খারিজ করা হলো।

৩. আইনি প্রক্রিয়া ঠিকমতো চালাতে না পারার জন্যই এই আবেদন খারিজ করা হলো।

রিপোর্টের বিশ্লেষণ

নেপালের স্বরাষ্টমন্ত্রক কিন্তু একবারও বলেনি কাসভকে গ্রেফতারির ঘটনা অসত্য। তারা বলেছিল, এরকম কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। কিন্তু নেপালের বিদেশমন্ত্রকের বয়ান আবার পরস্পরবিরোধী এবং বিভ্রান্তিকরও বটে। একদিকে তারা কাসভকে গ্রেফতার করার ঘটনা অস্বীকার করছে, অন্যদিকে আবার বলছে, কাসভকে মুক্তি দেয়ার আবেদনপত্র খারিজ করা হয়েছে এবং তার জন্য তারা এও বলছে, যে আইনি প্রক্রিয়া ঠিকমতো হয়নি, সে কারণে তাকে ছাড়া যাবে না।

উপসংহার

আজমল কাসভ নেপালী পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়, এবং তাকে ভারতীয় গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দেয়া নিয়ে সন্দেহ করার অনেক কারণ আছে। নেপালের রাজা ও ভারতের ব্রাহ্মণাবাদী শক্তির মধ্যে বেশ ভালোই সম্পর্ক। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিরাই তো দেশের সংবিধানকে ধ্বংস করে 'হিন্দু রাষ্ট্র' (পড়ুন ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র) বানানোর চেষ্টায় থাকে। অন্তত এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারের তদন্তে তো সেরকমই উঠে এসেছিল। সে কারণেই নেপালে কাসভকে গ্রেফতার করে, তাকে ভারতের গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি অযৌক্তিক কিছু নয়।

বধওয়ার পার্কে যে সব জঙ্গিরা নেমেছিল, তাদের মধ্যে কাসভ ছিল না এমনতর যে তত্ত্ব, তা আরও শক্তপোক্ত হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দার (অনিতা রাজেন্দ্র উদ্যয়া) বয়ানে। তিনি জানান, এয়ার বোটে করেই ছয়জন সেখানে আসে পরে জে জে হাসপাতালে সেই ২ জনেরই দেহ শনাক্ত করেন তিনি। (*পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* ১৪ জানুয়ারি, ২০০৯)

অনিতা উদ্দয়াকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো হয়নি, কিন্তু তার বিরুদ্ধেই উল্টো তদন্তকারীদের ভুল পথে চালিত করার অভিযোগ আনা হয়েছিল সংবিধানের ১৮২ ধারায়। সম্ভবত তিনি সত্যিটাতেই অবিচল ছিলেন, এবং কাফে প্যারাডের বধওয়ার পার্কে নামা সেই দলের মধ্যে কাসভও ছিল, এমনটা মানতে তিনি রাজি না হওয়ার কারণেই এই শাস্তি।

পর্ব ৯
আজমল কাসভের বহুল প্রচারিত যে ছবি

সিএসটি-র সাবআর্বান সেকশনে আজমল কাসভের প্রথম ছবিটি তুলেছিলেন মুম্বাই মিররের ফটোগ্রাফার সেবাস্টিয়ান ডিসুজ। মুম্বাই মিররে যা প্রকাশিত হয় ২৭ নভেম্বর ২০০৮-এ, হামলার ঠিক পরের দিনই। এবং তারপরেই এই ছবি প্রায় প্রত্যেক সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে। কাসভের এই নিয়ে যে দাবি, তা প্রমাণ হওয়ার আগে কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া প্রয়োজন।

১. মারাঠি দৈনিক *পুধারিতে* ২৮ নভেম্বর ২০০৮-এ একটি ছবি প্রকাশ হয়। তারা জানিয়েছিল সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পাওয়া কাসভের ছবি। অথচ সেবাস্টিয়ানের ছবিটাও সেই একই ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে, একই ব্যাকগ্রাউন্ডে। এটা কী করে সম্ভব? টেকনিক্যালিই এই ছবি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে। ২০০৯-এর ৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় সাহারার বিশেষ সংখ্যায় দাবি করা হয়, দেখে মনে হচ্ছে এই ছবিটি জাল। সিএসটি-র মতো স্টেশনে ক্যামেরা লাগানো থাকলে তার অ্যাঙ্গেল আরও ছড়ানো থাকবে। কারণ অনেকটা অংশ নজরদারির আওতায় আসা প্রয়োজন। কিন্তু কাসভের এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল বেশ সরু। এবং তা অনেকটাই নিচের দিকে। সিএসটি-র মতো স্টেশনে সিসিটিভি এতটা নিচে এত কম জায়গায় নজরদারি চালানোর জন্য রাখা হয় না।
২. ২৮ নভেম্বর ২০০৮-এ ডিএনএ মুম্বাই দাবি করে, স্টেশনে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগানো ছিল, তাতে দুজন জঙ্গির ছবি ধরা পড়েছে। পরে জানা যায় সেই দুজন আজমল আমীর কাসভ এবং আবু দেরা ইসমাইল খান। এটা কি আদৌ সত্যি? তাই যদি হয় তাহলে কোথায় সেই ফুটেজ?
৩. সিএসটি-র গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী, স্টেশনেরই খাবারের দোকানের ম্যানেজার শশীকুমার সিং। তিনি বলেন, জঙ্গিরা চিৎকার করছিল, কিন্তু

তাদের মুখ যেহেতু কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল, তাদের আওয়াজ চাপা শোনাচ্ছিল। (*পুনে মিরর*, ২৮ নভেম্বর ২০০৮)

৪. *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২৯ নভেম্বর ২০০৮-এর ইস্যুতে যে আজমল (অথবা আজম) কাসভের যে ছবি বেরিয়েছিল, সে ছবির কোনো কৃতিত্ব দাবি করেনি কেউ। সামনে তিরিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি কোণা করে ছবিটি তোলা হয়। এটা কি আদৌ সম্ভব, যে ওই মুহূর্তে মরিয়া জঙ্গিদের সামনে কেউ ওভাবে ছবি তুলছেন, আর জঙ্গিরা তাকে রেহাই দিয়েছে? যদিও বা জুম করে তোলা হয়, তাহলেও?

৫. হামলার পরের দিন ২০০৮, ২৭ নভেম্বর, সামনে থেকে তোলা একটু উঁচু থেকে কাসভের আরেকটা ছবি প্রকাশ হয়েছিল মারাঠি দৈনিক *মহারাষ্ট্র টাইমসে*। টাইমস ইন্ডিয়া গ্রুপের শ্রীরাম ভারনেকা বলে একজন ফটোগ্রাফার ওই ছবি তুলেছিলেন বলে দাবি করা হয়। কিন্তু ওই একই দিনে, একই ছবি মারাঠি *দৈনিক লোকমত*-এও প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রের জগতে বিপক্ষ দুই শিবির কী করে এহেন এক্সক্লুসিভ ছবি প্রকাশ করে দিতে পারে?

৬. ৩ ডিসেম্বর, ২০০৮-এ আরেকজন জঙ্গির (ইসমাইল খান) ছবি প্রকাশ করে পুনে মিরর। যদিও ফটোগ্রাফারের নাম তাতে দেওয়া ছিল না।

৭. সবথেকে গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার, সিএসটি-র মেইন লাইন সেকশনে হত্যালীলা চালাল যে জঙ্গিরা, ১৬টি সিসিটিভি ওই দিনই খারাপ হলো বলে তাদের কোনো ছবিই ধরা পড়ল না। অন্যদিকে তিনদিন ধরে অবরুদ্ধ করে রাখা তাজ, ওবেরয় ও নরিম্যান হাউসে থাকা জঙ্গিদের ভিডিও ফুটেজ কিন্তু পাওয়া গিয়েছিল। কারণ সেই সব জায়গায় সিসিটিভি ঠিকঠাক কাজ করছিল। ঘটনা যখন ঘটল তখন সিএসটি-র দুই আততায়ীর ছবি তুলে নিল অকুতোভয় চিত্র সাংবাদিকরা। তারা আদৌ যা দাবি করছে তা সত্যি কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। কারণ এর সাথে সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে দেখার তো কোনো ব্যাপারই নেই। আর তাছাড়া বেশ কিছু স্ববিরোধিতাও এইসব দাবির মধ্যে থেকে গেছে বলে আমরা দেখলাম। কিন্তু পুলিশ ওই ছবিগুলো নিয়েই দালালি শুরু করেছিল। তারাও বলছিল, ওই সব ছবিই আসল জঙ্গিদের ছবি। গোটা বিশ্বের কাছে সন্ত্রাসবাদের মুখ হয়ে উঠেছিল ছবিগুলো। বিশেষ করে জীবিত যাকে ধরা হয়েছিল, তার ছবি টিভি আর সংবাদপত্রের দৌলতে ছড়িয়েছিল গোটা বিশ্বে, সন্ত্রাসবাদের মুখ হিসেবে।

অন্যদিকে, তাজ ও অন্যান্য জায়গায় যে আটজন বা তার বেশি জঙ্গি তাণ্ডব চালিয়েছিল, তাদের ছবি কিন্তু সিসিটিভি-তে ধরা পড়েছিল। অথচ তাদের সেইসব ছবি কিন্তু জনসমক্ষে আর আনা হয়নি। আইবি, মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও সরকার আসলে লুকোচ্ছে কি? তবে কি কোনো মিথ্যেকে সত্যি বলে চালানোর চেষ্টা ছিল? যদি তাই হয়, তাহলে কেনো?

সিদ্ধান্ত

যেখানে অভিযুক্ত জঙ্গি ইতিমধ্যেই আইবি-র হেফাজতে রয়েছে, সেখানে তার ছবি ঘটনার আগে বা পরে তোলা কোনো ব্যাপার নয়। এটা হতে পারে যে তাদের ছবি স্টেশন খালি হওয়ার পর মাঝরাতে বা তার পরে নেওয়া হয়ে থাকবে। দ্বিতীয়ত, ফটোগ্রাফারদের এটা বোঝানো খুব একটা কঠিন নয়, যে একজনকে জীবন্ত পাকড়াও করা হয়েছে, তাই কিছুটাতো গোঁজামিল দেওয়া যেতেই পারে। মামলাকে আরও শক্তপোক্ত করতে এরকম একটা ব্যাপার নিজেদের মধ্যে ঠিক করা যেতেই পারে, যে গুলি চালানোর সময়েই এই ছবি তোলা হয়েছে। ফটোগ্রাফাররা নেহাতই ভালো মনে বিষয়টিকে মেনে নেবেন। কিন্তু তারা বুঝতেও পারবেন না, এর পেছনে কতটা বড়সড় চক্রান্ত লুকিয়ে রয়েছে।

পর্ব ১০

একজন মহিলা প্রত্যক্ষদর্শী, যাকে জোর করে জেরার জন্য আমেরিকা নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি

১. *পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৪ জানুয়ারি ২০০৯

১. সাতচল্লিশ বছর বয়সী অনিতা রাজেন্দ্র উদ্যয়া। তিনি ২৬ নভেম্বরের সন্ধ্যা বেলায় মুম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে জঙ্গিদের আসতে দেখেছিলেন। আমচকাই রবিবার সকালে তার বাড়ি থেকেই তিনি উধাও হয়ে যান। অনিতার মেয়ে সীমা কেতন যোশী পুলিশের কাছে নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশিও চালায়।

২. হামলার দিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ অনিতা তার বাড়ি মহাত্মা ফুলে নাগর, কাফে পারাডে, বধওয়ার পার্কে একটি খালি নৌকায় বসেছিলেন। তখনই তিনি ছয় জন জঙ্গিকে নামতে দেখেন। এই রকম

অস্বাভাবিক একটা জায়গা দিয়ে কেনো তারা এসেছে তা নিয়ে অনিতা প্রশ্নও করেছিলেন। কিন্তু তাকে জঙ্গিরা হুমকি দিয়ে চলে যায়।

৩. কয়েকদিন পর অনিতাকে মৃত জঙ্গিদের শনাক্তকরণের জন্য জে জে হাসপাতালে নিয়ে যায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তিনি ওই ছয় জনকেই চিনতে পারেন এবং শনাক্ত করেন।

২. *পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৫ জানুয়ারি ২০০৯

১. রবিবার থেকে নিখোঁজ অনিতা রাজেন্দ্র আমেরিকায় থাকতে পারেন বলে, মঙ্গলবার জানালেন তার মেয়ে সীমা কেতন যোশী।

২. সীমা খবরের কাগজের সাংবাদিকদের জানান, তার মা নিখোঁজ হওয়ার আগে মার্কিন গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন! সাহায্য করলে অনিতাকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল।

৩. যেভাবে অনিতা দোষীদের শনাক্ত করেছিলেন, তাতে মার্কিন গোয়েন্দারা বেশ খুশিই হয়েছিলেন। যেভাবে ওই ছয়জনের বিবরণ তার মা দিয়েছিলেন, তাতে তারা অবাক হয়ে যায় বলে জানায় সীমা।

৪. অনিতা মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসারদের সঙ্গেও কথা বলেন।

৫. গত ১৫ দিন ধরে তার মায়ের নানারকম শারীরিক পরীক্ষা চলছিল। তারপর একদিন আচমকা তিনি এসে বলেন, আমি আমেরিকা যাব, আমার ব্যাগ গুছিয়ে দাও। সীমা জানান, তিনি নিজে মায়ের ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর রবিবার সকাল সাড়ে ছটায় অনিতা বাথরুমে যান। (অথবা বাথরুমে যাওয়ার নাটক করন) সীমার দাবি তার প্রতিবেশিরা দেখেন, একটি বড় জিপ বাথরুমের সামনে আসে। পুলিশরা নেমে তাঁকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

৩. *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ১৭ জানুয়ারি ২০০৯

১. মুম্বাই হামলায় সন্ত্রাসীদের দেশে আসা নিয়ে অনিতা ছিলেন সম্ভাব্য একজন সাক্ষী। যিনি বৃহস্পতিবার নাগাদ নিজের নিখোঁজের ব্যাপার নিয়ে বলেন, তাঁকে আমেরিকায় একটি আদালতে হাজির করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও তিনি যা বলেছিলেন, পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়েছিল মুম্বাই পুলিশ।

তিনি বলেন, তাঁকে চারজন মিলে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে সোজা আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে হাজিরার জন্য। কাজ মিটে গেলে আবার ফেরতও দিয়ে যায় তারা।

তার দাবি ছিল, তিনি আমেরিকা সফরটাকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন।

২. ইমিগ্রেশন অফিসে তদন্ত করে অনিতার দাবিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করে পুলিশ। অনিতার কোনো পাসপোর্ট ছিল না, তিনি কখনো ওই দেশে আগে যাননি।

৩. অনিতা জানান, ওই ব্যক্তিদের সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তাদের কি কাজ কিছুই জানা নেই। কিন্তু তার কাগজপত্র সমস্তকিছু তারাই ঠিক করে দিয়েছিল।

অনিতা জানান, ওই চারজন, তিনজন বিদেশি ও একজন ভারতীয় ছিল অনুবাদক হিসেবে। তারা আমার জবানবন্দি রেকর্ড করতে চাইছিল। তারা জানিয়েছিল, তারা আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থা থেকে আসছে। এবং তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ওখানে গিয়ে আমার এই জবানবন্দিটাই আবার যেনো আমি দিই।

তারা আমাকে শনিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ ফোন করে বলে রাতে তৈরি থাকতে। সারারাত অপেক্ষার পরেও তারা আসেনি। সকালে তারা আসে। সকালেই সরাসরি আমাকে তারা গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। আমাকে বাড়ির লোকদের জানানোর জন্য ভেতরেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

আমি ভেবেছিলাম কয়েক ঘণ্টা যেতে লাগবে বুঝি, কিন্তু পরে দেখলাম তা আঠারো কুড়ি ঘণ্টারও বেশি।

অনিতা জানান, আমাকে একটি আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমাকে আলাদা জামাকাপড় দেওয়া হয় বিচারকের সামনে আমার বক্তব্য নেওয়া হয়। এরপর আমাকে একটি হোটেলে রাখে তারা। তারপরেই আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি তারা আমাকে ৫০০ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েছিল।

৪. *পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯

১. অনিতা রহস্যজনক ভাবে রবিবার সকালে উধাও হয়ে যান। এমনভাবে তিনি বেপাত্তা হয়ে যান যে তার মেয়েকে নিখোঁজ ডাইরি করতে হয়েছিল। আবার বুধবার ভোরে রহস্যজনক ভাবেই তিনি ফিরে আসেন।

২. অনিতা বলেন, আমি নিখোঁজ মোটেই হয়নি। আমি স্বামীকে জানিয়েছিলাম যে কয়েকজন বিদেশি আমার সঙ্গে ১৭ নভেম্বর থেকে

যোগাযোগ রাখছে। তারা আমার ঘটনা শুনেছে। তারা আমাকে যখন বলেছিল বাইরে নিয়ে যাবে, তার আগে আমার সাথে তারা তিনবার দেখাও করে। আমি তাদের সাহায্য করতে চেয়েছি, সে কারণেই বলেছি ঠিক আছে, যাব।

৩. ২৭ নভেম্বর কেমন করে অনিতার সঙ্গে সেই ছয় জঙ্গির দেখা হলো, তাদের মধ্যে কী কী কথা হলো, এই সব নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হয় ইন্ডিয়া টিভিতে। এরপরেই ওই তিনজন বিদেশি অনিতার সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের সঙ্গে ছিল একজন ভারতীয়, অনুবাদক। অনিতা তাকে সুধাকর বলে ডাকছিলেন।

৪. ক্রাইম ব্রাঞ্চেও তিনি তার বয়ান দেন বলে জানান অনিতা।

৫. বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে তাঁকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

৬. রবিবার সকালে তাঁকে বলা হয়, কোনো কিছু না নিয়ে, বাথরুমে যাওয়ার নাম করে বাড়ির বাইরে বেরোতে। কিছুটা দূরে একটি ভ্যান তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। যাওয়ার পথে তার স্বামীর সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়েছিল। অনিতার স্বামী সেন্ট জর্জ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

৭. অনিতা জানান, এরপর আমরা আন্ধেরি এয়ারপোর্টে গেলাম সেখানে আমাকে স্কার্ট, ব্লাউস ও স্কাফ পরতে দেওয়া হয়। এরপর আমরা প্লেনে উঠে পড়ি। নীল সাদা একটা প্লেন, লেজের কাছে তারা! অনেক বড় একটা প্লেন ছিল। কিন্তু তার মধ্যে ছিল মাত্র গোটা পনেরো জন।

৮. আমরা যখন পৌঁছুই তখন রাত। সিকিউরিটি চেক পার করে আমি বেরোলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। রাস্তাঘাটে খুব একটা ভিড় ছিল না। অনেক বড় বড় বাড়ি দেখলাম আমি, জানান অনিতা।

৯. অনিতা এরপর আরও বলেন, পর দিন সকালে একটা বড় বাড়িতে গেলাম। সেখানে প্রায় জনা তিরিশ জন মিলে তাকে নানান প্রশ্ন করতে থাকল। কখন সন্ত্রাসবাদীরা এসেছিল, কেমন দেখতে ছিল, কী পরেছিল, এই সব।

১০. এরপর অনিতাকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

১১. আমি যখন মুম্বাই ছেড়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের একটা বড় ঘরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ফেরার সময় আরও বড় প্লেনে আমি ফিরেছি বলে জানান অনিতা।

১২. অনিতা মুম্বাইয়ে নামেন সন্ধে ৬টা নাগাদ। এরপর একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। রাতের খাওয়ার পর ট্যাক্সি ডাকা হয়, তার হাতে পাঁচশো টাকা ধরিয়ে দেওয়া হয় আর রাস্তা বুঝিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলা হয় অনিতাকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসতে।

৫. *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* **পুনে, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯**

১. শুক্রবার মুম্বাই হামলার সাক্ষী অনিতার বিরুদ্ধে, তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগে ১৮২ ধারায় জামিন অযোগ্য মামলা দায়ের করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

২. জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রাকেশ মারিয়া বলেন, যা বলা হচ্ছে, মুম্বাই হামলার মূল প্রত্যক্ষদর্শী অনিতা মোটেই নন। মারিয়া সাফাই দেয় যে সে বুঝতে পারছে না, কেনো কোনো গোয়েন্দা সংস্থা মুম্বাই পুলিশকে না জানিয়ে তাঁকে আমেরিকা উড়িয়ে নিয়ে যেতে যাবে। কারণ মুম্বাই হামলার তদন্তটা করছে মুম্বাই পুলিশ।

৬. *সকাল,* **পুনে ১৯ জানুয়ারি, ২০০৯ (পিটিআই সূত্রে খবর)**

১. মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলার তদন্তের জন্য কাউকেই ভারতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলে জানিয়ে দেয় এফবিআই।

২. অনিতা যেরকম দাবি করছেন, যে তিনি ছয় জঙ্গিকে দেখেছেন, তারপর সেসবের তদন্তে তিনি আমেরিকা ঘুরে এসেছেন, তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই কারণ তার পাসপোর্ট পর্যন্ত নেই।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ

১. অনিতা রাজেন্দ্র স্পষ্ট দেখেছিলেন, একটি ডিঙি নৌকা থেকে ছয়জন জঙ্গি নেমেছিল। অনিতা তাদের সঙ্গে কথাও বলেছিল। (*পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৪ এবং ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

২. ২৭ নভেম্বর *ইন্ডিয়া টিভি*-তে তার সাক্ষাৎকার দেখার পর তিনজন বিদেশি (এফবিআই অফিসার) এবং একজন ভারতীয় তার সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছু প্রশ্ন করে। (*পুনে মিরর* এবং *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

৩. অনিতাকে বার তিনেক জেরা করা হয়। যেভাবে অনিতা লোকজনকে চিনতে পারতেন, সেই চেনার ক্ষমতায় তারা বেশ খুশিই হয়েছিল। এবং তারপর তারা তাঁকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে

তার বয়ানের রেকর্ডিং-এর কথা ভাবা হয়। অনিতা তাতে রাজিও ছিল। এরজন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলা হয় তাঁকে। (*পুনে মিরর*, ১৫ এবং ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

৪. ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা জে জে হাসপাতালে তাঁকে জঙ্গিদের মৃতদেহ শনাক্ত করায়। অনিতা ওই ছয়জনকে কোনো রকম সন্দেহ ছাড়াই দ্ব্যর্থহীনভাবে চিনতে পেরেছিলেন। (*পুনে মিরর* ১৪ জানুয়ারি, ২০০৯)

৫. মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ তার জবানবন্দিও নেয়। (*পুনে মিরর*, ১৫ এবং ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

৬. সন্দেহজনক নামে তার বাইরে যাওয়ার নথিপত্র তৈরি হয়ে যায়। ১১ জানুয়ারি ২০০৯ তাঁকে আমেরিকা নিয়ে যাওয়া হয়। সম্ভবত প্রাইভেট প্লেনে করে তাঁকে সকালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (*পুনে মিরর*, ১৫ এবং ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

৭. আইবি-র আওতায় কিন্তু অভিবাসনের বিষয়টিও রয়েছে। তা ছাড়াও যেখানে মুম্বাই পুলিশ ও এফবিআই জড়িত, সেখানে কোনো ভাবেই নকল কাগজপত্র বানানো অসম্ভব কিছু নয়। ধরা পড়ারও কোনো রকম সম্ভাবনা ছিল না।

৮. আমেরিকায় তার বক্তব্য হয় বিচারপতি নয়তো সিনিয়র পুলিশ অফিসার রেকর্ড করেছিল। বক্তব্য রাখার সময় তার মুখ ঢাকা ছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে এবং *পুনে মিরর*, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

৯. সার্ভিস প্লেনে করে ১৩ জানুয়ারি ২০০৯, সন্ধেবেলা তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। (*পুনে মিরর*, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

১০. অনিতা সব সত্যি কথাই বলেছিলেন। ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও এফবিআই-এর কোনো চাপের কাছে তিনি মাথা নোয়াননি।

১১. অতএব,

- সংবিধানের ১৮২ ধারায় তদন্তকারীদের বিভ্রান্তির অভিযোগ এনে অনিতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)
- অনিতাকে কথা মতো ৫ লক্ষ টাকা মোটেই দেওয়া হয়নি। ৫০০ টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। (*পুনে মিরর*, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯, *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)
- অনিতাকে যে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, দোষী বিবেকের কারণে ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও এফবিআই দুই সংস্থাই সেটা

অস্বীকার করে। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯, *সকাল*, পুনে, ১৯ জানুয়ারি ২০০৯)

- আদালতে হয়তো অনিতা পুরো ঘটনাই এদিক ওদিক করে দিতে পারতেন। সেই আশঙ্কা থেকেই মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানায়, মুম্বাই হামলার মূল প্রত্যক্ষদর্শী তিনি মোটেই নন। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯)

ওপরের ব্যাখ্যাগুলোর যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহার

১. সমুদ্র তীরে নামার সময় ওই ছয় জঙ্গিদের পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন অনিতা রাজেন্দ্র। সেই কারণেই পরে নিঃসংশয় ভাবে তিনি জঙ্গিদের দেহ থেকে শনাক্ত করেছিলেন। এফবিআই ও ক্রাইম ব্রাঞ্চকে অনিতা ঠিকঠাক তথ্যই দিয়েছিলেন। কিন্তু এফবিআই ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ (পড়ুন আইবি) তার জন্য জঙ্গিদের চেহারা ও সংখ্যা নিয়ে যে বয়ান ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাতে তিনি সায় দেননি, কোনো চাপের কাছেই মাথা নীচু করেননি। কয়েকজন সন্ত্রাসী যাদের তিনি দেখেননি, তাদের দেহও শনাক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। অনিতা রাজি হননি। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এই সব কারণের জন্য মূল সাক্ষীদের তালিকা থেকে তার নাম শুধু বাদ তো দেওয়া হলোই, উল্টো তার বিরুদ্ধেই মামলা ঠুকে দেওয়া হলো।

২. ক্রাইম ব্রাঞ্চ চার্জশিটে দেখিয়েছিল, রাবার শিটের ডিঙি করে দশজন জঙ্গি মুম্বাই এসেছিল। এরমধ্যে দুজন হোটেল ওবেরয়ের দিকে এগিয়ে যায়। আটজন নামে, বধওয়ার পার্কের উল্টো দিকে ভাই ভাণ্ডারকর মাছিমার কলোনি এলাকায়। অথচ গোটাটাই মিথ্যে। কারণ ওই এলাকায় নেমেছিল ছয়জন জঙ্গি।

পর্ব ১১

মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের গল্পে বিস্তর ফাঁকফোকর

তদন্তের এমন বহু তথ্য বাতিল, পাল্টে দেওয়া, মনগড়া কিছু তথ্য আমদানি করা, অনেক তথ্য চেপে যাওয়া, কুকীর্তি করতে গিয়ে নানান জিনিস জটিল করে ফেলার মতো বিষয় ছাড়াও গল্পে বিস্তর ফাঁকফোকর রয়েছে। বিশেষ করে আইবি-র নির্দেশে ক্রাইম ব্রাঞ্চ যে সিএসটি-সিএএমএ-র গল্প ফেঁদেছিল, তা বিশ্বাস করা কিন্তু বেশ কঠিন।

আইবি আর ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাদের নিজেদের গল্প ফাঁদার আগে, ঘটনার পর পরই, সংবাদমাধ্যমগুলোতে খবরদারি চালানোর আগে যে খবরগুলো বেরিয়েছিল সেই সব যদি আমরা দেখি, তাহলে কিন্তু বানানো গল্প ধোপে টেকে না।

১. সিএসটি-সিএএমএ-তে গুলি চালানোর সময়

ক্রাইম ব্রাঞ্চ মুম্বাই জনসাধারণকে যা বুঝিয়েছিল তার সঙ্গে একটা বিষয় মিলছে না। সিএসটি-তে গুলি চালানো থামার পর সিএএমএ হাসপাতালে গুলি চালানো শুরু হয়েছিল। কিছুসময় দুজায়গাতেই একসঙ্গে গুলি চলে। রঙ্গভবন লেনে তিনজন পুলিশ অফিসার ও কিছু পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত সিএএমএ হাসপাতালে গুলি চলে। এমনকি সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের তথাকথিত এনকাউন্টারে মৃত্যু হওয়া পর্যন্তও সেখানে গুলি চলতে থাকে। এই নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরের কাগজের প্রতিবেদনে চোখ রাখা যাক,

১. সিএসটি-তে গুলি চালানো শুরু হয় রাত ৯.৪৫-এ। সিএএমএ হাসপাতালে রাত ১০.৪০-এ। সিএসটি-তে গুলি চালানো থামে রাত ১০.৫০-এ (*মুম্বাই মিরর*, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)
২. সিএসটি-তেরাত ৯.৫৫ নাগাদ গুলি চালানো শুরু হয়ে চলে রাত ১১টা পর্যন্ত। (*সকাল*, পুনে, ২৮ নভেম্বর ২০০৮)
৩. সিএসটি-তে রাত ৯.৩০ নাগাদ গুলি চালানো শুরু হয়। শেষ হয় রাত ১১টায়। সিএএমএ হসপিটালে গুলি চালানো শুরু হয় রাত ১০.৩০ নাগাদ, শেষ হয় ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর, ২০০৮)
৪. পুলিশ রেকর্ড (লগবুক) অনুযায়ী, ২৬ নভেম্বর রাত ১০.২৯ থেকে ২৭ নভেম্বর সকাল ১২.১১ পর্যন্ত কামা হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায় ২৪টি পুলিশ দলকে পাঠানো হয়েছিল। (*সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া*, মুম্বাই, ২৯ নভেম্বর ২০০৯) এই বিষয়টি থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কামা হাসপাতালে ১০.২৯-এর আগে থেকে গুলি চালানো শুরু হয়েছিল।
৫. সিএএমএ হাসপাতালের বারান্দায় দুই জঙ্গি পৌঁছে গিয়েছিল রাত ১টা নাগাদ। তখন সেখান থেকেই গুলি চালানো শুরু করে তারা। (*লোকমত*, পুনে, ২৭ নভেম্বর, ২০০৮)
৬. মারাঠি দৈনিক *পুধারি*, পুনে সংস্করণে (৫ ডিসেম্বর ২০০৮) প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে সিএএমএ বা কামা হাসপাতালের সুপার মহেশগৌরি বলেন, রাত ১০টা থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত হাসপাতালে গুলি চলেছিল।

৭. *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* (পুনে ১৬ জুলাই ২০০৯)-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, হেমন্ত কারকারের ওয়্যারলেস অপারেটর নীতিন মাথানে আদালতে জানায়, কারকারে ও অন্যান্যদের ওপর ঠিক ১১.৫৫ নাগাদ গুলি চলেছিল। তাই যদি হয়, তবে কামা হাসপাতালে গুলি চলাকালীনই এই ঘটনা ঘটেছিল।

২. সিএসটি ও সিএএমএ-তে যতজন সন্ত্রাসবাদী ছিল

এসটিসিএএমএ-বঙ্গভবন লেন সেক্টরে আইবিও ক্রাইম ব্রাঞ্চের দাবি মতো দুজন জঙ্গি ছিল না। সেখানে অন্ততপক্ষে ৬ জন জঙ্গি ছিল বলে নীচের বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করলে সেটা বোঝা যাবে।

১. একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, সিএসটি স্টেশনের সংরক্ষিত টিকিটের কাউন্টারের দিক থেকে কয়েকজন জঙ্গি ভেতরে ঢুকে পড়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। স্টেশনের বাইরে দুটি বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, দুটি দলে জঙ্গিরা সিএসটি চত্বরে আসে। একদল স্টেশনের মধ্যে ঢুকে পড়ে, অন্যদল স্টেশনের কাছে মেট্রো সিনেমার সামনে বিস্ফোরণ ঘটায়। (*লোকমত,* পুনে, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)

২. সিএসটি চত্বরে দুটি দলে ভাগ হয়ে জঙ্গিরা ঢোকে। একদল স্টেশনের দায়িত্ব নেয়। আর অন্য দল স্টেশনের বাইরে বিস্ফোরণ ঘটায়। (*লোকমত,* মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)

৩. রাত দশটা নাগাদ অটোমেটিক রাইফেল হাতে নিয়ে চারজন ঢুকেছিল সিএসটি স্টেশনে। এরমধ্যে দুজন এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। প্রথমে স্টেশনের বাইরের ভিড়ের দিকে লক্ষ্য করে, তারপর ভেতরের লোকজনের ওপর গুলি ছোঁড়া হয়। বাকি দুজন বৃহন্মুম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অফিস ও আজাদ ময়দান হয়ে মেট্রো সিনেমা মাল্টিপ্লেক্সের দিকে ছুটে যায়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)

৪. সিএসটি-তে ঢুকে চারজন জঙ্গি যখন এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছিল, তখন স্টেশনের কর্মচারীরাও খুব একটা কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। হিন্দুজা ইন ক্যাবলনেটের জনৈক কর্মচারী হোলিন গঞ্জালভেজ বলেন, তিনি তেরো নম্বর প্লাটফর্মের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন বাজি ফাটানোর মতোন আওয়াজ শোনেন। এরপরেই তার খেয়াল হয়, প্ল্যাটফর্মে কেনো কেউ বাজি ফাটাতে যাবে, তখনই তিনি দেখেন, প্রচুর মানুষ মাটিতে

পড়ে রয়েছেন। এরপরেই জিপিও-র দিকে দৌড়াতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু সেখানেও গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের দিকে ছুটে যান তিনি। কিন্তু সেখানেও গুলির আওয়াজ। অগত্যা, জেজে ফ্লাইওভারের দিকে দৌড় দেন হোলিন। (*লোকসত্তা*, পুনে, ২৭ নভেম্বর, ২০০৮)

৫. সিএসটি স্টেশনে গুলি চালানো শুরু হয়েছিল রাতের বেলায়। হেমন্ত কারকারে যখন জানতে পারেন, সিএসটি-তে প্রচুর মানুষকে খুন করা হয়েছে, তখন তিনি সেদিকেই ছুটে যান। ঠিক ওই সময়েই জানা যায়, কয়েকজন জঙ্গি আজাদ ময়দানের দিক থেকে গুলি ও গ্রেনেড ছুড়ছে। এর জেরে অশোক কামতেও আজাদ ময়দান হয়ে সিএসটি-র দিকেই আসার কথা ভাবেন। ওই রাস্তা (*টাইমস অব ইন্ডিয়া* লেন) দিয়ে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে যখন বেশ সতর্কভাবেই কারকারে, কামতে, মোহিতে ও সালাসকার এগোচ্ছিলেন, তখনই সিএএমএ হাসপাতাল সংলগ্ন একটি বাড়ির ছতলায় দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়। মোহিতে সেদিকে ছুটে যান। সিএএমএ হাসপাতালে একজন জঙ্গিদের গুলিতে মারা যান। সেই সময় কারকারে, কামতে ও সালাসকার হাসপাতালের পেছনের গেট দিয়ে দেখেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) অফিসের দিক থেকেও গুলি চালানো হচ্ছে। তারা এগিয়ে যান। এরপরেই এসিপি পয়ধোনির কোয়ালিশ গাড়ি তাদের পেছনে এসে থামে...(*লোকমত*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর ২০০৮)

৬. সিএসটি-তে গুলি চালানোর পর ওই চারজন জঙ্গি, *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ভবনের কাছে বদরুদ্দিন তয়াবজি লেন দিয়ে পুলিশ পাসপোর্ট অফিসের (এসবি অফিস) দিয়ে ছুটে যায়। দুজন সিএএমএ হাসপাতালের পেছনের পাঁচিল টপকে ঢুকে যায় (*সাপ্তাহিক হম নয়*, ৫ ডিসেম্বর, ২০০৮)

৭. পুলিশ কন্ট্রোল রুমের কল রেকর্ডের ভিত্তিতে ও অন্যান্য প্রমাণ যাচাই করে, *দ্য লাস্ট বুলেট*-এ শ্রীমতি বিনীতা কামতে খোলসা করেন, রঙ্গভবন লেনে মাঝরাতের ঠিক আগে দশ থেকে পনেরো মিনিট ধরে দুজন জঙ্গিই তাদের কাজ চালাচ্ছিল। এমনকি কামা হাসপাতালে অতিরিক্ত সিপি সহ আরও বেশ কয়েকজনকে যে জঙ্গি খুন করেছিল, মাঝরাত পর্যন্ত সে সেই হাসপাতালেই ছিল। (*টু দ্য লাস্ট বুলেট*, পৃ: ৪২-৪৬, ৫০ এবং ৫৩)

ওপরের রিপোর্টের সার সংক্ষেপ

জিপিও-র দিক থেকে চারজন জঙ্গি সিএসটি চত্বরে এসেছিল। দুজন স্টেশনে ঢোকে, দুজন স্টেশনের বাইরে বিস্ফোরণ ঘটায়। মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের ভবনের দিকে তারা এগিয়ে যায়। সেখানেই আজাদ ময়দানের দিক থেকে আসা আরেকটি জঙ্গিদল তাদের সঙ্গে ভিড়ে যায়। এই দুটি দল, টাইমস অব ইন্ডিয়া ভবনের পাশে বদরুদ্দিন তয়াবজি লেনে ঢুকে পড়ে। একদল কামা হাসপাতালের ভিতর ঢুকে পড়ে, অন্য দলটি এসবি অফিসের দিকে (সিএসটি স্টেশনে থাকা দুই জঙ্গিরও তাদের সঙ্গেই যোগ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তারা স্টেশনের মধ্যেই ফেঁসে যায়। তারা মসজিদ বন্দরের দিক থেকে বেরোয়। সাপ্তাহিক *হম নওয়া*-র সাংবাদিকের আজাদ ময়দানের দিক থেকে আসা জঙ্গি দলটি সম্পর্কে জানা ছিল না। তা থেকেই তিনি ধরে নেন, চারজনই সিএসটি-র দিক থেকে বদরুদ্দিন তয়াবজি লেনে ঢোকে।)

৩. সিএসটি থেকে যেভাবে সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে গিয়েছিল

১. *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* মুম্বাই (২৭ নভেম্বর ২০০৮)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, দুই জঙ্গিকে স্টেশনে আটকে দেওয়া হয়, একটি খালি লোকাল ট্রেনের বগিতে লুকিয়ে পড়ে তারা। সেখানেই তাদের কোণঠাসা করে ফেলে পুলিশ।

২. মারাঠি দৈনিক *সকাল,* পুনে (২৮ নভেম্বর ২০০৮)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, সিএসটি-তে থাকা দুই জঙ্গি সাবওয়েের দিকে যেতে গেলে তারা পুলিশের সামনে পড়ে এবং উল্টোদিকে ছোটে। প্লাটফর্ম ২ ও ৩ এর মাঝখানে রোট্রাক ধরে ছুটতে শুরু করে তারা। মসজিদের দিক থেকে তারা পালায়।

৩. *হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই (৩০ নভেম্বর ২০০৮)-এর মতে, সাবওয়েের ঢাকার পথ দিয়ে দুই জঙ্গি জে জে স্কুল অব আর্টসের দিকে ছুটে যায়। *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ভবনের কাছে থাকা এক পুলিশ তাদের দিকে গুলি চালায়। এরপর আবার স্টেশনে ফিরে আসে তারা। প্লাটফর্ম ৩-এ রেল লাইনে লাফিয়ে পড়ে তারা। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের পাশ দিয়ে ছুট লাগায়। প্লাটফর্মের শেষে মসজিদ বন্দরের দিকে পালায় তারা।

অথচ পুলিশ দাবি করেছিল, *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ভবনের কাছের ফুটব্রি ז পার করে সিএএমএ হাসপাতালের দিকে গিয়েছিল দুই জঙ্গি। কিন্তু এই সব রিপোর্ট তো সেই গল্পে সায় দিচ্ছে না।

সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেন এলাকায় ঠিক কতজন জঙ্গি ছিল

১, ২ ও ৩ অংশে যে যে তথ্য দেওয়া হলো, যদি তাদের পাশাপাশি রাখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে, দুজন নয় ওই এলাকায় ছজন জঙ্গি ছিল। দুজন পালায় মসজিদ বন্দরের দিক থেকে, আরও দুজন সিএএমএ হাসপাতালের দিক থেকে ও বাকি দুজন পালায় এসবি অফিস-রঙ্গভবন লেন এলাকা থেকে। ওই এলাকাতে একই সময় গোলাগুলি চলছিল।

৪. 'স্কোডা'র তত্ত্ব

বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব ছাড়াও স্কোডা যে গল্প ফেঁদেছিল, তা সমস্ত যুক্তিবোধের উর্ধ্বে চলে যায়।

১. যেখানে *লোকমত*, মুম্বাই (২৮ নভেম্বর ২০০৮) প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বামী ও স্ত্রীকে গাড়ি (স্কোডা) থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার পর জঙ্গিরা সেটি নিয়ে গিরগাঁও চৌপটির দিকে চলে যায়, সেখানে এক সিনিয়র পুলিশ অফিসারের সূত্র নিয়ে পরের দিন (২৯ নভেম্বর, ২০০৮) *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* পুনে সংস্করণের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জঙ্গিরা সারান আরসা (গাড়ির মালিক) ও তার বন্ধুকে গাড়ি থেকে বের করে দিয়ে চৌপট্টির দিকে গাড়ি ছোটায়। অন্যদিকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের চার্জশিট অনুযায়ী গাড়ির মালিক সহ ভিতরে আরও দুজন ছিল।

২. *টাইমস অব ইন্ডিয়ার* (পুনে ২৯ নভেম্বর, ২০০৮) প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর সারান আরসা দ্রুত পুলিশের কন্ট্রোল রুমে ফোন করেন। ঘটনার কথা জানিয়ে তার গাড়ির নম্বরও দেন। কিন্তু চার্জশিটে এই কন্ট্রোল রুমে খবর দেওয়ার বিষয়টির কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

ক্রাইম ব্রাঞ্চের চার্জশিট অনুযায়ী, জঙ্গিরা পুলিশের কোয়ালিশ গাড়িটি খালি করে দেওয়ার পর গাড়ির ওয়্যারলেস সেট থেকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করেন অরুণ যাদব নামে এক পুলিশকর্মী। জঙ্গিরা যতক্ষণ গাড়ি দখলে রেখেছিল, গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি গাড়ির পেছনে পড়ে ছিলেন। জঙ্গিরা নেমে যাওয়ার পর যাদবের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পুলিশ থানা পুলিশের বিভিন্ন গাড়ি ও মোবাইল ভ্যানে সতর্কতা জারি করে দেয় কন্ট্রোল রুম। যে গাড়িটি ছিনতাই করা হয়েছিল, সেই গাড়িতে থাকা জঙ্গিরা কোন কোন দিকে যাচ্ছে, তা নিয়ে বিশদ তথ্য জানানো হয়েছিল।

৩. ২০০৮, ৭ ডিসেম্বর এনডিটিভি ইন্ডিয়া, আইবিএন ৭ এবং আজ তক যে কথাবার্তা শোনানো হয়েছিল, তা থেকে স্পষ্ট, কারকারে, সালাসকার রঙ্গভবন লেনে খুন হয়েছিলেন এবং জঙ্গিরা গাড়ি ছিনতাই করে গিরগাঁও চৌপটির দিকে যে পালিয়েছিল এই সব ঘটনা গিরগাঁও চৌপটিতে এনকাউন্টার হওয়ার আগে পর্যন্ত না কন্ট্রোল রুম, না পুলিশ কমিশনার, বা জয়েন্ট সিপি ক্রাইম, কারোর কাছেই কোনো খবর ছিল না। এটা থেকে এই মানে দাঁড়ায়, যে হয় কন্ট্রোল রুম কোনো খবরই পায়নি, নয়তো খবর পেয়েও তারা তা সবাইকে জানায়নি।

৪. শ্রীমতি কামতের বই *দ্য লাস্ট বুলেটে* এই বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হয়। তাতে বলা হয়েছে, রাত বারোটা তেত্রিশ মিনিট নাগাদ কোয়ালিশ গাড়ির ওয়্যারলেস সেট থেকে অরুণ যাদব কন্ট্রোল রুমে খবর দেন। সেখানে জঙ্গিদের স্কোডা গাড়ি ছিনতাই করার কথা কিছু বলা হয়নি। বই অনুযায়ী অরুণ যাদব বলেছিলেন, রঙ্গভবন লেনে দুই জঙ্গি একটি কোয়ালিশ গাড়ি ছিনতাই করে পিআই সালাসকার, এটিএস স্যার (কারকারে) ও সাউথ রিজিয়ন স্যার-কে (ইস্ট রিজিয়ন বলতে চেয়েছিলেন) গুলি করা হয়েছে (পৃ. ৫৪)। স্কোডা গাড়ি ছিনতাই নিয়ে কন্ট্রোল রুম কোনো বার্তা পায়নি। এই ব্রাঞ্চের চার্জশিটে যা দাবি করা হয়েছিল, সেরকম কিছু ঘটেনি। আদালতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ মিথ্যে তথ্য দিয়ছিল।

৫. কিছু খবরের কাগজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিবি মার্গ পুলিশ স্টেশন, ও গিরগাঁও চৌপটির অন্যান্য অফিসাররা জানত, একটি স্কোডা গাড়ি ছিনতাই হয়েছে। এবং সেই ছিনতাই হওয়া গাড়ির জন্য তারা অপেক্ষাও করছিল। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের* (মুম্বাই, ৩০ নভেম্বর ২০০৮) প্রতিবেদন অনুযায়ী, যে এলাকায় গুলি চলেছে, সেই এলাকা যার দায়িত্বে, সেই ডিবি মার্গ পুলিশ স্টেশনের সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর নাগাপ্পা মালি জানিয়েছিলেন, গাড়ির রঙ আর চেহারা সম্পর্কে ধারণা ছিল, তাই সেই গাড়িটিকে থামানোও হয়।

ওপরের এইসব তথ্যগুলোর দিকে তাকালে, একটা অবধারিত প্রশ্ন উঠে আসে। যদি ছিনতাই হওয়া স্কোডা গাড়ির কথা কন্ট্রোল রুমে না আসে, এবং তা সব জায়গায় যদি জানানো না হয়, যদি এই অভিযানের নেতৃত্বে থাকা কমিশনার ও যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) বিষয়টি নিয়ে কিছু না জেনে থাকেন, তাহলে কী করে শুধুমাত্র ডিবি মার্গ থানার ও গিরগাঁও চৌপট্টির কিছু অফিসাররাই এই বিষয়ে জেনে ফেললেন? এই ব্যাপারটায় একটাই বিষয় অনুমান করা যায়, কেউ হয়তো

এই খবর, অফিসারদের মোবাইল ফোনে দিয়েছিল। যদি তাই হয়, তাহলে সেই 'কেউ টা কে? কেনো এমন গুরুত্বপূর্ণ খবর, পুলিশ কমিশনার কিংবা অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের দেওয়া হলো না?'

আসলে ওপরের এই ঘটনা প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। দক্ষিণ মুম্বাইয়ের অলিগলি যারা চেনেন, তারা বুঝবেন, রোজকারের জ্যামজটের মধ্যেও, মিত্তাল চেম্বার্স থেকে গিরগাঁও চৌপটিতে গাড়িতে আসতে সাত থেকে আট মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়। যদি ধরে নিই, প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে সারন আরসা ও এএসআই অরুণ যাদব যদি কন্ট্রোল রুমে খবর দিয়েই থাকে, আর সেই কন্ট্রোল রুম যদি সেই খবর সংশ্লিষ্ট অফিসারদের জানিয়েই থাকে, যারা নিজেদের তৈরি করে গিরগাঁও চৌপট্টিতে ব্যারিকেড করবেন, ততক্ষণে অবশ্য জঙ্গিদের মুম্বাইয়ের অন্যপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ফলে স্বাভাবিক ভাবে গোটা বিষয়টাই ভুলভাল। শ্রীমতি কামতের *'টু দ্য লাস্ট বুলেটে'* যেরকমটা বলা হয়েছে, অরুণ যাদব ছিনতাই হওয়া স্কোডা নিয়ে কোনো খবর দেননি। বরং ছিনতাই হওয়া একটি কোয়ালিশ-এর কথা তিনি জানান এবং তাও ঘটনার প্রায় মিনিট কুড়ি পর। সারণ আরসার বিষয়টি নিয়ে যদি কথা ওঠে, তাহলে বলা যায়, তিনি কোনো খবরই কন্টোল রুমে দেননি।

অনুমান

আইবি-র তরফেই জঙ্গিদের নিয়ে চৌপটি এলাকায় স্কোডা গাড়িটিকে পাঠানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

৫. গিরগাঁও চৌপট্টিতে যতজন সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করা হয়েছিল

এনকাউন্টারের পর পর যে সব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন ২৭ নভেম্বর ২০০৮-এ, দুই জঙ্গিকেই নিকেষ করা হয়েছিল।

- জনপ্রিয় ও জনবহুল গিরগাঁও চৌপট্টি এলাকায় দুই হামলাকারীকে গুলি করে মারা হয়। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর, ২০০৮)
- মেরিন ড্রাইভ এলাকা দিয়ে দুই জঙ্গি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, গিরগাঁও চৌপট্রিতে পুলিশ তাদের থামায়, এনকাউন্টারে দুজনই মারা যায়। (*লোকসত্তা*, মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)
- তারদিও এলাকায় দুই জঙ্গিকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয় পুলিশ, গিরগাঁও-এর কাছে একটি স্কোডা থেকে নেমে পালানোর সময় পুলিশ তাদের গুলি করে মারে। (*লোকমত*, মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর ২০০৮)

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও *লোকসত্তা* তাদের এই খবরাখবর কোথা থেকে পেয়েছে তা নিয়ে কিন্তু তারা কিছু জানায়নি। তারা নিজেদের তত্ত্বেই কিন্তু অনড় থাকে। যদিও *লোকমত*, মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের অনুরোধে, পুলিশের দাবিকেই প্রমাণ করে। ২৮ নভেম্বর, ২০০৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ঘটনাস্থলেই একজন জঙ্গির মৃত্যু হয়, আরেকজনের পায়ে গুলি লাগে, সে অজ্ঞান হয়ে যায়। পুলিশ দুজনকেই মৃত ভেবে ভুল করে। তাদের হাত ও পা বাঁধা হয়। তাদেরকে মর্গে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু *লোকমতের* এই বক্তব্য, মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। কারণ কোনো পুলিশই কোনো জঙ্গিকে আধমরা ভেবে এভাবে মর্গে ফেলে রেখে দেবে না। অন্তত আরও কয়েক রাউন্ড গুলি তার মাথায় নয়তো বুকে চালিয়ে দেবে তারা।

লোকমতে বলা হয়, দুজনের মধ্যে একজন জঙ্গি আধমরা অবস্থায় ছিল! মৃত ভেবে তাকে মর্গে রেখে দেওয়ার পুলিশের সিদ্ধান্তের যে তত্ত্ব, তা আদালতে চিকিৎসকের বয়ানে খারিজ হয়ে যায়। *হিন্দুস্তান টাইমস*, মুম্বাই (২৯ মে ২০০৯) প্রতিবেদনে বলা হয়, কাসভকে প্রথম পরীক্ষা করেছিলেন নাইয়ার হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তার ভেঙ্কট রামামূর্তি। তিনি আদালতে জানান, কাসভকে তিনিই প্রথম পরীক্ষা করেন। সজ্ঞানেই ছিল সে। কথাও বলতে পারছিল।

এনডিটিভি ও অন্যান্য কয়েকটি টিভি চ্যানেল ২০০৮-এর ৭ ডিসেম্বর মুম্বাই পুলিশ কন্ট্রোল রুমের যে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের অডিও টেপ চালিয়েছিল, তাতে শোনা গেছে, ডিসিপি-র কাছ থেকে নিশ্চিত হওয়ার পর মুম্বাইয়ের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম, কমিশনারকে বলছেন, দুই জঙ্গিকেই হত্যা করা হয়েছে।

পরিস্থিতি যেরকম ছিল, তাতে দুই জঙ্গি নিহত হওয়ারই কথা। অন্তত যুক্তি তো তাই বলে। কিন্তু ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও আইবি যেভাবে একজনকে জীবিত দেখানোর গল্প বলে, তা এককথায় অভূতপূর্ব ব্যাপার। দশ থেকে পনেরো জন সশস্ত্র পুলিশ একজন ঘৃণ্য জঙ্গিকে ঘিরে ধরেছে, সেই জঙ্গি যে নির্মম ভাবে ৫০ জনকে খুন করে এসেছে, সেই জঙ্গি যে কয়েকজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকেও খুন করে এসেছে, সেই জঙ্গি যে ওই পুলিশকর্মীদেরই সহকর্মীকে তাদের চোখের সামনেই খুন করেছে, তাকে হাতের কাছে পেয়ে বন্দুকের গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় না করেও স্রেফ জ্যান্ত পাকড়াও করবে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? যদিও সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে সবসময় চেষ্টা থাকে তাকে জীবিত পাকড়াও করার। কিন্তু এরকম একটা পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মানসিকতাও তো কাজ করে। বাস্তব ও মানবিকতার জায়গা থেকে দেখলে, ওই ধরনের জঙ্গিকে জীবিত ধরা সম্ভব নয়।

একটু যুক্তি খাটালে বোঝা যেতে পারে, যে দুই সন্ত্রাসবাদীই হয়তো নিহত হয়েছিল। হতে পারে সমন্বয়ের অভাব, হতে পারে অতি উৎসাহের জেরে সে ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারার পর দুই মৃত জঙ্গির মধ্যে একজনকে অন্য জায়গায় মারা হয়েছিল বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। তার জায়গায় 'স্টক' বা 'ভাড়ার' থেকে বের করা হয় অন্য আরেকজন 'জঙ্গি'-কে।

৬. জঙ্গিকে বাঁচিয়ে রাখার রহস্য

গিরগাঁও চৌপটির এনকাউন্টারে একজন জঙ্গিকে বাঁচিয়ে রাখার চিত্রনাট্যটি কেনো লেখা হলো, তার কিছু কারণ থাকতে পারে। যেমন, জোর করে যাদের জঙ্গি বলে চালানো হয়েছিল এবং যারা সত্যি সত্যিই জঙ্গি ছিল, তাদের সবাইকেই যদি মেরে ফেলা হতো তাহলে আইবি ও পুলিশের একটু সমস্যা হতো। তাহলে চৌপট্টি এলাকায় বানানো নকল জঙ্গিদের সঙ্গে পাকিস্তানের লশকর জঙ্গিদের মিলিয়ে দেওয়াতে অসুবিধা হতো। এছাড়াও হেমন্ত কারকারের হত্যা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর এই ঘটনা প্রমাণ করার জন্য নকল জঙ্গিদের একজনকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরি ছিল। সেই নকল জঙ্গির কাছ থেকে জবানবন্দি, বাজেয়াপ্ত করা জিনিসপত্রের দোহাই দিয়ে গল্প ফাঁদা ছিল সুবিধাজনক।

কিন্তু লশকর জঙ্গিরা তাদের গল্প ফাঁস করে দেওয়ার মতো এমন কিছু তথ্যপ্রমাণ রেখে যেতে পারে বলে শুরুতে ভাবতেই পারেনি কুচক্রীরা। আসলে সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবনের ঘটনায় আইবি-র ডানপন্থী কট্টর মনোভাবাপন্ন জঙ্গিরা কাজ করছিল। তার জেরেই হত্যা করা হয় কারকারেকে। কিন্তু দেশের ভাগ্য ভালো এবং আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রীদের দুর্ভাগ্য, যে লশকর জঙ্গিরা বেশ কিছু তথ্যপ্রমাণ ছেড়ে গিয়েছিল, যেমন ভিওআইপি সিস্টেম, পাকিস্তানে যোগাযোগ রাখতে তাদের ব্যবহৃত স্যাটেলাইট ফোন ইত্যাদি। লোক দেখানো জঙ্গি আজমল কাসভ ও আর ইসমাইল খানের সঙ্গে ওই সব জিনিসের কোনো যোগাযোগ নেই। তাদের সঙ্গে লশকর-ই-তাইয়েবার কোনো যোগাযোগও নেই। অন্যদিকে এমন প্রমাণও রয়েছে, যে তারা কোনো ভাবেই পাকিস্তানের লশকরের সঙ্গে জড়িত নয়। তারা একদমই অন্য মানুষ। সে কারণেই আইবি ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে অনেক কিছু সাজাতে হয়েছিল। দুই দলের মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর জন্য আদালতে চার্জশিট ফাইল করতে ডিএনএ রিপোর্ট, আঙুলের ছাপের মতো বেশ কিছু তথ্য দাঁড় করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

৭. মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী হামলার বিকল্প তত্ত্ব

১ থেকে ৯-এর সবকটি পর্ব, অর্থাৎ ২০০৮-এর ১৯ নভেম্বর আইবি-র হাতে গোপন তথ্য আসা থেকে শুরু করে ২৬/২৭ নভেম্বর, ২০০৮ গিরগাঁও চৌপট্টির এনকাউন্টারের ঘটনা একটু যুক্তিযুক্ত ভাবে পর পর সাজালে, এই হামলার একটা বিকল্প তত্ত্ব উঠে আসে।

১. মুম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে রাবারের ডিঙি নৌকায় করে দশজন নয়, আটজন জঙ্গি আসে।
২. তাদের মধ্যে ছজন বধওয়ার পার্ক, ক্যাফে প্যারাডেতে ভাই ভাণ্ডারকর মাছিমার কলোনিতে আসে! বাকি দুজন একই ডিঙি করে ওবেরয় হোটেলের দিকে এগিয়ে যায়।
৩. বধওয়ার পার্কে যে ছজন নামে, তারা হোটেল তাজ, ক্যাফে লিওপোল্ড ও নরিমান হাউসে তাণ্ডব চালায়। ওবেরয়ের দিকে যে দুজন যায়, তারা ওবেরয় ও টিডেন্ট হোটেলে হত্যালীলা চালায়।
৪. রঙ্গভবন লেন ও সিএসটি, সিএএমএ হাসপাতালে যে জঙ্গিরা খুনখারাপি চালিয়েছিল, তারা পাকিস্তান থেকে আসা জঙ্গি ছিল না। বরং তারা স্থানীয় সন্ত্রাসী ছিল।
৫. রঙ্গভবন লেন ও সিএসটি, সিএএমএ হাসপাতালের ঘটনা ছিল পরিকল্পনা মাফিক। চিত্রনাট্য সাজানো ছিল। তার নির্দেশক ছিল, এবং দেশজুড়ে সন্ত্রাসী পরিকল্পনা করতে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি ও তাদের শুভচিন্তক আইবি-র যৌথ উদ্যোগে এই কাণ্ডটি হয়েছিল। এদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল হেমন্ত কারকারেকে হত্যা। কারণ কারকারেই তাদের চালবাজি ধরে ফেলতে শুরু করেছিলেন।

পরিকল্পনা থেকে তা রূপায়ন পর্যন্ত যে যে ঘটনা তা যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে যদি পর পর সাজানো হয়, তাহলে দাঁড়াবে এই—

১. হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র এটিএস যেহেতু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সন্ত্রাসী মুখোশ প্রায় খুলে দিচ্ছিল, এবং কারকারে যখন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতাদের গ্রেফতার করার কয়েক ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন আরএসএস, ভিএইচপি, অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এবং তাদের রক্ষাকর্তা আইবি-র কপালের ভাঁজ ক্রমশ বাড়ছিল। যেখানে আইবি-র কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের হুজুরদের বাঁচাতে বিকল্প কোনো গোপন অভিযানের কথা ভাবছিল, ঠিক তখনই ঈশ্বরপ্রদত্ত সুযোগ তাদের সামনে চলে এলো। আমেরিকা ও র-এর কাছ থেকে

হাতে গরম খবর এলো, পাকিস্তান থেকে সন্ত্রাসীরা মুম্বাইতে হামলা করতে জলে ভেসে পড়েছে।

২. নির্দিষ্ট করে পাওয়া এই তথ্যের কথা মুম্বাই পুলিশ বা পশ্চিমা নৌ বাহিনীকে না জানিয়ে, তারা শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রে তাদের হুজুরদের এই খবরটি পৌঁছে দিল। তাদেরকে তৈরি থাকতে বলল, যাতে নির্দেশ পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবকিছু তৈরি হয়ে যায়, জঙ্গি হামলার পাশাপাশি তাদের ইচ্ছেমতো অভিযান চালানো যায়।

৩. মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা, নাগপুর ও পুনের প্রশিক্ষণ শিবিরে যারা গত কয়েক বছর ধরে ভালোরকমভাবে সবকিছু রপ্ত করতে পেরেছে, সেরকম ছয় থেকে আটজন যুবককে ঠিক করে ফেলল।

৪. তারা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতারা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রাক্তন ও কর্মরত আইবি অফিসাররা তাদেরকে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিল। কীভাবে কী, কোথায় করতে হবে তার একটা ছক তৈরি করে দেওয়া হলো।

৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী জঙ্গিদের আসার কয়েকদিন আগেই তারা তৈরি হয়ে গেল। জঙ্গিরা কবে হামলা চালাতে পারে, তার একটা ধারণা তৈরি করে প্রস্তুতি নেয়া হলো।

৬. তারা কিন্তু একদম চূড়ান্ত সতর্কতার মধ্যে ছিল। কারণ যে মুহূর্তে জঙ্গিদের মুম্বাইতে পা রাখার কথা তাদের কানে পৌঁছবে, সেই মুহূর্তেই সিএসটি, সিএএমএ এবং এসবি অফিসে তারা পৌঁছে নিজেদের তৈরি রাখবে।

৭. জঙ্গিরা তাজ, ওবেরয়, নরিমান হাউসের মতোন জায়গায় যখন পৌঁছে যাবে, তখন থেকেই তারা তাদের এলাকায় পুরোদমে মাঠে নেমে পড়বে।

৮. তাদের কাছে যে মোবাইল ফোন ছিল, তার মধ্যে দিয়েই প্রয়োজনীয় নির্দেশ আসার কথা ছিল। সেই সব মোবাইলে যে সিম কার্ড ছিল, সেগুলো সাতারা (মহারাষ্ট্র) থেকে কেনা হয়েছিল, তারা ওই মোবাইল ফোন ছাড়া আর অন্য কোনো মোবাইল ব্যবহার করবে না। এমনকি নিজেদের ফোনও নয়।

৯. প্রথমে সিএসটি তারপর সিএএমএ হাসপাতালে গুলি চালানো শুরু হয়। মধ্যখানে দশ-পনেরো মিনিট বাদ ছিল। সিএসটি-র দলটি তাদের কাজ শেষ করে, টাইমস অব ইন্ডিয়া ভবনের পাশের রাস্তা দিয়ে গিয়ে অন্য দলের সঙ্গে ভিড়ে যায়।

১০. এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারে যেদিক থেকেই আসুন না কেনো, কীভাবে তাঁকে সিএএমএ হাসপাতালের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইবি অফিসাররা সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে রাখে।

১১. কারকারে যখন কাছাকাছি পৌঁছান, তখন এসবি অফিস-রঙ্গভবন লেনে থাকা দলটি তার নজর টানতে গুলি চালানো শুরু করে।

১২. এসবি অফিস ও রঙ্গভবন লেনে থাকা দলটির খপ্পরে যখন এটিএস প্রধান এসে পড়লেন, তখন তারা তাদের কাজ সেরে ফেলল।

১৩. কাজ শেষ করার পর তাদের ওই এলাকা ছেড়ে দ্রুত পালিয়ে গিয়ে, আসল জায়গায় পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ ছিল।

১৪. আইবি, মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের সাহায্য নিয়ে তাদের ভাঁড়ার থেকে দুই জঙ্গিকে এনকাউন্টারের জন্য ওই এলাকায় নিয়ে আসে। কিন্তু তাদের একজনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।

প্রায় সব কিছুই তাদের পরিকল্পনা মতোই চলছিল। কিন্তু বিশ্বের সব যুদ্ধ, পরিকল্পনা বা অভিযানের মতো এক্ষেত্রেও আসল পরিকল্পনা মাফিকই যে সবকিছু হয়েছে তা কিন্তু নয়। এই কীর্তি যারা করেছে, তারাই কিন্তু আবার বেশ বড়সড় ভুল কাজও করে এসেছিল।

১. সিএসটি-র মধ্যে থাকা দুই জঙ্গির মাথা খাওয়া হয়েছিল অনেক বছর ধরে। তাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষ। ফলে তারা এই কাজের দায়িত্ব পেয়ে মুসলিম বিদ্বেষের জেরে ভুলেই গিয়েছিল, তারা জিহাদি মুসলিমের ভূমিকায় নাটক করতে এসেছে এখানে। তাই মাথায় টুপি পড়া, দাড়িওয়ালা ও বোরখা পড়া মহিলা ও শিশুদের উদ্দেশ্যেই বেশি গুলি খরচ করেছিল তারা।

২. স্টেশনে তাণ্ডব চালানোর পর পরিকল্পনা মাফিক তারা কামা হাসপাতালের দিকে যেতে পারেনি। কারণ সাবওয়ে ও *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ভবনের কাছে পুলিশ ছিল। ফলে তারা বন্দর মসজিদের দিক থেকে পালায়।

৩. অতি উৎসাহেই হোক বা খবর না থাকার কারণে, গিরগাঁও চৌপটির পুলিশ স্কোডা গাড়িতে থাকা দুই জঙ্গিকেই নিকেষ করে। ফলে ঘটনা সামনে আনার আর কেউ রইল না। তাই শেষ মুহূর্তে আইবি-কে তাদের ভাড়ার বা স্টক থেকে আরেকজনকে বের করতে হয়।

এই সব আচমকা ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা, কিছু ভুলচুক থাকা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের আসল কাজে সফল হয়েছিল। আর সেটা হলো হেমন্ত কারকারেকে হত্যা।

ওপরে যে তথ্যগুলো দেওয়া হলো, তার থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট, সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনার সঙ্গে, তাজ, ওবেরয় বা নরিম্যান হাউজের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। দুটি অভিযানের মধ্যে কোনো মিলই নেই। না অভিযানের কোনো লক্ষ্যে, না জঙ্গিদের মধ্যে কোনো মিল। তাদের সংগঠন হোক, ষড়যন্ত্রকারীরা হোক, কিছুতেই মিল নেই। এই দুটোর একটাই যোগসূত্র টানা যেতে পারে। তা হলো ব্রাহ্মণ্যবাদ সন্ত্রাসীদের সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনার সঙ্গে তাজ, ওবেরয় বা নরিম্যান হাউজের বিদেশি জঙ্গিদের হামলার মিল ঘটানো। যার নেপথ্য কারিগর ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতারা ও আইবি। এইভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতের পুতুল হয়ে থাকা আইবি দেশের নিরাপত্তাকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। জলাঞ্জলি দিয়েছিল এই কারণে, যাতে ওই ব্রাহ্মণ্যবাদী জঙ্গি নেতা ও সংগঠনের আসল মুখোশটা খুলে না যায়।

৮. জনগণের কাছে গল্প ছড়ানো

মিডিয়া, জনগণ এমনকি সরকারের ওপর চালবাজি করার জন্য মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের সাহায্যে আইবি তথ্যপ্রমাণ নিজের মতো করে সাজিয়েছিল। তাছাড়া নানান ফাঁকফোকর ছিল, সেগুলোও ভরাট করার চেষ্টা চলেছিল। কারণ সিএসটি সাবওয়ে, গিরগাঁও (চৌপট্টি কিংবা *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ভবনের কাছে পুলিশ যেভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিল, তাতে আসল পরিকল্পনা থেকে কিছুটা তাদের সরতে হয়েছিল। আর তাছাড়া সিএসটি-তে জঙ্গিরা অতি উৎসাহী হয়ে যে ঘটনা ঘটিয়েছিল, সেটিকেও ঠিকমতো সাজানো গোছানোর দরকার ছিল। কিন্তু যে যে জিনিস দিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছিল, সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডস, কিছু জিনিসপত্র উদ্ধারের মতো ঘটনাগুলো এতটাই মাঝেমধ্যে নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছিল, যে একদিক ঢাকতে আরেকদিক খুলে যাচ্ছিল। যাইহোক, এই সব তথ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই আইবি গল্প ফাঁদে, আর তা মিডিয়া ও জনগণকে খাওয়ায়। কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এই আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে নাচতে থাকা আমাদের মিডিয়া, আইবি-র গল্পেই মন দিয়ে ভিড়ে যায়, কোনো তত্ত্ব তালাশ না করেই তারা খবর দিতে থাকে যাচাই না করেই, খোঁজখবর না করেই। এমনকি পরস্পর বিরোধী নানান রিপোর্টও প্রকাশ হতে থাকে। আগে যে মিডিয়া কোনো একটা কথা বলেছিল, সেই মিডিয়াই সেই কথারই উল্টো সুর গাইতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রই হোক বা বুদ্ধিজীবী, যারাই প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করলেন, তাদেরকে আইবি-র, দেশের সম্মান, জাতীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতো চেনা শব্দ শুনিয়ে শুনিয়ে চুপ

করিয়ে দিতে থাকল। অতি সরল জনগণ নম্রভাবেই সেই তত্ত্বে সায় দিতে লাগল। আর তারা এসব মেনে নিল কারণ, একে তো সন্ত্রাসবাদের মতো বিষয়, তার ওপর আবার জড়িত রয়েছে মুসলিম। সরকারি বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করা মানেই তো দেশ বিরোধী তকমা জুটে যাওয়া। তার ওপর বেশি বাড়াবাড়ি করলে আইবি-র রক্তচক্ষু তো রয়েছেই। তার ওপর পুলিশ সিএসটি, সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনাকে মূল জঙ্গি হামলার সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছিল, যে এ বিষয়ে জনগণ বা সরকার চুপ থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেছিল।

৯. মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও আইবি-র অপরাধবোধ

যদিও কোনো কারণে সাধারণ মানুষ চুপচাপই ছিলেন, কিন্তু ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও আইবি-র দোষী বিবেক তাদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছিল না। নিজেদের দোষ ঢাকতে মাঝেমধ্যেই নানান কাজকর্ম করে চলছিল তারা। ভিলে পার্লে ও ওয়াড়ি বন্দর এলাকায় ট্যাক্সিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় সেভাবেই ক্রাইম ব্রাঞ্চ গা জোয়ারি ব্যাখ্যা দিয়েছিল, সেভাবে কিছু টিভি চ্যানেল ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে সরকারি গোপনীয়তা আইনের দায়রায় অভিযোগ আনা হয়েছিল, সেভাবেই প্রধান প্যানেলের রিপোর্টকে লাল ফিত দিয়েই আইবি আটকে রাখতে চেয়েছিল। অপরাধবোধ কাজ করছিল তাদের মধ্যে।

ক. ভিলে পার্লে আর ওয়াড়ি বন্দরে ট্যাক্সি বিস্ফোরণ রহস্য

আইবি ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের অপরাধবোধের জেরে, তাদের বিভিন্ন কীর্তিকলাপ ধামাচাপা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চলছিল। ভিলে পার্লে ও ওয়াড়ি বন্দর এলাকায় ট্যাক্সিতে বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার ভালোরকম চেষ্টা চলেছিল।

১. মারাঠা দৈনিক *লোকমত* (মুম্বাই, ২৭ নভেম্বর, ২০০৮) এবং দৈনিক *পুরি* (পুনে ২৮ নভেম্বর ২০০৮)-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভিলে পার্লে ফ্লাইওভারের কাছে ট্যাক্সি নং MH 01-BA-5179-টিতে শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের।

২. ঘটনার চার দিন পর, জয়েন্ট সিপি (ক্রাইম) মুম্বাই, আগ বাড়িয়েই ওই ট্যাক্সি বিস্ফোরণ নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চালায়। পয়লা ডিসেম্বর, ২০০৮-এ *পুনে মিররে (টাইমস অব ইন্ডিয়া)* প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ ট্যাক্সি বিস্ফোরণ রহস্যের ব্যাখ্যা দেয়। জয়েন্ট সিপি ক্রাইম রাকেশ মারিয়া বলে, ওই দুই শক্তিশালী বিস্ফোরণের সঙ্গে কোনো জঙ্গি হামলার ব্যাপার নেই। আসলে গাড়ি চালক তাদের

পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি কিছু জেনে ফেলে থাকে, সেই আশঙ্কায় জঙ্গিরাই ওই ট্যাক্সিতে বোমা রেখেছিল। ওই একই প্রতিবেদনে বলা হয়, জঙ্গিরা যে যে ট্যাক্সিতে চড়ে থাকতে পারে, সেইসবগুলোরই খোঁজ চলছে।

৩. *হিন্দুস্তান টাইমসে* (মুম্বাই, ১৯ এপ্রিল, ২০০৯) বলা হয়, পুলিশ আদালতে আগের দিন রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। রিপোর্টে ছিল, ভিলে পার্লেতে বিস্ফোরণের সময় ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে মৃত্যু হয় হায়দরাবাদের লক্ষ্মীনারায়ণ গোয়েল নামে এক ব্যক্তির। তার শ্যালিকা মোবাইলে ফোন করে তাকে জানান, সিএসটি স্টেশনে জঙ্গি তাণ্ডব চলছে। সেই ফোন পেয়েই হায়দরাবাদ না গিয়ে ফের শ্যালিকার বাড়িতেই ফিরে আসছিল গোয়েল। এর সপক্ষে প্রমাণ খাড়া করতে গোয়েল ও তার শ্যালিকার কল ডিটেলস আদালতে জমা দেয় পুলিশ। সিএসটি-র সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্টও এই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলে পুলিশের দাবি।

৪. আরেকটি বিস্ফোরণ নিয়ে মারাঠি দৈনিক *লোকমত* (পুনে, ২৭ নভেম্বর ২০০৮, অর্থাৎ ঠিক পরের দিন) জানায়, ডকইয়ার্ড রোডে (ওয়াড়ি বন্দর) একটি ট্যাক্সি বিস্ফোরণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

ওপরের এই পরস্পরবিরোধী খবর ছাড়াও, ঘটনা আরও গভীরে গিয়েছিল। যদিও জয়েন্ট সিপি ক্রাইম তার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিল বটে, কিন্তু শিকড় আরও গভীরে। আর এ থেকেই অনেক প্রশ্ন উঠে আসে।

ভিলে পার্লে ট্যাক্সি বিস্ফোরণে ঠিক কতজন মারা গিয়েছিল? সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তিনজন মৃত (চালক সহ), পাঁচ মাস পরে আদালতে পুলিশের দাবি মতো মৃত দুইজন (গোয়েল ও ট্যাক্সি ড্রাইভার)। যদি সত্যিই তিনজনের মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির পরিচয় কী? যখন প্রথম দিন থেকেই ভিলে পার্লের ঘটনায় ওই ট্যাক্সির নম্বর জানা ছিল, তখন কেনো সেই নম্বর ধরে গাড়ি নিয়ে ঠিকঠাক তদন্ত করল না ক্রাইম ব্রাঞ্চ? কী করে সিএসটি-র সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট, ভিলে পার্লেতে ট্যাক্সির মধ্যে থাকা এক ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত করতে পারলেন? অন্তত পুলিশ তো তেমনটাই দাবি করছে। মৃত গোয়েল ও তার শ্যালিকার সঙ্গে কী কী কথাবার্তা হয়েছিল, তা কি তাদের মোবাইল কল ডিটেলস থেকেই পুরোপুরি বোঝা সম্ভব? ওয়াড়ি বন্দর বিস্ফোরণে যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদের নাম কী? চার্জশিটে বলা হয় ওয়াড়ি বন্দর বিস্ফোরণে ট্যাক্সি ড্রাইভার সহ দুজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে। যদি তাই হয়, ওই মহিলাদের কি চিহ্নিত করা গেছে? মৃতদের দেহ কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়ছিল?

সিএসটি স্টেশনে যে দুই জঙ্গি তাণ্ডব চালিয়েছিল, আর যে পুলিশের কাছে কোণঠাসা হয়ে মসজিদ বন্দরের দিক থেকে পালাচ্ছিল, যুক্তি দিয়ে ভাবলে ধরা যাবে, ওয়াড়ি বন্দর বিস্ফোরণে তাদেরই মৃত্যু হয়েছিল। হাতে থাকা বিস্ফোরক নিয়ে ট্যাক্সি করে পালাতে গিয়েছিল তারা। অন্যদিকে বাকি দুজন রঙ্গভবন লেন এলাকা থেকে আসছিল, তারা বা ওই জঙ্গিদের যারা কভার করছিল, পালাতে গিয়ে তাদের মৃত্যু হয় ভিলে পার্লে ট্যাক্সি বিস্ফোরণে। এটাও হতে পারে, যে জঙ্গিরা আত্মঘাতী হয়েছিল। আসল চেহারা প্রকাশ হওয়ার ভয়ে হুজুরদের নির্দেশে তারা নিজেরাই আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারে। ওই চারজনের আসল নাম নিয়ে (ট্যাক্সি চালক ছাড়া) কিন্তু সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, কারণ হতে পারে ট্যাক্সি বিস্ফোরণে সত্যিই যাদের মৃত্যু হয়েছিল, তাদের পরিচয় গোপন রাখা হয়, সে জায়গায় দাঁড় করানো হয় মৃত জঙ্গিদের। এ জন্য যাদের এলাকায় বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেই ভিলে পার্লে পুলিশ স্টেশন, বায়কুল্লা পুলিশ স্টেশন, সিএসটি রেলওয়ে পুলিশ স্টেশনের আধিকারিকরা, রেলওয়ে আধিকারিকদের কয়েকজন মৃতদেহ যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই হাসপাতালের চিকিৎসক প্রত্যেককেই অন্ধকারে রেখে দেহ লোপাট করা হয়েছিল। কারণ হিসেবে গোপনীয়তার দোহাই দেওয়া হয়েছিল, 'কনফিডেনশিয়াল রিজন'।

খ. সরকারি গোপনীয়তা আইনের অপরাধ

২৬/১১ রাতে পুলিশের যে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হয়েছিল, সেই কথাবার্তা ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগে কয়েকটি টিভি চ্যানেল, ও সেই কথাবার্তা ও লগ বুক বাইরে পাচারের জন্য অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি গোপনীয়তা আইনের ৩, ৫ ও ৭ ধারায় মামলা দায়ের করে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ২০০৯-এর ২ মার্চ এই মামলা দায়ের হয়।

২০০৮-এর ৭ ডিসেম্বর, *এনডিটিভি ইন্ডিয়া, আইবিএন* ৭ এবং *আজ তক টিভি* এবং ২০০৯, ২৬ ফেব্রুয়ারি *টিভি* ৯ এই ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সম্প্রচার করে। সেখানে মুম্বাই পুলিশ কমিশনার, কিং নামে উল্লিখিত তার অফিসারদের মুম্বাই হামলা সামলাতে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করাচ্ছিলেন। রেকর্ডিং-এ পুলিশের গতিবিধি ও ঘটনা সম্পর্কে যে কেউ স্পষ্ট শুনতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হলো একটা নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আদৌ কি এই ধরনের কথাবার্তা সামনে আনা, সরকারি গোপনীয়তা আইনের তিন নং ধারা (গুপ্তচরবৃত্তি), ৫ নং ধারা (তথ্যের ভুল বার্তালাপ) এবং ৭ নং ধারা (পুলিশ অথবা সেনা সদস্যের কাজে হস্তক্ষেপ)-র আওতায় পড়ে? যদি তা পড়েই থাকে, তাহলে

কীভাবে? এই সব বিষয় মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের এফআইআর-এ উল্লেখ করা নেই। ধোঁয়া ধোঁয়া ধরনের একটা চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল।

আসলে মারাত্মক গোপন কোনো তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে, তা জঙ্গিদের হাতে পড়লে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, কিংবা তথ্য ফাঁসে তদন্তে কোনো প্রভাব পড়বে, এরকম কোনো উদ্বেগ আইবি বা ক্রাইম ব্রাঞ্চের ছিল না। আসল চিন্তা ছিল সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের যে পর্বটি নিয়ে এতদিন ধরে তারা মিডিয়া ও মানুষকে গালগল্প শুনিয়ে আসছিল, সেটা নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। মিডিয়া, মানুষ এমনকি সরকারকেও তারা যে বিষয়টা খাইয়েছে, পুলিশের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে সেটা ফাঁস হয়ে যেতে পারত। আইবি-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে আসল চেহারা সামনে আসতে পারত। আসলে এই ধারায় মামলা করে আর কিছুই নয়, সবাইকে একটা সতর্কতা দিয়ে রাখা হলো মাত্র। যে আর কেউ যদি ওই সব বা ওই ধরনের সিডি বা লগ বুক প্রকাশ করা বা সম্প্রচার করার চেষ্টা করে, তার ফল মোটেই ভালো হবে না। এই ধারায় মামলা ঠিকঠাক হলে কমপক্ষে ১৪ বছরের জেল তো হবেই। আইবি বা ক্রাইম ব্রাঞ্চ, ওই সব তথাকথিত গোপন তথ্য সম্প্রচারের জন্য টিভি চ্যানেল বা তা ফাঁস করার জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনো ব্যবস্থা নিত না। আসলে এটা একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল তারা। লক্ষ্য ছিল, ওই বিষয়গুলো আর দ্বিতীয়বার যাতে সাধারণের সামনে না আসে।

গ. প্রধান প্যানেল রিপোর্টকে লুকিয়ে রাখা নিয়ে সরকারের উদ্বেগ, নজর ঘোরানোর জন্য রিপোর্টের কিছু অংশ ফাঁস

২৬/১১-র ঘটনার তদন্তে গঠিত দুই সদস্যের প্রধান প্যানেলের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যাবে না বলে বিধানসভায় অবিবেচনাপ্রসূত একটা ঘোষণা করে দিয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকার। এর ঠিক কারণটা কী? তাদের কাছে মুখবন্ধ খামে করে প্রধান প্যানেলের রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা বলেছিল বম্বে হাইকোর্ট, এমন কী তাড়াহুড়ো ও প্রয়োজনীয়তা ছিল যে এই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ আনতে তড়িঘড়ি মহারাষ্ট্র সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হলো? সেটা কি এই কারণে, যে রিপোর্টে পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের টিম ওয়ার্ক নিয়ে ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে? নাকি আচমকা সমুদ্রতীরে নজরদারি কমানো নিয়ে? ১৯৯৩ সালের মুম্বাই হামলার পর সমুদ্রতীরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছিল। সমুদ্রপথে জঙ্গিরা হামলা করতে পারে, এই নিয়ে বার ছয়েক সতর্কতা জারি করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা, তা সত্ত্বেও নজরদারি না বাড়িয়ে উল্টো কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ডিসিপি (পোর্ট)-এর অধীনে থাকা পাঁচটি নজরদারি বোটকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। তাছাড়া একটি নামকরা দৈনিকে ২০০৯-এর জুলাই-অগাস্টে আরও কিছু তথ্য ছিল। রিপোর্টে বলা ছিল, ২০০৬ সালে মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের পর স্টাডি গ্রুপের একটি রিপোর্ট তিন বছর চেপে রাখা হয়। ফলে কুইক রিঅ্যাকশন টিম (কিউআরটি) দীর্ঘদিন ধরে গুলি চালানো অনুশীলন করতে পারেনি। পণবন্দিদের ছাড়ানোর জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণও তাদের মেলেনি। নরিম্যান হাউসে ইহুদিদের সেন্টার নিয়ে মুম্বাই পুলিশের কোনো ধারণাই ছিল না। ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কিছু সার্কুলার জারি করে, সেই সার্কুলার ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছতে পারেনি ডেস্ক অফিসাররা। এই সব কারণেই কি রিপোর্ট জনসমক্ষে আনতে আপত্তি ছিল সরকারের? নাকি প্রধান প্যানেল রিপোর্টে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আছে, যা এখনও জনসমক্ষে আসেনি?

সংযোজনী ক-এ কিছু আগেকার সংবাদপত্রের প্রতিবেদন রয়েছে। তা থেকে পরিষ্কার, ২০০৮-এর ১৯ নভেম্বর, সমুদ্রপথে মুম্বাই হামলা নিয়ে আইবি-র হাতে একদম নির্দিষ্ট তথ্য এসে গিয়েছিল। অথচ যার এটা আগে জানা দরকার, সেই মুম্বাই পুলিশের কাছেই খবর পৌঁছনো হয়নি। প্রধান প্যানেলের আরেক সদস্য, প্রাক্তন 'র' অফিসার ভি বালাচন্দ্রন তারই এক প্রাক্তন সহকর্মীকে দুঃখ করে করে বলেছিলেন, আইবি আর 'র' যা তথ্য পেয়েছিল এবং যে তথ্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানিয়েছিল, সেই তথ্য পর্যন্ত প্যানেলের কাছে তারা দিতে চায়নি (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, ২১ মে ২০০৯)। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘটনা সমস্ত সন্দেহকে আরও বেশি পাকাপোক্ত করল। আইবি যে কাজটি করেছিল, তা নিশ্চয়ই প্যানেল তাদের রিপোর্টে রেখেছিল (যদিও 'র' তাদের কর্তব্য ঠিকঠাকই পালন করেছিল)। আর তা থেকে নিশ্চয়ই তারা একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায় এসেছিল। বিস্তর যে সব অসঙ্গতি ছিল, তাও নিশ্চয়ই তাদের চোখে পড়েছে। পুলিশের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের সিডি-র সঙ্গে পুলিশের দাবির অসঙ্গতি নিশ্চয়ই তাদের চোখে পড়েছিল। তার সঙ্গেই খবরের কাগজ, টিভি, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানও নিশ্চয়ই প্যানেল খুঁটিয়ে দেখেছিল। তারা নিশ্চয়ই বুঝেছিল, আইবি নিয়ম মাফিক যে কাজগুলো করেনি, তা ভুলবশত মোটেই নয়, বরং ইচ্ছাকৃত।

তাদের হাতে আসা তথ্য পুলিশকে না জানানোটা আইবি-র তরফে পাহাড় প্রমাণ ভুল বলে মনে করেছিল প্যানেল। তবে তারা কিন্তু এটাও বলেছে, যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি হওয়া সার্কুলার ঠিকমতো ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারেনি ডেস্ক অফিসাররা। এই দুই ঘটনায় সাধারণ মানুষ একটু বিভ্রান্ত হতেই পারে। কারণ তারা মনে করতেই পারে, হয়তো আইবি খবর

দিয়েছিল, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের লোকেরা সেই তথ্য ঠিকঠাক পৌঁছতে পারেনি। এ বিষয়ে আমি পাঠকদের কিছু তথ্য দিতে চাই। আইবি তার তথ্য দেয় একমাত্র ডিজিপি, সিপি অথবা এসপি-কে। তাও মুখবন্ধ খামে। তাতে আবার সিক্রেট, টপ সিক্রেট এইসব লেখা থাকে। কোন অফিসারের কাছে পাঠানো হচ্ছে, তা নির্দিষ্ট করে লেখা থাকে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোড ল্যাঙ্গুয়েজ বা সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার হয়। সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে নিজে সেই খাম খুলে, নিজেকেই সে ভাষার মর্মোদ্ধার করতে হয়। কোনো বাবু বা কেউ এরমধ্যে থাকতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে, তথ্য ঠিক জায়গায় পৌঁছতে না পারার দায় ডেস্ক অফিসারদের ওপর চাপানো যায় না। আর যদি এইরকম কিছু দায় চাপানোর চেষ্টা চলে, তাহলে বুঝতে হবে জোর জবরদস্তি তা সাধারণ মানুষ, মিডিয়া ও সরকারকে খাওয়ানোর চেষ্টা চলছে।

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায়, প্রধান প্যানেল রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ এভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়া, আসলে নজর ঘোরানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই কাজটা মূলত আইবি-ই করিয়েছে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে দিয়ে। কারণ ক্রাইম ব্রাঞ্চের সঙ্গে মিডিয়ার হৃদ্যতা একটু বেশিই। একে তো অপরাধবোধ, তার ওপর সরকারও জনগণকে বিভ্রান্ত করার তো একটা ব্যাপার থেকেই যায়।

বিকল্প তত্ত্ব শক্তিশালী করার জন্য আরও কিছু প্রমাণ

অ. শ্রীমতি বিনীতা কামতের বই *টু দ্য লাস্ট বুলেট* এই বইয়ের বেশ কিছু তথ্যকে সমর্থন করে

কামা হাসপাতাল ও রঙ্গভবন লেনে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার বেশ কিছু তথ্য শ্রীমতি কামতের বইতে রয়েছে। তথ্যের অধিকার আইনে তিনি পুলিশের কিছু ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন পেয়েছিলেন, তা দিয়েই তিনি তার তথ্য সাজিয়েছেন। তিনি সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কথা বলেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গেও। তার মেলা কিছু তথ্য আমার এই বইয়ের সঙ্গে মিলে গেছে এবং তা আমার দেওয়া বিকল্প তত্ত্বকে আরও জোরালো করেছে।

১. স্ট্রিট লাইট নিভিয়ে দেওয়া, পরিকল্পনারই অঙ্গ

রঙ্গভবন লেনের ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র ভাগ্যবান পুলিশ কর্মী অরুণ যাদব বইটিতে বলেন, কামা হাসপাতালের পেছনের রাস্তার আলোগুলো নেভানো ছিল (পৃ. ৩২)। ষড়যন্ত্রকারীরা সেই দিন এভাবেই তাদের কাজ হাসিল করেছিল।

বইতে যেরকমটা বলা হয়েছিল, সিএসটি-তে থাকা ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরার যে সুইচ বন্ধ করা ছিল, সেটিও কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবেই করেছিল। *টাইমস অব ইন্ডিয়া* ভবনের পাশে ব্যস্ত রাস্তায় এভাবে লাইট বন্ধ রাখা পুরোপুরি ইছাকৃত। কারণ ওই খানেই কারকারেকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। ২০০৮-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে যেভাবে কারকারে দেশজোড়া সন্ত্রাসী জালের পর্দা ফাঁস করতে যাচ্ছিলেন, সেটা আটকাতে সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের বিষয়টি একদম পরিকল্পনা মাফিকই ছিল। আলো বন্ধের বিষয়টি আমার তত্ত্বটাকেই আরও শক্তিশালী করে।

২. কারকারে ও অন্যান্যদের যে দুই জঙ্গি খুন করেছিল, এবং কামা হাসপাতালের যে জঙ্গিরা, তারা ছিল আলাদা

শ্রীমতি কামতের বইতে এই নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে,

- বঙ্গভবন লেনের এক কোণে রাত ১১.৪৫ নাগাদ ইন্সপেক্টর ধুরগুড়ে জঙ্গিদের গুলিতে মারা যান। (পৃ. ৪২-৪৩)
- ওই একই সময় ভূষণ গাগরানির (প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, মেডিক্যাল এডুকেশন) ড্রাইভার মারুতি ফাড় ওই লেনেই গুলিতে জখম হন।
- আজাদ ময়দানের দুই কনস্টেবল একটি গাছের আড়াল থেকে এই ঘটনা দেখার পর, রাত ১১.৪৮ নাগাদ সাউথ কন্ট্রোলে খবর দেন। (পৃ. ৪৩-৪৪)
- বঙ্গভবন লেনের এক বাসিন্দা গোটা ঘটনাটি দেখার পর ১০০ ডায়াল করে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করেন। ১৫ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে ওই রাস্তায় জঙ্গিরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে খবর দেন তিনি। (পৃ. ৪৪-৫৩)
- বঙ্গভবন লেনে নার্সদের কোয়ার্টারে একদম ওপরের তলায় থাকা এক ছাত্রীর বয়ানে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়। "আমি ঘরে ফিরে একটু বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। কামা হাসপাতালে আচমকা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি লিফটে করে যখন নামলাম তখন আমার বন্ধুরাই জানালো যে জঙ্গিরা আমাদের লেনে ঢুকে পড়েছে।" (পৃ. ৫০)
- কামা হাসপাতালের পেছন দিকে যে কনস্টেবলরা ছিলেন, তারা বলেছিলেন, মাঝরাতের দিকে গাড়িতে বসা তিনজন অফিসার এসবি অফিসের দিকে গিয়েছিলেন। (পৃ. ৪৬)
- কামা হাসপাতালের সামনে আরও পুলিশ পাঠাতে বলার পর, সামনের গেট দিয়ে কারকারে ও তার টিম ঢুকতে যান। লক্ষ্য ছিল খুব পরিষ্কার।

একজন অতিরিক্ত সিপি আহত হয়ে ভেতরে আটকে পড়েছিলেন। আর সেখানে তখনও জঙ্গিরাও ছিল। (পৃ. ৪৬)

ওপরের এই তথ্যগুলো এক জায়গায় করলে বোঝা যাবে, বারোটা বাজার দশ-পনেরো মিনিট আগে দুজন জঙ্গি রঙ্গভবন লেনের দিকে গিয়েছিল। অতিরিক্ত সিপি-কে আহত করে ও কয়েকজনকে খুন করার পর মাঝরাত পর্যন্ত দুই জঙ্গি কামা হাসপাতালে ছিল। কামা হাসপাতাল ও রঙ্গভবন লেনের জঙ্গিরা যে আলাদা বলে আমি দাবি করেছিলাম, এই ঘটনায় সেই তত্ত্ব আবার প্রমাণিত।

৩. অফিসারদের ফাঁদে ফেলা

বইয়ের ছয় অধ্যায়ের পর্ব ৭-এ, ফাঁদে ফেলা হয়েছিল কারকারকে শীর্ষক লেখায় আমি ট্রায়াল কাট হেমন্ত কারকারের ওয়্যারলেস অপারেটর নীতিন মাথানের এজাহারের কথা বলেছিলাম। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* (পুনে, ১৬ জুলাই ২০০৯-এ যা প্রকাশিতও হয়েছিল। প্রতিবেদন থেকে এটা পরিষ্কার, কে পি রঘুবংশী কারকারেকে কামা হাসপাতালের পেছন দিকে ওই লেনের দিকে যেতে বলে। অথচ তখনও হাসপাতালে গুলি চলছিল। কারকারের সঙ্গে যোগ দেন কামতে ও সালাসকার। কিন্তু যেহেতু আমার হাতে পাকাপোক্ত কোনো প্রমাণ নেই, তাই ওই দলকে নিশ্চিত করে কী ভাবে এসবি অফিসের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সব শেষে রঙ্গভবন লেনের মৃত্যু ফাদে তাদের ফেলা হলো, সেটা বলা মুশকিল। তবে কী ঘটেছিল আমার হাতে যেসব তথ্য এসেছে তা দিয়েই আমি তার একটা যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারি। সরকারি ভাবে যে রেকর্ড শ্রীমতি কামতের হাতে এসেছিল, তা থেকে তিনি যে তদন্তটি চালিয়েছিলেন তাতে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। শ্রীমতি কামতের বইয়ের সঙ্গে এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সাত নং পর্ব মিলিয়ে ঘটনা পরম্পরার একটা সুতো আমি গাঁথতে পারি।

৪. মিথ্যে স্কোডা তত্ত্ব

এই বইতে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ও যুক্তির ভিত্তিতে পুলিশের স্কোডা তত্ত্বকে খারিজ করা হয়েছে। শ্রীমতি কামতে তার বইয়ে দেখিয়েছেন, হামলার মাঝে পড়েও একমাত্র জীবিত পুলিশ কর্মী অরুণ যাদব কোয়ালিশ গাড়ির ওয়্যারলেস থেকেই কিন্তু কন্ট্রোল রুমে ফোন করেছিলেন।

৫. কন্ট্রোল রুমের গুরুত্বপূর্ণ কিছু রেকর্ড সংগ্রহ

শ্রীমতি কামতের কাছে মুম্বাই পুলিশ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের সম্পূর্ণ কল রেকর্ডস (কল লগস, অডিও ট্রান্সক্রিপ্ট) তুলে দেয়নি। কিন্তু এর মধ্যে থেকেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে,

- রাত ১১.২৪ এবং ১১.২৮-এ হেমন্ত কারকারে কন্ট্রোল রুমে কল করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, এটিএস কিউআরটি এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চের টিম এসবি ২-এর দিকে (কামা হাসপাতালের পেছনের গেট) রয়েছে। তিনি অনুরোধ করেন, যেহেতু হাসপাতালে তখনও গোলাগুলি চলছিল, তাই সেই দলটিকে যাতে হাসপাতালের সামনের দিকে আনা যায়। মেসেজ পাওয়ার কথা কন্ট্রোল রুম স্বীকার করে রাত ১২.৩০-এ (পৃ. ৪১-৪২)
- কারকারের কলের জেরে কামা হাসপাতালের সামনে কোনো দল পৌঁছেছিল কিনা, তার কোনো রেকর্ড পাওয়া যায়নি। শ্রীমতি কামতে দুঃখ করেন, রাত ১১.৩৩-এ কন্ট্রোল রুম কারকারের সঙ্গে শেষবার যোগাযোগ করতে পেরেছিল। কারকারের কাছ থেকে কোনো উত্তর আসেনি। প্রায় মিনিট পনেরো সবকিছু চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। (পৃ. ৪৪-৪৫)
- শ্রীমতি কামতে আরও দেখেন, রাত ১১.৫ থেকে সবাই প্রায় জানত যে দাঁতে কামা হাসপাতালে ফেঁসে গেছেন। কিন্তু ওই হাসপাতাল কন্ট্রোল রুম ও সিপি অফিসের মিনিট খানেক দূরত্বে হলেও, ঘন্টার পর ঘন্টা কোনো পুলিশ টিম পাঠানোই হয় না (৬০)

    এই ঘটনাতেও শ্রীমতি কামতে সিদ্ধান্তে আসেন যে, অতিরিক্ত সিপি দাঁতেকে উদ্ধার করতে হাসপাতালের সামনের গেট অন্তত কোনো পুলিশ দলই যায়নি।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতি কামতের বইটি প্রকাশ হওয়ার পর *সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়ায়* (২৯ নভেম্বর ২০০১) একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পুলিশ লগের উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়, ২৬/১১-র রাত ১০.২৯ থেকে ২৭ নভেম্বর ১২.১১ পর্যন্ত কামা হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায় অন্তত্তপক্ষে ২৪টি পুলিশ টিম পাঠানো হয়েছিল...আজাদ ময়দান পুলিশ স্টেশন থেকে প্রথম টিমটি কামা হাসপাতালে যায়, এরপর রাত ১১.১১টা পর্যন্ত আরও ১১টি টিম যায়...রাত ১১.২৫ থেকে রাত ১২.১১ পর্যন্ত আরও ডজনখানেক টিম পৌঁছায় মোট ২৪টি টিম কামা হাসপাতালে যায়। *টাইমস অব ইন্ডিয়া* (পুনে, ডিসেম্বর ২, ২০০৯) এই একই খবর ফের প্রকাশ করে। আরও বলা হয়, ১৫০ জন নাকি সেখানে পৌঁছেছিল।

এই খবরে দুটি বিষয় প্রমাণ হয়, ১. সিএসটি-তে গুলি চালানো বন্ধ হওয়ার আগেই রাত ১০.২৯-এর আগে কামা হাসপাতালে গুলি চালানো শুরু হয়। ২. রাত ১১.২৪ থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত হেমন্ত সরকারের কলের পরেই কামা হাসপাতালে টিম পাঠানো হয়। কিন্তু শ্রীমতি কামতের দাবি ছিল কারকারের খবরে কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি, অতিরিক্ত সিপি-কে উদ্ধার করতে সিএএমএ হাসপাতালে কেউই যায়নি। এই সিদ্ধান্তে তিনি এলেন অরুণ পুলিশ টিমের গতিবিধি সংক্রান্ত ওয়্যারলেস লগ (যথা, কন্ট্রোল রুমে খবর আসার সময়, নির্দিষ্ট জায়গায় টিমের পৌঁছানোর সময়, তারা যা যা ব্যবস্থা নিয়েছিল তার বিশদ বিবরণ ইত্যাদি) এবং কাম হাসপাতালে পরবর্তী যা যা ঘটেছিল তার ওয়্যারলেস লগ (যথা, কখন পুলিশের ওই টিমগুলো সেখানে পৌঁছায়, কে দাঁতেকে উদ্ধার করে, কখনই বা করে, কতক্ষণ হাসপাতালে গুলি চলে, কখন তা থামে, ইত্যাদি) শ্রীমতি কামতের হাতে এসে পৌঁছয়নি। আর যদি সত্যিই এরকমটা ঘটে থাকে, তাহলে রঙ্গভবন লেনের ঘটনার এক ঘণ্টা আগেই যে পুলিশ টিম কামা হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিল, এটা সরকার গোপন করতে চাইছে কেনো? পুলিশ টিম কাকে বাঁচানোর জন্য সেখানে গিয়েছিল?

এই ঘটনায় যে প্রশ্নগুলো খুব স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে তা হলো,

কামা হাসপাতালে শক্তিশালী দেড়শো জনের টিমের নেতৃত্বে কোনো শীর্ষ আধিকারিক ছিল? কেনো সে তার দলকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে জঙ্গিদের নিকেষ করল না? রঙ্গভবন লেনে ১১.৪৫ নাগাদ পিআই ধুরগুড়েকে গুলি করে মারে জঙ্গিরা। তারপরেও দশ থেকে পনেরো মিনিট সে রাস্তায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল তারা। কেনো তাদেরকে আটকাতে সেখানে ছুটে গেল না পুলিশ? হেমন্ত কারকারে বারবার বলা সত্ত্বেও কেনো পুলিশ দিয়ে হাসপাতাল ঘিরে ফেলাল না ওই অফিসার? নাকি তাকে কেউ নির্দেশ দিচ্ছিল আর সেই নির্দেশের মধ্যে এই কাজগুলো ছিল না।

শ্রীমতি কামতে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি রেকর্ডের পুরোটা হাতে পাননি। সেই খারাপ লাগা থেকে তিনি বলেন, অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছিল, কিন্তু অদ্ভুতভাবে কন্ট্রোল রুমের কাছ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। যদি এত কিছুই ঘটে থাকে, তাহলে তার কোনো রেকর্ড আরটিআই করেও হাতে আসেনি (পৃ. ৪৫)। তার হতাশা আরও বোঝা যায়, যখন তিনি বলেন, এখনও অনেক প্রশ্ন আছে। আসল জিনিসগুলো আমায় দেখাতে কেনো তারা এত অনিচ্ছুক আর একগুয়ের মতো আচরণ করল? (পৃ. ৬৮)

ম্যাডাম, উত্তরটা খুবই সহজ। যদি তারা কন্ট্রোল রুমের আসল সব কিছু সামনে এনে ফেলত, সিএসটি-র গুলি চালানোর ঘটনা থেকে শুরু করে গিরগাঁও চৌপট্টির এনকাউন্টার নিয়ে আইবি আর ক্রাইম ব্রাঞ্চের আষাঢ়ে গল্পের পর্দা ফাঁস হয়ে যেত। শোচনীয় ভাবে মুখোশ খুলে যেত আইবি-র। এটা তো জানা হয়ে গেছে যে সিএসটি গুলি চালানো শেষ হওয়ার আগেই কামা হাসপাতালে গুলি চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল আর এটাও জানা, যখন কামা হাসপাতালে গুলি চলছিল, তখন আরও দুই জঙ্গি রঙ্গভবন লেনে অবাধে দাপাচ্ছিল। প্রচুর পুলিশ কামা হাসপাতালের সামনে গেলেও জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। কোনো পুলিশকেই রঙ্গভবন লেনে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অথচ তাদের কাছে তথ্য ছিল। কন্ট্রোল রুমে সে খবর গিয়েছিল। কামা হাসপাতালের সামনে যে শীর্ষ কর্তা ছিলেন, কন্ট্রোল রুম থেকে স্বাভাবিক ভাবেই তার কাছে খবরও গিয়েছিল। স্কোডা গাড়ি ছিনতাই করে চৌপট্টির দিকে জঙ্গিরা পালাচ্ছে এরকম কোনো খবর কন্ট্রোল রুম পায়নি। যদিও চৌপট্টির কয়েকজন অফিসার এই ঘটনা শুনেছিলেন। এই ঘটনাগুলো সামনে আসার কারণেই সিডি ও লগ বুক ফাঁস করার অভিযোগে কয়েকজন সন্দেহভাজন অফিসারের বিরুদ্ধে সরকারি গোপনীয়তা আইনে মামলা করে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আইবি ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের অপরাধবোধ শীর্ষক অধ্যায়ে এই নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যাও রয়েছে।

আ. প্রধান কমিটির রিপোর্ট পেশ করার প্রহসন

নভেম্বর ২০০৯-এ কিছু ঘটনা ঘটে, যার জেরে বিধানসভায় প্রধান কমিটির রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হয় মহারাষ্ট্র সরকার। ওই সময়েই হেমন্ত কারকারের স্ত্রী কবিতা কারকারে ইউপিএ চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করেন। তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল সেটা জানা অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু তার পর পরই মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী অশোক চতুনকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। তারপরেই ডিসেম্বরের শীতকালীন অধিবেশনে কমিটির রিপোর্ট সামনে আনার ব্যাপারে একটা জল্পনা শুরু হয়ে যায়। রিপোর্ট পেশ করার আগে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে।

১. দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধান প্যানেলের রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমের সামনে ফাঁস হয়ে যায়। এবার রিপোর্ট আদৌ কতটা ঠিকঠাক হতে পারে, তার একটা আভাস সামনে আসে। স্পাইরাল বাউন্ডিং করা কপিটি টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধৃত করার সময় খবরের কাগজগুলো রিপোর্টের পাতাগুলোর উল্লেখ করতে থাকে। এছাড়াও কপিটি কয়েকজন বিরোধী দলের নেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা

করা হয়। অবশ্যই সরকারের তরফে এ রিপোর্ট ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আইবি-র নির্দেশে। যদিও দ্বিতীয়বার ফাঁস হয়ে যাওয়ার এই ঘটনার লক্ষ্য কিন্তু ছিল অন্য। রিপোর্ট প্রথমবার ফাঁস হয় ২০০৯, জুলাই-আগস্টে। আইবি ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের অপরাধবোধ শীর্ষক অধ্যায়ে তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ওই সময়ে সাধারণ মানুষ, সরকার ও সংবাদমাধ্যমের নজর ঘোরাতে ওই কীর্তি ইচ্ছাকৃত ভাবেই করেছিল আইবি। কিন্তু দ্বিতীয়বার ফাঁসের কারণটা একটু আলাদা। আসলে দেখার চেষ্টা হয়েছিল, আর কেউ পুরো রিপোর্টটা সম্পর্কে কিছু জানত কিনা।

২. দ্বিতীয়বার রিপোর্ট ফাঁসের ঘটনায় সরকারের ভূমিকা ছিল বেশ স্পষ্ট। তবে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের আগে সাংবাদিকদের বেশ সতর্কভাবেই বলেছিলেন, আমার এই নিয়ে কিছু বলার নেই। প্রধান কমিটির রিপোর্ট ফাঁস হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি আমি অস্বীকারও করছি না, নিশ্চিত করে কিছু বলছিও না (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ডিসেম্বর ২, ২০০৯)

৩. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে, *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে (২০০৯, ডিসেম্বর ২) জানায়, ক. কাসভের বিচার শেষ হলে সরকার এই রিপোর্টকে জনসমক্ষে আনতে কোনও দ্বিধা করবে না। খ. স্পেশাল কোর্টের যে শুনানি চলছে তার সঙ্গে রিপোর্টে থাকা কিছু কিছু তথ্যের মিল নাও থাকতে পারে। এবং গ. কমিটি তদন্তের সময় আদৌ সব তথ্য হাতে পেয়েছিল কিনা, তা নিয়ে ভাবার রয়েছে।

৪. দ্বিতীয়বার রিপোর্ট ফাঁস করার পর সরকার যখন দেখল, রিপোর্ট সম্পর্কে জানেন এরকম কেউ তা নিয়ে হইচই করলেন না, তখন ২০০৯-এ ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিধানসভায় সে রিপোর্ট পেশ করল সরকার।

৫. রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হয়েছিল ২০০৯, ১৬ ডিসেম্বর। রিপোর্টের যেটুকু ফাঁস হয়েছিল, পেশ হওয়া রিপোর্ট ছিল সেইসব নিয়েই। কখনই গোটা রিপোর্টটি পেশ করা কিন্তু হয়নি। পেশ হওয়া রিপোর্টে মারাত্মক গোপনীয় তেমন কিছুই ছিল না। অথচ এই গোপনীয়তার কারণ দেখিয়েই আগেকার অধিবেশনগুলোতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ওই রিপোর্ট পেশে রাজি ছিলেন না। শুধু কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাই বলা হয়েছে এখানে।

বিধানসভায় যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল, তার সত্যতা নিয়ে কিন্তু ভাবার বেশ কিছু কারণ রয়েছে—

কমিটিকে আইবি এবং 'র' সম্পূর্ণ তথ্য হাতে তুলে দেয়নি। এই নিয়ে *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* ৩১ মে, ২০০৯-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কমিটির দ্বিতীয় সদস্য ভি বালাচন্দ্রন এই নিয়ে তার এক প্রাক্তন সহকর্মী রমনের কাছে আক্ষেপও করেছিলেন। ফলে কমিটি তাদের রিপোর্ট নিশ্চিত ভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অসহযোগিতা নিয়ে বিষোদগার করেছিল। অথচ জনসমক্ষে আসা রিপোর্টে তার কোনো রকম উল্লেখই ছিল না।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার অশোক কামতের স্ত্রী বিনীতা কামতে তার বই *টু দ্য লাস্ট বুলেটে* অভিযোগ করেন, মুম্বাই পুলিশ তাঁকে আসল ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের অডিও ও লগ বুক দিতে অস্বীকার করেছিল। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল, সেই সবগুলো নাকি তারা প্রধান কমিটির কাছে আগেই দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যখন কমিটির কাছে শ্রীমতি কামতে এই বিষয়টি নিয়ে খোঁজ খবর করেন, তখন কমিটির তরফ থেকে তাঁকে বলা হয় ওয়্যারলেস কল লগ-এর শুধুমাত্র নকল কপিগুলোই তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। সম্পূর্ণ কল রেকর্ডস দেওয়া হয়নি (পৃ. ৬৫)। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আসল কপিগুলো রয়েছে কার কাছে? কেনই বা পুলিশ সেগুলো চেপে যাচ্ছে? এটাও পরিষ্কার হয়নি, যে প্রধান কমিটি যে কপিগুলো পেয়েছিল, সেগুলো কী গোটা কথাবার্তার কপি, নাকি তার থেকেও কাটছাঁট করে কমিটির হাতে সেসব তুলে দেওয়া হয়েছিল? যেহেতু কমিটির সদস্যরা প্রাক্তন উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক ছিলেন, তাই তারা এই সব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারেন না, করেনও নি। তবে তারা যদি পুরো কথাবার্তা না পান, তাহলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন। আবার তারা যদি পুরো রেকর্ড পেয়ে যেতেন, তাহলে নিশ্চয়ই পুলিশের বানানো গল্পের সঙ্গে বিস্তর অসঙ্গতির কথা তুলে ধরতেন। কামা হাসপাতালের সামনের গেটের যে বিষয়টি, তা নিয়ে পরবর্তীকালে যা লেখালেখি হয়, তা হলো—

সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া (মুম্বাই ২৯ নভেম্বর ২০০৯) এবং *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া* (পুনে, ২ ডিসেম্বর ২০০৯)-তে বলা হয়, জঙ্গি মোকাবিলায় পুলিশ লগ অনুযায়ী ছাব্বিশ তারিখ রাত ১০.২৯ থেকে রাত ১২.১১ পর্যন্ত ২৪টি আলাদা আলাদা টিম (দেড়শোরও বেশি পুলিশকর্মী) কামা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। যদি কমিটির সদস্যদের হাতে পুরোপুরি সব রেকর্ডই থাকত, তাহলে কামা হাসপাতালের সামনের গেটে দায়িত্বে থাকা শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে দোষী ঠাওরাতেন তারা। পুলিশকে যে হাসপাতালের ভেতর পাঠানো হয়নি, জঙ্গিদের

অবস্থানের খবর থাকা সত্ত্বেও, হাসপাতালের সামনের গেট থেকে কয়েক পা দূরে যেখানে পি আই ধুরগুড়ে গুলি খেয়ে পড়েছিলেন সেই রঙ্গভবন লেনের দিকে কেউ যে যায়নি, সেসব জানার পর নিশ্চয়ই প্রধান প্যানেল তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করত। যেভাবে তিনজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককে খুন হতে হলো, তার দায় ছিল কামা হাসপাতালের সামনে পুলিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ কর্তার। তার এই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ নিয়ে প্যানেল নিশ্চয়ই কড়া শাস্তির নির্দেশ দিত।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে, বিধানসভায় কমিটির যে রিপোর্ট পেশ হয়েছিল, তাতে এই সব ঘটনার কোনো উল্লেখই ছিল না। এতেই বোঝা যায়, রিপোর্টের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চেপে যাওয়া হয়েছিল। এমনকি মহারাষ্ট্র বিধানসভায় মূল বিরোধী দল শিবসেনা পর্যন্ত রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। শিবসেনার মুখপাত্র নীলম গোরহেরাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্যানেলের রিপোর্ট গোপন করার অভিযোগ তুলেছিলেন। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ডিসেম্বর ৩১, ২০০৯)

এই ঘটনায় সবথেকে অস্বস্তিকর প্রশ্নটা হলো, সরকারের এরকম সিনিয়র আমলারা এই আংশিক অসত্য রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে সহমত হলেন কী করে? তারাও কি আইবি-র গিমিকের ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন? নাকি তাদের কোনো দায় ছিল? যদি গোটা ঘটনার তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে কোনো স্বাধীন সংস্থাকে দিয়ে না করানো হয়, তাহলে এই প্রশ্নগুলো ঘুরতেই থাকবে।

ফের তদন্ত শুরু করার জন্য একটা আদর্শ মামলা

ওপরের সমস্ত তথ্য যদি এক জায়গায় করা যায়, তাহলে পুনর্তদন্তের জন্য এই ধরনের মামলা হলো আদর্শ।

৭. মুম্বাই হামলার তদন্ত

- মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ হাতের পুতুল, তদন্তভার কার্যত
- আইবি আর এফবিআই-এর হাতেই

আইবি ও এফবিআই-এর ফায়দা

সবাই জানেন মুম্বাইয়ে ২৬/১১ হামলার তদন্ত করেছিল মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। কিন্তু খবরের কাগজে যে খবরগুলো বেরিয়েছিল, তার মধ্যেকার খবরগুলো একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, মুম্বাই হামলার তদন্তভার সামলেছিল কার্যত আইবি আর এফবিআই দুই দফতর মিলেই। মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাদের হাতের পুতুল ছিল মাত্র। এই মামলা থেকে আইবি ও এফবিআই দুই সংগঠনেরই ফায়দা তোলার ছিল। সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনার প্রেক্ষিতে আইবি যেখানে অনেক কিছু চেপে যেতে চেয়েছিল, সেরকমই তাজ-ওবেরয়-নরিম্যান হাউসের ঘটনায় বেশ কিছু জিনিস লুকোতে চেয়েছিল এফবিআই। একসঙ্গে তদন্ত চালিয়ে, মিলিজুলি চার্জশিট পেশ করে দুই তরফেই স্বার্থরক্ষা হয়েছিল।

চার্জশিট এবং প্রমাণ

মামলার নিয়ম মাফিক তদন্ত সংস্থা মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ চার্জশিট পেশ করে। ১১ হাজার ২৮০ পাতার চার্জশিটে মারাত্মক প্রমাণ হিসেবে কী ছিল? মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট ফোন, জিপিএস ডিভাইস, আততায়ী ও তাদের হ্যান্ডলারদের ইমেল আইডি, ভিওআইপি, কিছু ডিভাইস, আজমল কাসভের জবানবন্দি, তাকে শনাক্তকরণের জন্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, কিছু জঙ্গির ডিএনএ নমুনা, আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, এম ভি কুবের নামে ভেসেলের কাঁচের দরজায় থাকা আঙুলের ছাপের সঙ্গে আজমল কাসভের আঙুলের ছাপ মিলে যাওয়া। সংবাদমাধ্যমের কাছে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর সময়ে এই বিষয়টির উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছিল।

সংবাদপত্রের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকেই বোঝা গিয়েছিল, যেখানে জিপিএস, ভিওআইপি, স্যাটেলাইট ফোন, ইমেইল এমনকি কিছু মোবাইল ফোন নিয়ে যে তদন্ত, সেটা এফবিআই-ই করেছিল, সেখানে আদালতেও সেসব জিনিস প্রমাণ করার ভার ছিল তাদেরই হাতে। যেহেতু ওই সব জিনিসের টেকনোলজি নিয়ে তখনও ক্রমপরিবর্তন পর্যায়ে চলছিল, সে কারণে আদালতে এই সব নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তই একদম পাকাপাকি বলে গণ্য হচ্ছিল না। সে কারণে এই সব তথ্যপ্রমাণ যে কতটা খাঁটি, তা আদালতকে বোঝাতে এফবিআই এবং ক্রাইম

ব্রাঞ্চ উঠেপড়ে লেগেছিল, যে এই সব বিষয় নিয়ে মোটেই ছেলেখেলা করা যায় না, যা রেকর্ডিং হয়ে গেছে সেটা নষ্ট করাও যায় না, সেটার বিকৃতিও সম্ভব নয়। আর যদি সে সব করাও হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা ধরে ফেলা যাবে। যদি আদালতের বিশ্বাস না হয়, ইচ্ছে হলে তাহলে তারা নিজেরাও বিশেষজ্ঞদের ডেকে ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ খবর নিতেই পারে।

এছাড়া ডিএনএ ও আঙুলের ছাপের যে বিষয়টি, সেটিও সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল না। অভিজ্ঞ তদন্তকারী যে কোনো অফিসারই বুঝবেন, ডিএনএ টেস্ট থেকে সূত্র পাওয়াটা কতটা কঠিন কাজ। আর তাছাড়া একটা মাছধরার ট্রলার বা ছোট রাবার বোট থেকে সেসব মিলেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। জঙ্গিরা ট্রলার ও বোট খালি করার জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা তো মাঝ সমুদ্রেই ভেসে ছিল সেটি। আসলে এই সব প্রমাণের আমদানি তদন্তকারীদের মাথায় এসেছে অনেক পরে। যখন আজমল কাসভকে অনিতা উদ্যয়া চিনতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং কাসভের হইচই ফেলে দেওয়া ছবি নিয়ে যখন বিশেষজ্ঞ ও বিদেশি সংবাদমাধ্যমও সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছিল, তারপরেই এই সব প্রমাণ আমদানি করার ভাবনা আসে।

আর আজমল কাসভের শনাক্তকরণ বা তার জবানবন্দির বিষয়টি নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো। এই ধরনের প্রমাণের ওপর বিশ্বাস করার মতো হাস্যকর আর কিছু নেই। এমনকি ছোটখাটো কোনো অপরাধেও কেউ ধরা পড়লে, আদালতে তোলার সময় তার মুখ ঢাকা রাখা হয়। আর এই ঘটনায় দেখুন, একজন অভিযুক্ত যার মুখ গোটা বিশ্বকে নানান দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো। কোনো বিরতি না রেখে টানা ছয় মাস ধরে প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে 'শনাক্ত' করে গেল। এর থেকে হাস্যকর আর কী হতে পারে? একই কথা বলা যায় পুলিশ হেফাজতে থাকার সময় কাসভের জবানবন্দির বিষয়েও। দীর্ঘদিন পুলিশ হেফাজতে থাকার সময়, একমাত্র জীবিত জঙ্গি'র তকমা লাগানো কারোর জবানবন্দি বিশ্বাস করবে না পৃথিবীর কোনো আদালত। কোনো কোনো নিয়মের ফাঁক গলে এই জবানবন্দি যদি গ্রাহ্যও হয়ে যায়, তবে উচ্চতর আদালতে তা মোটেই ধোপে টেকে না।

আদালতের কোর্টেই বল

এখন আদালতের কোর্টেই বলটিকে ঠেলা হয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে আদালত এখন কী করবে বা আদালত কী করতে পারে। আইবি ও এফবিআই যে বিষয়টি সামনে দাঁড় করেছে, তার ভিত্তিতেই যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ফৌজদারি দায়রায় মামলা চালানো হয়, তাহলে কিন্তু কাজটা খুবই সহজ। আর একমাত্র

জীবিত কাসভকে নিয়ে যেটা বলার, সেটা হলো দেশের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ইতিমধ্যেই তাকে নিয়ে তাদের বিচার করে ফেলেছে। শুধু শাস্তিই নয়, কোথায় কখন সেই শাস্তি দেওয়া হবে, সেটাও ঠিক করে ফেলেছে তারা। আর বাকি অভিযুক্ত যারা, কাউকে হত্যা করা হয়েছে, আর কেউ লুকিয়ে আছে দেশের বাইরে। সমাজ ও আদালতের তত্ত্বগত আলোচনাতেই তারা থাকবে কিছুদিন। তারপর আর পাত্তা দেওয়া হবে না তাদের।

তবে যদি আদালত তদন্তের কাগজপত্র একটু খুঁটিয়ে দেখে এবং বিকল্প কোনো তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে, চার্জশিট আর লোক দেখানো প্রমাণকে ছাড়িয়ে আরও একটু এগিয়ে যায়, তাহলে এই ভাবে এগোনো যেতে পারে।

১. মুম্বাই জঙ্গি হামলার দুটো ভাগ রয়েছে। একদিকে তাজ-ওবেরয়-নরিম্যান হাউস, এবং অন্যদিকে সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ভাগ। দুটোকে একদম আলাদা করে ভাবতে হবে, কারণ দুটো দুরকম অপরাধ, দুটোর অভিযোগ আলাদা ভাবে দায়ের করে তদন্ত করা উচিৎ।
২. যেহেতু আইবি ও এফবিআই-এর এই মামলায় বিস্তর স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। তাদের হাত থেকে এই মামলা সরিয়ে রাখতে হবে। এমনকি মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং আইবি ঘনিষ্ঠ ও আইবি-র চাপে ক্লিষ্ট অফিসারদের এই মামলা থেকে সরিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু করা প্রয়োজন।
৩. নির্দিষ্ট সময়ে নতুন ভাবে দুটি ঘটনার তদন্তভার দেওয়া উচিৎ নতুন একটি টিমকে—যে টিমের পুলিশ অফিসারদের মধ্যে সংহতি থাকবে, সততা থাকবে, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা থাকবে।
৪. নতুন টিমকে এই বিষয়গুলোকে জরুরি ভিত্তিতে হেফাজতে নেওয়ার কথা বলতে হবে,
    - বিস্ফোরণের প্রথম দিন থেকে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের কথাবার্তার সিডি বা অডিও টেপ, লগ বুক।
    - হামলার বিভিন্ন জায়গায় থাকা সিসিটিভির ফুটেজ।
    - সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে যে যে অফিসার ছিলেন, হেমন্ত কারকারে সহ তাদের মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড।
    - হামলার প্রথম দুদিনে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ভিডিও ক্লিপস।
    - ২০০৮ এর ২৭ ও ২৮-এ নভেম্বরের বিভিন্ন খবরের কাগজের প্রতিবেদন জরুরি। কারণ ওই সময়ে কোনো নজরদারি চাপানো হয়নি। তদন্তকারী অফিসারদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে হাতে

আসা সিডি, ভিডিও কোনো ভাবেই বিকৃত বা নকল না হয়। সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৫. সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের জঙ্গিদের সঙ্গে কথা বলেছেন এরকম বেশ কয়েকজন রয়েছেন। কমপক্ষে তিনজন এরকম প্রত্যক্ষদর্শীর হদিস মিলেছে,

- সিএএমএ হাসপাতালের একজন কর্মচারী, যাঁর সঙ্গে মারাঠিতে স্বচ্ছন্দেই কথা বলেছিল এক জঙ্গি।
- চন্দ্রকান্ততিখে, সিএএমএ হাসপাতালের জেনারেটর অপারেটর, যাকে জঙ্গিরা জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি হিন্দু না মুসলিম।
- মারুতি ফাদ, আইএএস অফিসার ভূষণ গগরানির ড্রাইভার। তিনজন অফিসারকে যে জঙ্গিরা খুন করেছিল, তাদের মধ্যে একজনকে তিনি দেখেছিলেন। দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানের দোহাই দিয়ে, আইবি-র তত্ত্ব অনুযায়ী তাদের সাজানো জবানবন্দি দিতে হয়তো বাধ্য করেছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। খোলামেলা পরিবেশে তাদের তথ্যগত ও সত্যি জবানবন্দি নেওয়াটা ভীষণ জরুরি।

৬. কাফে প্যারেডের কাছে বধওয়ার পার্ক এলাকার বাসিন্দা অনিতা রাজেন্দ্র উদ্যয়া ছয়জন জঙ্গিকে একটা এয়ার বোট থেকে নামতে দেখেছিলেন। যে রাতে হামলা হয়, সেদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ জঙ্গিদের মুম্বাইয়ের সমুদ্র সৈকতে নামতে দেখা যায়। তিনি জঙ্গিদের স্পষ্ট দেখেছিলেন, তাদের সঙ্গে কথাও বলেন। 'একমাত্র জীবিত জঙ্গি' ওই জঙ্গি দলেই ছিল কিনা, অনিতা সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন।

৭. অভিযানের সময় জঙ্গিরা যে দুটি ফোন থেকে কথা বলেছিল, সিএসটি স্টেশন থেকে সেই মোবাইল দুটি উদ্ধার করা হয়েছিল। পুলিশি তদন্তে জানা যায় মোবাইলের সিম কার্ডগুলোর সঙ্গে সাতারা জেলার যোগ রয়েছে। কিন্তু এই নিয়ে বিশদ কোনো তদন্তই হয়নি। নতুন তদন্তকারী দলটি ওই সিমকার্ডের কল ডিটেলস নিয়ে তদন্ত করে আসল অপরাধীদের খুঁজে বের করুক।

এই মামলার পুনর্তদন্তের যে ইচ্ছে প্রকাশ করছি, তা আজমল কাসভকে ফাঁসি থেকে বাঁচানোর জন্য তেমনটা কিন্তু নয়। আসলে এই ইচ্ছে দেশের অতি সরল ৯৯ শতাংশ মানুষকে ১ শতাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খপ্পর থেকে বাঁচানোর জন্য।

বৌদ্ধিক ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ানোর জন্য। পাকিস্তানের ভূত দেখিয়ে যেভাবে ভারতীয় মুসলিমদের ছোট করা হয়, হেয় করা হয়, এই মামলার ঠিকঠাক তদন্ত হলে, আইবি-র সেই চক্রান্তের মুখোশ খুলে যাবে। হেমন্ত কারকারে যে কাজটি করছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের আসল চেহারাটাও জনসমক্ষে আসবে এই মামলার স্বচ্ছ তদন্তে।

সবাই কেনো ওদের ইচ্ছেতেই চলেছিল

এই গোটা পর্বটিতে একটা বিষয় বেশ ভাববার। সেটা হলো ওরা যেটা চেয়েছিল, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকে ঠিক সেই ভাবেই কাজ করেছিল কেনো।

১. আইবি

'র' এবং আমেরিকার কাছ থেকে তথ্য মিলেছিল, সেটা মুম্বাই পুলিশ ও পশ্চিমা নৌ কমান্ডের কাছে পৌঁছে না দেওয়ার মতো এতবড় ঝুঁকিটা আইবি কী করে নিল?

প্রথমত, ১৮৯৩ সাল থেকে হিন্দুরাষ্ট্র (পড়ুন ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজ্য) গঠনের ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির দল। এরজন্য দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল তারা। সেই সব কিছু যেভাবে হেমন্ত কারকারে ফাঁস করে দিতে যাচ্ছিলেন, সেটা আটকানোটাই মরণ বাঁচন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের থেকেও বড় ব্রাহ্মণ্যবাদী আইবি, তাই বড়সড় ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জানত, পাহাড় প্রমাণ ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও তারা ঠিকঠাক বেরিয়ে যাবে, সরকারকেও সামলে নেবে বিশেষ বিশেষ কিছু কথা বলে। যেমন, এরর অব জাজমেন্ট, ট্যাকটিকাল মুভ কিংবা কোভার্ট অপারেশন। অথবা সেই সব একঘেঁয়ে গৎবাঁধা কথা, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অথবা ইন্টারন্যাশনাল রিলেসনস। এটাই তো দশকের পর দশক করে আসছে তারা।

২. সরকার ও রাজনৈতিক নেতারা

এটা ভাবতে অবাক লাগে আমাদের সরকার, রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্রনেতা—তারা যে রঙের যে দলেরই হোক না কেনো, বারবার তারা আইবির পাতা ফাঁদে পড়ে যায়, তারা আইবি-র বানানো গল্পে বিশ্বাস করে ফেলে, হয় তারা সাদাসিধে নয়তো তারা ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি এবং আইবি-র যোগসাজশ সম্পর্কে জানে না, বা জানার চেষ্টাও নেই! আর হতে পারে তারাও হয়তো এই গালগল্প এবং তত্ত্ব ও তথ্যের বিকৃতিতে সামিল। আর সব থেকে দুশ্চিন্তার বিষয়, তারা যদি এতটাই

সরল হয়ে থাকে, তাহলে তো বাইরের যে কোনো শক্তি এসে তাদের যা ইচ্ছে বোঝাতে পারে। বিদেশি শক্তি তাদের নাচাতে পারে ইচ্ছেমতো। আর এভাবেই যদি চলতে থাকে, তাহলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ কিন্তু যথেষ্ট চাপে পড়বে।

৩. মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ

ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানত আইবি-র ফাঁদা গল্প মোটেই সত্যি নয়। তা সত্ত্বেও সেই গল্প সত্যি প্রমাণ করতে তথ্যের নানান বিকৃতি, সাজানো গোছানো করতে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ এত লম্ফঝম্প চালাল কেনো?

মুম্বাই হামলায় তিন দিন ধরে যা চলেছিল তা কিন্তু গোটা বিশ্ব দেখেছিল, শুনেছিল। প্রচুর তথ্য-প্রমাণ তৈরি হতে হতে যাচ্ছিল, যেমন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে পুলিশের মধ্যে ওয়্যারলেসে কথাবার্তার রেকর্ডিং, হামলার জায়গাগুলোতে সিসিটিভি ফুটেজের রেকর্ডিং, খবরের কাগজ ও টিভির বিভিন্ন প্রতিবেদন, ভিডিও ক্লিপস ইত্যাদি। এরপর পুলিশের গালগল্প যখন সামনে এলো, তখন একজন সাধারণ মানুষও বুঝে যেত যে কিছু তো একটা লুকোনো হচ্ছে। কিছু একটা জোর করে গেলানোর চেষ্টা চলছে।

ধরা যাক কোনো সাধারণ মানুষের ঘাড়ে এই তদন্তের দায়িত্ব পড়ল। ধরা যাক তিনি আইবি-র সাম্প্রদায়িক চেহারা ও তাদের ছক জানেনই না। তাহলে সেই মানুষটিও ঘাবড়ে যেতেন, যে হচ্ছেটা কী! কেনো এই ধরনের কাজকর্ম চলছে, কেনো তদন্তকে প্রায় উল্টো করে চালানো হচ্ছে। আইবি যদি ওই চেনা কিছু শব্দ, কোভার্ট অপারেশন, কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বা উচ্চপর্যায়ের নির্দেশের মতো কিছু শব্দের আমদানি করেও থাকত, তাহলেও ক্রাইম ব্রাঞ্চকে বোকা বানানো এত সহজ নয়। কারণ ওই জায়গায় সব পুলিশ যথেষ্টই অভিজ্ঞ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বুদ্ধিমান। এখানেই তো প্রশ্ন ওঠে, তাহলে ওই ধরনের পুলিশ আধিকারিকরা কী করে আইবি-র ফাঁদে পা দিয়ে নতুন নতুন প্রমাণের আমদানি করল, কিছু তথ্য মুছে দিয়ে কিছুর বিকৃতি ঘটিয়ে দিল? এর কারণ দুটি হতে পারে—

ক্রাইম ব্রাঞ্চের সিনিয়র অফিসাররা এটা খুব ভালো করে জানেন, আইবির ক্ষমতা, প্রভাব এতটাই লম্বা, যে তারা যে কোনো পুলিশের ক্যারিয়ারই শেষ করে দিতে পারে। সেই কারণেই তাদের অ্যাম্বিশন একটু বেশি, তারা আইবি-তে হীন তোষামোদ শ্রেয় বলে মনে করল। কারণ কোনো এক সময়ে তাহলে নিশ্চয়ই আইবি-র বদান্যতা তাদের কপালেও জুটবে। আর দ্বিতীয় কারণ যেটা হতে পারে, সেটা হলো আইবি সম্ভবত সিনিয়র অফিসারদের পুরোনো কেচ্ছা ঘেটে বের করে

থাকতে পারে। তাই দিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেইল করে থাকতে পারে। এই ব্যাপারটা দেশ বলুন, সমাজ বলুন বা পুলিশ, কারো জন্যই মোটেই ভালো নয়।

৪. সংবাদমাধ্যম

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের যেখানে তদন্তধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও সাংবাদিক সুলভ মানসিকতা রয়েছে, সেখানে মুম্বাই হামলার পর তারা এত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল কী করে? পুলিশ যা বলছে, বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে সেই সব মানতে শুরু করে দিল কেনো তারা?

যাঁরা গত ৫০ বছরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের বিবর্তন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, বা খোঁজ খবর রাখেন, তারা অবশ্য এই নিয়ে খুব একটা আশ্চর্য হবেন না। কারণ এই সব সংবাদমাধ্যম ধীরে ধীরে সঙ্ঘ পরিবারের আদর-যত্নে বেড়ে উঠেছে। কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গত ৫০ বছরে সংবাদমাধ্যমের অন্দরে ঢুকে গিয়ে ধীরে ধীরে জায়গা তৈরি করেছে, একটু খোঁজখবর রাখলে তা বোঝাই যাবে। সেই সব ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যখন বুঝল, মুম্বাই হামলার তদন্তের বিস্তর অসঙ্গতি ও ফাঁকফোকর নিয়ে যদি বেশি হইচই করা হয়, পুলিশের ফাঁদা গল্প নিয়ে যদি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, তাহলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ইচ্ছে, স্বপ্ন সব ফাঁস হয়ে যাবে। জনসমক্ষে এসে যাবে তাদের পরিকল্পনা. সেই কারণেই বাধ্য সেনার মতো, কোনো দ্বিধা ছাড়াই তারা পুলিশের গালগল্পে সায় দিতে শুরু করল।

এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যখন মিডিয়ার কাছে পুলিশের গল্পটি হাতে এলো, তখন কিছু অব্রাহ্মণ্যবাদী সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেল এটা নিয়ে শোরগোল ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক শ্লোগান তুলে যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তোলা হয়েছিল, তার কাছে ওই শোরগোল মিইয়ে গেল।

৫. মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় এফবিআই-এর অতি উৎসাহ

এই ঘটনায় এফবিআই-এর অতি উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আর সে কারণে ভারতীয় তদন্ত সংস্থাগুলোও এফবিআই-এর ওপর অতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। কীভাবে দেখুন,

১. মুম্বাই হামলার পর বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে এফবিআই-ই প্রথম ভারতে আসে। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ১ ডিসেম্বর, ২০০৮ এবং *পুনে মিরর,* ২ ডিসেম্বর, ২০০৮)
২. এফবিআই যেসব তথ্য দিয়েছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানকে হামলা সংক্রান্ত নথিপত্র পাঠিয়েছিল ভারত। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ৯ ডিসেম্বর, ২০০৮)

৩. এক সন্দেহভাজন ফাহিম আনসারিকে গ্রেফতার করেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। সেই ফাহিম আদালতে অভিযোগ করে, এফবিআই-এর এক মহিলা অফিসার তাকে যৌন নিগ্রহ করে। আদালত সেই অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দেয়। (*সকাল*, পুনে, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

৪. ফাহিম আনসারির আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, সংবিধান বহির্ভূত ভাবে কী করে একটি বিদেশি সংস্থা ভারতে এসে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। (*সকাল*, পুনে, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

৫. হামলার সময় ১০ জঙ্গির গলার আওয়াজ মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিল মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। এফবিআই-এর কাছে কিছু ডেটা ছিল, তার সাথে বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখার দরকার ছিল। (*পুনে মিরর, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

৬. কুবের নামে মাছ ধরার ট্রলার থেকে কিছু যন্ত্রপাতি মিলেছিল যেগুলো নিয়ে ২০০৯ ফেব্রুয়ারি আমেরিকায় উড়ে যায় মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চের তিন সদস্যের একটি টিম। এফবিআই-এর বিশেষজ্ঞরাই জিপিএস, স্যাটেলাইট ফোনের মতো জিনিসগুলো নিয়ে তদন্ত চালায়। এগুলো হামলাকারীরা ব্যবহার করেছিল এবং সম্ভবত ওতে থাকা তথ্য ডিলিটও করা হয়েছিল। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

৭. পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত তথ্য প্রমাণ, ওয়াশিংটনে মুম্বাই পুলিশ আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিল এফবিআই। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

৮. ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ ক্রাইম ব্রাঞ্চের সদস্যরা আমেরিকা থেকে ফিরেছিল। তারা জানায়, জঙ্গিদের ব্যবহার করা ভিওআইপি কল ও জিপিএস-এর তত্ত্ব তালাশ করার পর মুম্বাই হামলার সঙ্গে পাক যোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে এফবিআই। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

৯. ২০০৯-এর মার্চের প্রথম সপ্তাহে এফবিআই প্রধান রবার্ট মুলারকে ভারতে পাঠায় আমেরিকা। মুম্বাইতে যে সব তথ্য প্রমাণ জড়ো করা হয়েছে, সেই সব এক সঙ্গে খতিয়ে দেখতেই সে ভারতে আসে। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)

১০. মুম্বাই হামলায় জড়িত সন্দেহে ফাহিম আনসারিকে জেরা করে এফবিআই। জীবিত 'জঙ্গি' আজমল কাসভের মুখোমুখিও তাকে বসানো হয়। আইবি অফিসারদের সঙ্গে এফবিআই জেরা করে লশকর 'জঙ্গি' সাহাবুদ্দিনকেও। (*পুরি*, পুনে, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)

১১. মুম্বাই হামলা ও দেশে জঙ্গি নাশকতার আশঙ্কা নিয়ে, এফবিআই ডিরেক্টর রবার্ট মুলার, আইবি প্রধান রাজীব মাথুর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এমকে নারায়ণনের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ৪ মার্চ, ২০০৯)

ওপরের রিপোর্টগুলো থেকেই বোঝা যায়, যে আমাদের তদন্তকারীরা এফবিআই-এর ওপর কতটা নির্ভরশীল ছিল এবং এফবিআই-ও এই ঘটনা নিয়ে কতটা আগ্রহ দেখিয়েছিল। সে কারণেই তদন্তের সবক্ষেত্রেই এফবিআই ও আইবি নাক গলিয়েছিল। সঙ্গে মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ, হাতের পুতুল, তদন্তের অভিনয় করছিল মাত্র। এফবিআই যেভাবে এই তদন্তে হস্তক্ষেপ করেছিল, এবং আমরাও যেভাবে তাদেরকে এই সব কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলাম, তা দেশের সার্বভৌম অধিকার লঙ্ঘনের সামিল।

এফবিআই-এর কাজকর্মে বিশ্বাস করার আগে, তাদের প্রশাসনিক কাঠামোটা একবার দেখে নেওয়া জরুরি। জরুরি, সামাজিক ভাবে সেই কাঠামোয় কারা কারা ঠাঁই পায় তার দিকে নজর দেওয়া। সন্ত্রাসবাদী হামলার ক্ষেত্রে আমেরিকায় কিছু কিছু বিষয় কাজ করে,

১. খ্রিষ্টান
২. ইহুদি
৩. ইহুদিবাদী
৪. মুসলিম
৫. সিআইএ
৬. এফবিআই

উল্টোদিকে ভারতের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলো থাকে,

১. অতিসরল অন্যান্য হিন্দু
২. ব্রাহ্মণ
৩. ব্রাহ্মণ্যবাদী
৪. মুসলিম
৫, আইবি এবং 'র'
৬. সিবিআই

আমেরিকার সঙ্গে যদি ভারতের বিষয়গুলো তুলনা করা হয়, তাহলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে অন্যান্য হিন্দুদের মেলানো যাবে, ইহুদিদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের, ইহুদিবাদীদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদী, মুসলিমদের সঙ্গে মুসলিম ইত্যাদি।

আমেরিকার মূল তদন্তকারী সংস্থা সিআইএ। যদিও বছরের পর বছর চেষ্টা সত্ত্বেও এই সংস্থা ইহুদিবাদীরা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। ঠিক যেমনভাবে 'র' ও সিবিআই-কে সম্পূর্ণ হাতের মুঠোয় আনতে পারেনি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। যদিও আমেরিকার ইহুদিবাদী এবং ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যথাক্রমে এফবিআই এবং আইবি-কে তাদের বাগে আনতে পেরেছে। আর তাছাড়া মুম্বাই হামলা নিয়ে সিআইএ, 'র'-কে নির্দিষ্ট কিছু যে তথ্য দিয়েছিল, তা নিয়ে সিআইএ ও এফবিআই-এর নিজেদের মধ্যেই টানাপোড়েন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এসব ছাড়াও বলা যায়, আমেরিকার জাতীয়তাবোধ কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবোধের থেকে অনেকটাই আলাদা। আলাদা এই কারণে, এক্ষেত্রে ভারত অনেক দেরিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছে, তা ছাড়া নানান সংস্কৃতি ও জাতির একসঙ্গে সহাবস্থানটাও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মতো আমেরিকার জাতীয়তাবোধ এতটাও শক্তপোক্ত নয়। সে কারণে আমেরিকায় যেসব গোষ্ঠী একটু উদ্যমী আর উদ্যোগী, তাদের হাতেই কিন্তু ক্ষমতা ঘোরাফেরা করে। ইহুদিবাদীরা আমেরিকার সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে কারণ তাদের অধ্যবসায় ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। তারা আমেরিকার অর্থনীতি আর এফবিআই-কে প্রায় নিজেদের কব্জায় এনে ফেলেছে। যদিও তারা দেশের রাজনীতি, প্রশাসন ও সিআইএ-র মতো সংস্থাকে পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি, তবুও তারা এই সব ক্ষেত্রে এতটাই শক্তিশালী, যে তারা ইচ্ছে করলে যে কোনো কিছুতেই নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে, ক্ষমতা জাহির করতে পারে। ইহুদিবাদীদের ইচ্ছে গোটা বিশ্বে কর্তৃত্ব ফলানো। আর সেই কারণেই আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। এফবিআই-এর সঙ্গে তদন্ত চালানোর মতো বিষয়গুলো নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা করতে হতো আমাদের। নয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সার্বভৌমত্ব খোয়ানোর বড় আশঙ্কা থেকেই যায়। এর প্রেক্ষিতে *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে (১১ নভেম্বর ২০০৮)-এর একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যেতে পারে যার শিরোনাম ছিল, পাকিস্তান ও সিরিয়ায় আল-কায়েদার সদস্যদের খুঁজে বের করার গোপন নির্দেশ—২০০৪-এ প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ যে নির্দেশিকা দিয়েছিলেন, তাতে স্বাক্ষর রয়েছে ডোনাল্ড রামসফেল্ডের। আমেরিকার একজন শীর্ষ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এই গোপন নির্দেশের জেরে বিশ্বের যে কোনো জায়গার আল-কায়েদার ওপর মার্কিন সেনা হামলা চালানোর অবাধ অনুমতি পায়। নির্দেশিকাটি কতটা বিপজ্জনক তা নতুন করে জোর দিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই মামলায় বা অন্য কোনো মামলাতেও যদি এফবিআই আল-কায়েদার হাত দেখত, তাহলে আল-কায়েদাকে ধ্বংস

করতে মার্কিন সেনা হস্তক্ষেপ করতে পারত, হামলা চালাতেই পারত। আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারোর ছিল না, প্রতিরোধেরও ক্ষমতা ছিল না।

৬. ভেতরের লোকের ভূমিকা

মুম্বাই হামলার দিন পনেরোর মধ্যে সংবাদপত্র ও টিভির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এত তথ্য গেলানো হয়েছিল, যে তারা বিশ্বাসই করে নিয়েছিল, মুম্বাই হামলায় লশকর-ই-তাইয়েবার হাত রয়েছে। পাকিস্তানে বসে গোটা ঘটনার ষড়যন্ত্র হয়েছে। এতে বিদেশি শক্তির হাত থাকতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করল, বিশেষ করে এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারের মৃত্যু নিয়েও যখন সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল, তখন নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠল। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ হামলার ওই পর্বটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন।

- মুম্বাইয়ের এক্স সার্ভিসমেনস অ্যাসোসিয়েশন থেকে হেমন্ত কারকারের সন্দেহজনক মৃত্যু নিয়ে তদন্তের দাবি উঠল। হাইকোর্টের নজরদারিতে বিশেষ তদন্তকারী দলকে নিয়ে তা করানোর দাবি তুললেন তারা। ষড়যন্ত্রের মূল চক্রীকে খুঁজে বের করার দাবি উঠল। (*লোকমত*, কোলহাপুর, ১৭ ডিসেম্বর ২০০৮)
- সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এ আর আন্তুলে বিষয়টি নিয়ে সরব হলেন। যেহেতু মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত করছিল এটিএস। আর সেই এটিএস-এর প্রধান কারকারের যেভাবে মৃত্যু হলো, তা নিয়ে তদন্তের দাবি জানালেন তারা। কারণ মালেগাঁও বিস্ফোরণ নিয়ে কারকারের তদন্তে কিন্তু অনেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। (*লোকমত*, কোলহাপুর, ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮)
- হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন এক আইনজীবী। তাতে বলা হলো, যেহেতু হেমন্ত কারকারে কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতাদের গ্রেফতার করেছিলেন, সেই কারণে সন্দেহভাজন হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিদের হাতেই তিনি খুন হয়ে থাকতে পারেন। সে কারণেই তার মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। আদালত রায় দিল হেমন্ত কারকারের মৃত্যুর স্বাধীন তদন্ত করা হোক। সরকারি আইনজীবীকে নির্দেশ দেওয়া হলো, অভিযোগকারী যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন, তার প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর যেন তদন্ত হয়। (*পুধারি*, কোলহাপুর, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮)

যাই হোক, যখন এই মামলায় সন্দেহভাজন তৃতীয় ব্যক্তির জড়িত থাকার বিষয়টি উঠে এলো, তখন হেমন্ত কারকারের মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আরও জোরালো দাবি উঠল। অবশ্য তখনও বিজেপির ব্রাহ্মণ্যবাদী ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলো তাদের লক্ষ্যে অবিচলই রইল। তারা এইসব দাবিদাওয়ার চরম বিরোধিতা শুরু করে দিল। আর যারা এই ধরনের দাবিগুলো তুলছেন, তাদের নানা ভাবে নিন্দা অপবাদ দেওয়া শুরু করল। যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ আর আন্তুলে এই ধরনের দাবি তুলতে শুরু করে দিলেন, তখন বিজেপি সাংসদ ও শিবসেনা তার পদত্যাগের দাবিতে সংসদের দুই কক্ষেই হইচই জুড়ে দিল। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিবসেনা আন্তুলেকে পাকিস্তানের এজেন্ট বলে দোষারোপ করা শুরু করে দিল। এমনকি তাঁকে খুনের হুমকিও দেওয়া শুরু হলো। কিছু অতি উৎসাহী বিজেপি কর্মী আবার মুম্বাইতে আন্তুলের কুশপুতুল পোড়ায়। এমনকি তার নিজের সরকার, কংগ্রেসও তার পাশে দাঁড়াতে পারল না। দলের নেতাদের কাছ থেকে তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়। এতে আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ কেন্দ্রীয় সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলকে ব্রাহ্মণ্যবাদী আইবি যা বোঝায়, তারা সেটাই বেদবাক্য মনে করে থাকে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এক্ষেত্রে যে অবস্থান নিল, তা কিন্তু বেশ আশ্চর্যজনক। সন্ত্রাসবাদী ইস্যুতে তারা যে অবস্থান নিয়ে থাকে, এক্ষেত্রে তারা একদম উল্টো অবস্থানে রইল। এই কাল পর্যন্তও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যে কোনো বিস্ফোরণের ঘটনায় একসঙ্গে এক বাক্যে সুর ধরত, এ কাজ ঘরেরই (পড়ুন মুসলিমদের) কারোর। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভেতরের কারোর হাত থাকার বিষয়টি তারা পুরোপুরি উড়িয়ে দিল। হেমন্ত কারকারের মৃত্যুর তদন্তের জোরদার বিরোধিতা করা হলো। কারণ তারা নাকি জানত, এই ব্যাপারে অন্তত ঘরের কারোর হাত নেই।

ভেতরের লোকের ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক, তার জেরে কিছু অদ্ভুত তথ্য সামনে এসে গিয়েছিল। আর সেটা হলো, বিজেপি ও আরএসএস নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি এবং নরেন্দ্র মোদি সংগঠনের একদম খাস লোক ছিলেন না। যখন দেশের কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি, তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা কিছু সংবাদমাধ্যম, ব্রাহ্মণ্যবাদী আইবি এবং তার দোসররা, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, সরকার, বিশেষ করে কেন্দ্র ও রাজ্য দুজনই, সবাই একযোগে বলতে শুরু করে দিল যে এই ঘটনায় ভেতরের কারোর কোনো হাত নেই, তখন আলাদা করে কোনো তত্ত্ব আমদানি বা ভাবনার কোনো জায়গা রইল না (তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদী আইবি ও ইহুদিবাদী এফবিআই-এর তত্ত্ব ছাড়া)। অথচ লালকৃষ্ণ আদভানি ও নরেন্দ্র মোদি কিন্তু অন্য সুরে কথা বলা শুরু করলেন। মারাঠি দৈনিক *সকাল*, পুনে (৩১ জানুয়ারি, ২০০৯) লিখলো, প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদভানি নতুন কমিশন

গঠন করে মুম্বাই হামলার তদন্তের দাবি করছেন। তিনি বলেন, এখনও পর্যন্ত তদন্তে মিলেছে, যে এই হামলা হতে পারে, সে খবর সরকারের কাছে আগে থেকেই ছিল। তা সত্ত্বেও তারা এটা আটকাতে ব্যর্থ হলো। নাগপুরে বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের সময়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একই ইস্যু তুললেন। বললেন, মুম্বাই সন্ত্রাসী হামলায় কয়েকজন ভারতীয়র জড়িত থাকার কথা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। (*পুরি*, কোলহাপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরে সুর মিলিয়েই প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদভানি বলেন, মুম্বাই হামলার সমস্ত যুক্তিপূর্ণ দিক খতিয়ে দেখা দরকার। যা যা বিতর্ক উঠেছে, সেই সব মিলিয়ে বৃহত্তর তদন্তের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। ২০০৯, ৫ জুন আদভানি ফের লোকসভায় দাবি করেন, এই ঘটনায় কমিশন গঠন করে বিচারবিভাগীয় তদন্ত প্রয়োজন। যদিও সরকার তার দাবিকে আমল দেয়নি। (*সকাল*, পুনে, ৬ জুন, ২০০৯)

বিজেপি ও আরএসএস-এর সিনিয়র দুই নেতা যেভাবে তাদের সংগঠনের অবস্থানের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন তা থেকে এটা বোঝাই যায়, তারা তাদের সংগঠনের একদম ভেতরের লোক ছিলেন না, এবং সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনা সম্পর্কে তারা কিছু জানতেনও না, জড়িতও ছিলেন না। যদি থাকতেন, তাহলে এই ঘটনার বৃহত্তর তদন্তের পক্ষে তারা সওয়াল করতেন না। কারণ যদি তা হতো, তাহলে ব্রাহ্মণ্যবাদী-আইবি-র ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যেত, আসল তাজ-ওবেরয় হামলার পাশাপাশি সিএসটি-কামা-রঙ্গভবন লেনের গল্পগুলোও জনসমক্ষে চলে আসত। এই বিতর্কে একটা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে আসা যায়, কেউ ব্রাহ্মণ্যবাদী বা উগ্র হিন্দুত্ববাদী (পড়ুন মুসলিম বিদ্বেষী) হলেও, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একদম ভেতরে তারা নাও থাকতে পারেন।

অতীতেও এরকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও অব্রাহ্মণ্যবাদীদের সংগঠনের দুমুখো নীতি ফাঁস হয়েছে।

সাম্প্রতিক অতীতের কিছু ঘটনায় বোঝা গেছে, কট্টর বিজেপি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে মোদি ও আদভানির হালকা একটু মনকষাকষি রয়েছে। বিজেপির তরফে যেভাবে আদভানিকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে তুলে ধরার কথা ছিল, তাতে বিস্তর খামতি, অনীহা লক্ষ করা যাচ্ছিল, নিজের চেয়ারের থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী হতে থাকে মোদি ও তার সহযোগীদের গুজরাট নির্বাচনে হারানোর জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল আরএসএস। আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ ও সুরাতের অবিস্ফোরিত বোমা উদ্ধারও ওই ঘটনারই জেরে। মোদির আওতায় থাকা শহরগুলো ভারতের যে কোনো শহরের থেকে নিরাপদ হয়ে উঠেছিল। তাতেও অনেকের গা জ্বালা ধরে। এছাড়াও মার্কিন নাগরিক হেডিডকে আগলে

রাখা, গুজরাটে ছাড়পত্র না থাকা বেআইনি মন্দির ভেঙে ফেলার ঘটনায় মোদির বিরুদ্ধে আরএসএস ও ভিএইচপি-র যেরকম এসএমএস অভিযান থেকে মনে হয়, জনগণ যেরকম মনে করেন, মোদি বা আদভানি সেরকমভাবে আরএসএস-এর একদম অন্দরমহলের লোক ছিলেন না।

কিন্তু যারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, হিন্দুত্ব নিয়ে তাদের আসল ভাবনাটা জানে, তারা কিন্তু খুব একটা আশ্চর্য হলো না। তাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দুত্বের নামে প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ্যবাদ ফিরিয়ে আনা। ২০০৮-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে এই বিষয়গুলো উঠে আসতে শুরু করেছিল। হিন্দু রাষ্ট্রের চক্রীরা ২৬ জানুয়ারি ২০০৮-এ বৈঠক করেছিল। তাতে ছিল মূল চক্রী লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পুরোহিতও। সে সেখানেই কতগুলো বিষয় একদম স্পষ্ট করে দিয়েছিল। এই মামলায় চার্জশিটের সঙ্গে সে কথার উল্লেখ ছিল। পুরোহিত বলেছিল, যে কেউই তাদের হিন্দু আর্যবর্ত সরকারের বিরোধিতা করবে, তাদের বের করে দেওয়া হবে, নয়তো খুন করা হবে। পুরোহিত যে হিন্দু আর্যবর্ত-র আমদানি করেছিল, স্বাভাবিক ভাবেই তার সঙ্গে সহমত হতে পারতেন না মোদি ও আদভানি। এমনকি শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরেও এই সঙ্গে মানাতে পারতেন না। কীভাবে, তার ব্যাখ্যা রইল নীচে—

যখন মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে কর্ণেল পুরোহিত ও তার ব্রাহ্মণ্যবাদী জঙ্গিদের জড়িত থাকার খবর ছড়াতে শুরু করল, তাতে শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে প্রেমমুগ্ধ হয়ে গেলেন। পুরোহিতের বীরত্বে অভিভূত হয়ে গেলেন। পুরোহিত ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দেশভক্ত ও জাতীয়তাবাদী হিসেবে ঘোষণা করতে এক মুহূর্তও সময় নিলেন না। এরকমও খবর ছড়িয়েছিল, লোকসভায় সাংসদ পদের জন্য লড়তে হয়তো কর্ণেল পুরোহিতকে টিকিটও দেওয়া হতে পারে। কিন্তু বাল ঠাকরে এটা জানতেন না, যে কিসের বিনিময়ে কখন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অভিনব ভারত তাকে প্যাঁচে ফেলবে। এসব জানা গিয়েছিল, মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের দ্বিতীয় চার্জশিটে। যেটা ২০০৯, ২৩ এপ্রিল পেশ করে এটিএস।

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, পুনে, ২৪ এপ্রিল ২০০৯ জানাল, শিবসেনাকে কলঙ্কিত করেছে পুরোহিত। প্রতিবেদনে বলা হয়, মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে মুম্বাই এটিএস যে অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করেছিল, তাতে বলা হয় শিবসেনাকে বেশ নড়বড়ে হিন্দু সংগঠন বলে মনে করত পুরোহিত এবং তার অভিনব ভারতের সাঙ্গোপাঙ্গরা।

চার্জশিটে ধৃত ১১জন অভিযুক্তের ফোনের কথাবার্তা শুনে দেখা যায় তারা বলছে, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রচুর হিন্দু সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে।

কথাবার্তায় ধরা পড়ে, তারা বলছে, শিবসেনা ও তাদের নেতা বাল ঠাকরে আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখে। এই কথাবার্তা হয়েছিল পুরোহিত, দয়ানন্দ পাণ্ডে এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায়ের মধ্যে। শিবসেনা দলটি গ্যাংস্টারদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তোলাবাজি করে বেড়ায়। তারা হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতক। পুরোহিত ও আরেক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির এহেন আলোচনা একই ধরনের কথা *হিন্দুস্তান টাইমসের* (২৪ এপ্রিল ২০০৯) প্রতিবেদনেও ছিল। তাতে বলা হয়, ওই বৈঠকে একজন বলে, শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য বড় বিপদ। শেষের কথাটি হলো এই, যেসব সাধারণ হিন্দু, তারা যতই উচু জায়গায় থাকুন না কেনো, তাদের এটা বোঝা দরকার যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা হিন্দুত্ববাদ বলতে যা বোঝায়, তা আসলে হিন্দুত্ববাদ নয়। আসলে সেটা হলো হিন্দুত্ববাদের ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ।

৮. ২০০৮ মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ড

(মুম্বাই হামলা পরবর্তী সময় তদন্ত)

- হেমন্ত কারকারের তদন্তই সর্বনাশের কারণ
- মূল ষড়যন্ত্রকারীর ঘনিষ্ঠরাই তদন্তকারী দলের মাথা,
- অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুল ও দালালি তার হাত ধরেই

আবার মাকড়সার জালের উদাহরণে ফিরে আসা যাক। জাল বোনাটা শুরু করেছিলেন হেমন্ত কারকারে। আর সেই জাল, মালেগাঁও বিস্ফোরণ ছাড়িয়েও কলেবরে আরও বাড়তেই পারত। ওই জাল কতটা ছড়ানো হবে, আর তাতে কত পোকামাকড় ধরা পড়বে, তা নির্ভর করছে তদন্তকারী অফিসারের দায়িত্ব, সততা আর নিরপেক্ষতার ওপর। আইবি খুব স্বাভাবিক কারণেই একটা নির্দিষ্ট সীমার পর সেই জাল ছড়ানোর বিষয়টি পছন্দ করছিল না। সে কারণেই তারা ইতিমধ্যেই একজন অফিসারকে ঠিক করে ফেলেছিল, আর তাই এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাকে দায়িত্বে আনা হয়। কারকারের মরদেহ তখনও আগুন পায়নি, তারমধ্যেই তড়িঘড়ি করে মহারাষ্ট্র সরকার অতিরিক্ত ডিজিপি (রেলওয়েজ) বিতর্কিত প্রাক্তন এটিএস প্রধান কেপি রঘুবংশীকে ফের এটিএস-এর মাথায় নিয়ে বসালো (*লোকমত*, মুম্বাই, ২৮ নভেম্বর, ২০০৮)।

এই নিয়োগ নিয়ে এত তাড়াহুড়োর কী ছিল সরকারের? এটা কোনো সাংবিধানিক পদ ছিল নাকি যে, সময়ের মধ্যে তা পূরণ করা হয়, তাহলে সাংবিধানিক বিপর্যয় ঘটে যাবে? যদি সরকারের দাবি মেনেই নেওয়া হয়, যেহেতু মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, তাই তদন্তে যাতে কোনোরকম আঁচ না আসে, সেজন্যই এই তৎপরতা, তাহলে সরকারের তরফে কমপক্ষে এটা তো যাচাই করার দরকার ছিল, যাকে তদন্তের দায়িত্বে আনছি, তার সঙ্গে মূল অভিযুক্ত কর্নেল পুরোহিতের সম্পর্কটা কীরকম! নীচের প্রতিবেদনগুলোতে বোঝা যাবে, পুরোহিতের সঙ্গে রঘুবংশীর সম্পর্ক কত আন্তরিক ছিল—

২০০৫-এ (যে বছরে রঘুবংশী এটিএস প্রধান ছিল) লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিত এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) শৈলেশ রায়কর (নাসিকের ভাসলা মিলিটারি স্কুলের প্রশাসক)-কে এটিএস-এর তরফে একটি সভায় বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। কী করে মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য হাসিল করতে হয়, সভা ছিল তাই নিয়ে। সেই সময় পুরোহিত ও রায়কর ছিল সেনা গোয়েন্দা বিভাগে (*ডিএনএ*, মুম্বাই, ১২ নভেম্বর ২০০৮)। যখন এই

সম্পর্কে অতিরিক্ত ডিজিপি (রেলওয়েজ) এবং প্রাক্তন এটিএস প্রধানকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তার উত্তর ছিল, আমি ঠিক সবকিছু মনে করতে পারছি না। (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ১২ নভেম্বর ২০০৮)

২০০৬ মে-তে অওরঙ্গাবাদে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হয়। সেনা গোয়েন্দাদের সঙ্গে সেই সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান করা হয়েছিল। কমপক্ষে চার দিন ধরে অস্ত্র মামলায় সেনার তরফে পুরোহিত এটিএস-কে সহায়তা করেছিল। সেনার টিমের মধ্যেই ছিল সে। এটিএস ৪৩ কেজি আরডিএক্স, ১৬টি একে ৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, ৩২০০ রাউন্ড গুলি এবং ৫০টি হ্যান্ড গ্রেনেড উদ্ধার করেছিল নাসিক-অওরঙ্গাবাদ হাইওয়ে থেকে। (*ডিএনএ*, মুম্বাই, ১২ নভেম্বর ২০০৮)

"আমাদের অফিসারদের সঙ্গে আপনি যেভাবে একটা আলোচনার জায়গা তৈরি করে দিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। আলোচনার ফলে আমাদের অফিসাররা বেশ ভালো ভাবেই উপকৃত হয়েছেন। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনার মতো ও মেজর (তৎকালীন) পুরোহিতের মতো সেনা অফিসারদের সঙ্গে কথাবার্তার সুযোগ হবে। আপনাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতায় আমরা ফের উপকৃত হব"। এটিএস-এর তৎকালীন স্পেশাল আইজিপি কেপি রঘুবংশী ২০০৬-এর ৫ সেপ্টেম্বর এমনতর চিঠিটি লিখেছিল সাদার্ন কমান্ডের লেফটেন্যান্ট কর্নেল রায়করকে। আরেকটি কপি ছিল পুরোহিতের নামে। রায়কর ও পুরোহিত দুজনেই তখন সেনা গোয়েন্দা বিভাগে ছিল। (*সকাল টাইমস*, পুনে, ২৬ নভেম্বর ২০০৮)

ওপরের প্রতিবেদনগুলো বিশেষ করে কে পি রঘুবংশীর চিঠিটি লেখা হয়েছিল মালেগাঁও বিস্ফোরণের দিন তিনেক আগে। এটা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, পুরোহিত আর রায়করের ওপর রঘুবংশীর কতটা শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। অথচ এরাই ২০০৮-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণে সন্দেহভাজন! অথচ এদের ওপরেই সন্ত্রাসমূলক ঘটনার তদন্তে নির্ভর করত রঘুবংশী। তারা রঘুবংশীর কাছে প্রায় গুরুর মতো ছিল। এই পরিস্থিতিতে কেউ কীভাবে আশা করবে যে, পুরোহিতকে রঘুবংশী এই ঘটনার তদন্তে কোণঠাসা করে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দেশজোড়া ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দেবে?

এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন বার আমার মাথায় আসত, সরকারের এমন কী দায় ছিল যে কে পি রঘুবংশীর মতো একজন বিতর্কিত অফিসার, যার মালেগাঁও বিস্ফোরণের অভিযুক্তদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাকেই তড়িঘড়ি এটিএস-এর মাথায় বসাতে হবে? সেরকম হলে সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হতে পারত। কেনো এটিএস-এ কারকারের পরের সিনিয়রকে নিয়মমাফিক না বসিয়ে রঘুবংশীকে আনা হলো? মামলার ঘোরপ্যাঁচ সম্পর্কে যারা জেনে ফেলেছেন, তাদের কাছে উত্তরটা খুব সহজ। এই পরিস্থিতিতে আইবি কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়ার মতো

অবস্থায় ছিল না। মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে একদম তাদের হাতের মুঠোয় থাকা কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। ২০০৬ এ নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতা-সংগঠনের গা বাঁচিয়ে রঘুবংশী দেখিয়ে দিয়েছিল সে কতটা অনুগত ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশ্বস্ত। ২০০৬-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে এক ধাপ এগিয়ে সে যে এই ঘটনার শিকার, তাকেই দোষী বানিয়ে স্থানীয় পুলিশের করা তদন্ত পুরো উল্টোপথে চালিয়ে কাজ হাসিল করেছিল। এটিএস প্রধান কে হবেন, তা নিয়ে কোনো আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই তাই আইবি নিজেদের লোককে সে জায়গায় বসানোর তাড়াহুড়ো করছিল। এরপর যখন গোটা বিশ্ব টিভির পর্দায় মুম্বাই হামলার নারকীয়তা দেখতে ব্যস্ত ছিল, প্রচুর নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যুতে শোক পালন করছিল, আলোচনা করছিল, কে এইভাবে এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারেকে হত্যা করল, তখনই আইবি সরাসরি অথবা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে ভুল বোঝানোর কাজে লেগে পড়েছিল। কেনো এটিএস প্রধানের পদ দ্রুত ভরাট করা উচিৎ, কেনো রঘুবংশীই যোগ্যতম, এইসব বোঝানো হয়েছিল। আর অতিসরল সরকার যথারীতি ব্রাহ্মণ্যবাদী আইবি-র ফাঁদে পা দিয়ে তাদের কথা মতো নির্দেশনামায় সই করে দিয়েছিল।

যদিও কারকারের করে যাওয়া কাজ ঘেঁটে দিতে আইবি তাদের পছন্দের কে পি রঘুবংশীকে লজ্জাজনক ভাবে তড়িঘড়ি ক্ষমতায় এনেছিল, তবুও কাজটা কিন্তু খুব সহজ ছিল না। রঘুবংশীর কাছে নির্দেশ ছিল যত জলদি সম্ভব চার্জশিট ফাইল করে দিতে হবে। আর সেই চার্জশিট শুধু মালেগাঁও বিস্ফোরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আগেরবার মামলার তদন্তে যেসব বিষয় উঠে এসেছিল, ততটাও গভীরে যাওয়া চলবে না। কিন্তু এটা বলা যত সহজ, করাটা মোটেই তত সহজ নয় তার কারণ হেমন্ত কারকারে হেলাফেলা করে কিছু করতেন না। মামলার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়, যেমন পুরোহিত ও দয়ানন্দ মোহান্তির ল্যাপটপের মতো বিষয়গুলো আদালতের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তারপর সংবাদমাধ্যমের হাত ধরে তা সাধারণ মানুষের হাতেও পৌঁছে গিয়েছিল। আরও বড় কথা হলো, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জবানবন্দি রেকর্ড করানো হয়েছিল, এবং তা কী ছিল সেটাও অনেকের জানা।

রঘুবংশী বেশ দ্বিধায় ছিল। যেহেতু প্রমাণ সব রেকর্ড হয়ে গেছে, তাই সেসব পাল্টানো যাবে না, বিকৃত করা যাবে না অথবা নতুন কিছু আমদানিও করা যাবে না। অথচ তাকে তার কাজটিও করতে হবে। ফলে হাতে রইল চার্জশিটের কেরামতি। তাতে এমন কৌশলী, ভেলকিওয়ালা কথাবার্তা থাকবে, যা দিয়ে কিছুটা হলেও কাজ হাসিল করা যায়। কিন্তু লোক দেখানো তদন্ত শেষ না

করা পর্যন্ত রঘুবংশী কিন্তু চার্জশিটের রাস্তায় হাঁটলো না। সেই মতো লোক দেখানো তদন্ত শুরু করল সে, আর সেই তদন্তে আইবি-র তত্ত্ব মেনেই এগোনো হলো। এই তদন্ত করতে করতে যতটা পারা যায় কিছু তথ্যপ্রমাণ এদিক ওদিক করা হলো, কিছু ঘটনা চেপে দেওয়া হলো, হাস্যকর ভাবে কিছু জিনিস বাতিল করে দেওয়া হলো এবং সবটাই ভীষণ তড়িঘড়ি, অগোছালো ভাবে। এর প্রমাণ পাবেন *সকাল টাইমস* (৫ ডিসেম্বর ২০০৮), *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* (পুনে, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮), *হিন্দুস্তান টাইমস* (মুম্বাই, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮), *পুনে মিরর* (৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮), *ইন্ডিয়া টুডে.ইন* (৩ জানুয়ারি, ২০০৯) *পুনে মিরর*, (৯ জানুয়ারি, ২০০৯) এবং *সানডে টাইমস অব ইন্ডিয়া* (১৮ জানুয়ারি ২০০৯)।

মুম্বাই হামলার পরবর্তী সময় এটিএস ঠিক কী কী করল, তার একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়া রইল—

১. রাকেশ ধাওয়াড়ের মতো ছোট মাছকে বলির পাঠা বানানোর ক্ষেত্র তৈরি করা হলো। তাকেই মূলচক্রী বলে চালাবার চেষ্টা হলো।

২. নান্দেড়, মালেগাঁও ও অন্যান্য বিস্ফোরণে প্রশিক্ষণ দেওয়া মিঠুন চক্রবর্তী নামের ব্যক্তিটিকে কোনো দিনও চেনা যাবে না বলে একটা অদ্ভুত ভাবনা তৈরি করানো হতে লাগল। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা গেল, মিঠুন চক্রবর্তী বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই ছিল।

৩. পুনের শরদ কুন্তে এবং দেও নামে দুই রসায়নের অধ্যাপকের বিষয়টি ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাওয়া হলো। এমনকি রাকেশ ধাওয়াড়ে নিজে যেখানে জালনা পুলিশকে জানিয়েছিল যে ওই দুই অধ্যাপক নভেম্বর ২০০৮-এ পাইপ বোমা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। কয়েক বছর আগেও কুন্তে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরি সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি আরএসএস এর পশ্চিম মহারাষ্ট্র শাখার বুদ্ধিজীবী সংগঠনের প্রধান।

৪. শুধুমাত্র মালেগাঁও বিস্ফোরনের ঘটনায় মহন্ত দয়ানন্দ পাণ্ডেকে নিয়ে তদন্ত হলো। কিন্তু আরও অন্যান্য বিস্ফোরণ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো ব্যাপারটি এড়িয়েই যাওয়া হলো।

৫. মামলা থেকে ভিএইচপি নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়াকে বাঁচানোর জন্য হাস্যকর পদক্ষেপ নিল এটিএস প্রধান। তার দাবি ছিল, নার্কো পরীক্ষায় পুরোহিত যে প্রবীণ তোগাড়িয়ার নাম নিয়েছে, এ ব্যক্তি সেই ব্যক্তি নয়। এই প্রবীণ তোগাড়িয়া অওরঙ্গাবাদের বাসিন্দা। যদিও পুলিশ সেখানে খুঁজে কাউকে উদ্ধার করতে পারেনি।

৬. বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও আরএসএস-কে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা হয়েছিল।

৭. এটিএস প্রধান রঘুবংশী একমাত্র ভালো যে কাজটি করেছিল, তা হলো কর্ণাটকের প্রবীণ মুতালিকের গ্রেফতারি। এই ব্যক্তিই বোমাটি রেখেছিল। হেমন্ত কারকারেই এর নামটি তদন্ত করে খুঁজে বের করেছিলেন।

২০০৮, মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত শেষ করার পর মহারাষ্ট্র এটিএস, ২০০৯, ২০ জানুয়ারি নাসিকের MCOCA আদালতে ৪ হাজার ৫২৮ পাতার চার্জশিট পেশ করে। ১১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়, আরও তিনজনকে পলাতক দেখানো হয়। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তারা হলো, ১. সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর ওরফে সাধ্বী পূর্ণচেতনানন্দ গিরি, ২. লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পুরোহিত, ৩. সুধাকর দ্বিবেদী ওরফে দয়ানন্দ পাণ্ডে ওরফে স্বামী অমৃতানন্দ ওরফে শঙ্করাচার্য সারদা সর্বজ্ঞ পীঠ, ৪. রাকেশ দত্তাত্রেয় ধাওয়াড়ে, ৫. সমীরশরদ কুলকার্নি, ৬. সুধাকর ওঙ্কারনাথ চতুর্বেদী, ৭. শিবনারায়ণ গোপালসিং কালসাংগ্রা, ৮. শ্যাম ভাভরলাল শাহু, ৯. রমেশ উপাধ্যায়, ১০. অজয় একনাথ রাহিরকর, এবং ১১. জগদীশ চিন্তামান মাত্রে। এছাড়া তিনজন পলাতক যারা তারা হলো, ১. রামচন্দ্র গোপালসিং কালসাংগ্রা, ২. সন্দীপ বিশ্বাস দাঙ্গে এবং ৩. প্রবীণ মুতালিক।

চর্জশিটে যে ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছিল, তা হলো ধারা, ৩০২, ৩০৭, ৩২৬, ৩২৪, ৪২৭, ১৫৩ক, ১৫৩ ক-এর (ক)(খ), সংবিধানের ১২০খ ধারা, অস্ত্র আইনের ৩, ৪, ৫ এবং ২৫ নং ধারা, বিস্ফোরক আইনের ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ধারা, ইউএপিএ-র ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০ এবং ২৩ নং ধারা। MCOCA-র ৩(ক)এর(ক), ৩(ক)-এর (খ), ৩(খ), ৩(ঘ) এবং ৩(ঙ) নং ধারা।

চার্জশিটে বিস্তর ভুলভ্রান্তি ছিল। এরমধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য ছিল রাষ্ট্রদ্রোহের ধারাটি এখানে যোগই করা হয়নি। এটা খুবই অবাক করার মতো ব্যাপার, কারণ চার্জশিটেই বলা রয়েছে, প্রমাণ রয়েছে যে অভিযুক্তের ভারতীয় সংবিধানের ওপর কোনো আস্থাই নেই। এবং অভিযুক্তরা আলাদা রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টায় ছিল। ২২ জানুয়ারি, ২০০৯-এ পুনে মিরর প্রতিবেদন প্রকাশ করে,

৪ হাজার পাতার মোটা চার্জশিট পুরোহিত, সাধ্বী, রাকেশ ধাওয়াড়ের নিয়ে বিস্তারিত খতিয়ান দেয়। আলাদা সংবিধান, আলাদা জাতীয় পতাকা তৈরির মতো তাদের ষড়যন্ত্রের কথাও তুলে ধরা হয়।

পাণ্ডের ল্যাপটপ থেকে যা পাওয়া গেছে, তাতে এও প্রমাণ মিলেছে যে অভিযুক্তরা নেপালের রাজা জ্ঞানেন্দ্রর সাহায্যও চেয়েছিল। অন্য এক অভিযুক্তের সঙ্গে কথাবার্তায় পুরোহিত বিস্তারিত ভাবে জানায়, কেমন করে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর

সঙ্গে এই নিয়ে তাদের আলোচনা এগোয়, এবং পুরোহিতের লোকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে সে আগ্রহও দেখায়। কথাবার্তার রেকর্ডিং-এ জানা গেছে, চেক রিপাবলিক থেকে একে-৪৭ আনানোর জন্য রাজাকে বলা হয়েছিল। এরজন্য রাজাকে পুরোহিত আর্থিক সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

আলাদা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিত ২০০৭ সালে অভিনব ভারত সংগঠন তৈরি করে। চার্জশিটে লেখা ছিল, ওই রাষ্ট্রের আলাদা সংবিধান থাকবে, উদ্দেশ্য লেখা থাকবে প্রস্তাবনায়, 'ভারত স্বরাজ্য, শৌর্য ও সুরক্ষা'। তাতে আরও বলা হয়, পুরোহিত সে রাষ্ট্রের জন্য আলাদা জাতীয় পতাকার কথাও ভেবেছিল। গেরুয়া রঙের পতাকা, মাঝখানে সোনালী মশাল।

স্বামী দয়ানন্দের ল্যাপটপ থেকে পাওয়া কথাবার্তা উদ্ধার করার পর জানা যায়, "লেফটেন্যান্ট কর্ণেল প্রসাদ পুরোহিত—"আমি ইজরায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমাদের একজন ক্যাপ্টেন সেখানে রয়েছে। ওদিক থেকে খুব ভালো প্রতিক্রিয়া এসেছে। আমরা কী কী করতে পারি সেটা তারা হাতেনাতে দেখতে চেয়েছে।

আমাদের এখনও কোনো ওয়েবসাইট তৈরি হয়নি। আমরা তাদের শুধু কাগজপত্রই দিয়েছি। ওরা আমাদের ছয় মাস অপেক্ষা করতে বলেছে।

আমরা চারটি জিনিস চেয়েছি, নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের জোগান দিতে হবে। তেল আবিবে গেরুয়া পতাকা নিয়ে আমাদের অফিস শুরু করতে দিতে হবে, রাজনৈতিক আশ্রয় এবং হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে আমাদের সমর্থন করতে হবে।

তারা আমাদের দুটো জিনিস মেনেছে। তবে গেরুয়া পতাকা নিয়ে তেল আবিবে তারা আমাদের অফিস করতে দিতে রাজি নয়, কারণ তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে ইচ্ছুক নয়। আর আগামী দুবছরের জন্য অন্তত আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমাদের তারা খোলাখুলি সমর্থন দিতে পারবে না।

আরেকটা বিষয় তোমাকে বলে রাখি, জুন ২০০৬ এবং ২০০৭-এ আমরা রাজা ভানের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। রাজা আমাদের কিছু প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। প্রত্যেক বছর আমাদের দিক থেকে অফিসার হিসেবে ২০ জনকে ও সেনা হিসেবে ৪০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেখানে। আমি রাজাকে অনুরোধ করেছি, যেহেতু নেপাল স্বাধীন রাষ্ট্র সেই হিসেবে তারা চেকোস্লোভাকিয়ার কাছ থেকে একে-৪৭ কিনুক। আমি তাদের অস্ত্র কেনার টাকা দেব। রাজা রাজি হয়েছিল।

পুরোহিত পরে আবার জানায় রাজার আত্মীয়দের সঙ্গেও সে নাকি কথাবার্তা বলেছিল।

ফের ২০০৯, ২৩ জানুয়ারি, পুনে মিরর চার্জশিটের কথা উল্লেখ করে জানায়, একটি বৈঠকে পাণ্ডে বলে, তাদের হিন্দু রাষ্ট্রে কোনো গণতন্ত্র থাকবে না। সেখানে একজন রাজাই রাজত্ব চালাবে।

বৈঠক চলাকালীন পাণ্ডে বলে, তারা রাষ্ট্রসংঘের কাছে ভারত থেকে আলাদা স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানিয়েছে।

শঙ্করাচার্য (পাণ্ডে) নির্বাসনে থাকা সরকারের কথা উল্লেখ করে।

পুরোহিত রাজনৈতিক ভিন্নমতের কথা বলে জানিয়ে দেয়, যারা এই বিষয়টির বিরোধিতা করবে, তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। সংস্থা ৭৫ জনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তালিকা তৈরি করেছে। বৈঠকে (২৬ জানুয়ারি, ২০০৮) পুরোহিত বলে, যে কেউ যদি হিন্দু আর্যাবর্ত সরকারের বিরোধিতা করে, তাকেই বর্জন করা হবে, খুন করা হবে।

তার দাবি ছিল, রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৭০ জন (অথবা ৭৫)-কে সরিয়ে দেওয়া হবে। এটা না হলে অপরাধ হবে।"

এটা যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না হয়, তাহলে হবেটা কিসে? এবং চার্জশিটে উল্লেখ করা এই সব বিষয়ের ওপর যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা না হয়, তাহলে আর কী কী দরকার এটিএস-এর?

রাষ্ট্রেদ্রোহিতার অপরাধ হিসেবে ভারতীয় সংবিধানে কোন কোন বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে একবার দেখে নেওয়া যাক,

ধারা ১২১-ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা ঘোষণার চেষ্টা অথবা যুদ্ধ ঘোষণার পৃষ্ঠপোষকতা।

ধারা ১২১ ক-ধারা ১২১-এ উল্লেখ্য শাস্তিযোগ্য অপরাধের ষড়যন্ত্র।

ধারা ১২২-ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্য নিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি।

ধারা ১২৩-যুদ্ধ ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু গোপন রাখা।

ধারা ১২৪ ক- রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

এটিএস-এর হাতে যে সব তথ্য এসেছে, যা চার্জশিটে রয়েছে, স্বামী দয়ানন্দ পাণ্ডের ল্যাপটপ থেকে পাওয়া যা যা কথাবার্তা পাওয়া গিয়েছে, তা ওপরের সব ধারার আওতার মধ্যেই পড়ে যাচ্ছে। আর এর থেকে প্রমাণিত অভিযুক্ত, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও ভারতীয় সংবিধানের ভয়ংকর অবমাননা করেছে, অস্ত্র জোগাড়ের মাধ্যমে আলাদা সংবিধান ও পতাকা গঠনের ইচ্ছের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এছাড়াও তাদের অনুগতদের অস্ত্র

প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, আর যারাই তাদের বিরোধিতা করবে তাদের হত্যার ছক কষা হয়েছে। অতএব উল্লেখিত সংবিধানের পাঁচটি ধারাই এই মামলায় একদম ঠিকঠাক ভাবে মিলে যাচ্ছে। এই ধারা চার্জশিটে না থাকা, ভয়ানক ভুল। এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে একজন সিনিয়র আইপিএস অফিসার, নেহাত ভুলের বশে অথবা অজ্ঞতার বশে এই কাজটি করে থাকতে পারে।

এই কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে চক্রীদের বাঁচাতে, আইনতান্ত্রিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ফেলে দিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র নাম দিয়ে আলাদা ব্রাহ্মণ রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র লুকোতে এই কাজ করা হয়েছে। এই কারণেই এটিএস প্রধানের বিরুদ্ধে কড়া বিভাগীয় তদন্ত চালিয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত।

এছাড়াও চার্জশিটে আরও বিস্তর ভুলভ্রান্তি রয়েছে

অভিনব ভারত: ১৮৯৩ সালে বীর সাভারকর একটি সংগঠন তৈরি করেছিল, সেই নামেই এই শাখা সংগঠনটি। বীর সাভারকারের ভাইয়ের পুত্রবধু হিমানী সাভারকর এর জাতীয় সভাপতি প্রাক্তন মেজর উপাধ্যায় এর কার্যকরী সভাপতি কর্ণেল রায়কর, শ্যাম আপ্তে, দয়ানন্দ পাণ্ডে এবং কর্ণেল পুরোহিত সংস্থার জন্য টাকা জোগাড় করেছিল, আর সেই টাকা পৈশাচিক ও দেশবিরোধী কাজে ব্যবহার করেছিল বলে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। সংস্থার কয়েকজন সদস্য বোমা ও অস্ত্র জোগাড় করেছিল। সংস্থার বৈঠক হয়েছিল ভোপাল, ইন্দোর, জব্বলপুর, ফরিদাবাদ, কলকাতা, পুনে, নাসিক, দেওলালি ও জম্মুর মতো বিভিন্ন জায়গায়। সেখানে বোমা বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ও দেশ এবং সাংবিধানিক সরকারকে নড়বড়ে করার জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনাও করা হয়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এটিএস এই ধরনের দেশবিরোধী দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলোর ষড়যন্ত্রের গভীরে গিয়ে কোনো তদন্তই করল না, তাদের সদস্যদের যড়যন্ত্রকারী হিসেবে গ্রেফতারও করল না, তাদের টাকা পয়সার লেনদেন কীভাবে, তা নিয়েও তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করল না।

ভোসলা মিলিটারি স্কুল: নাসিকে ১৯৩৭ সালে এই স্কুল শুরু করেছিল আরএসএস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বি এস মুঞ্জে। পরে নাগপুরে এর একটি শাখা খোলা হয়। এতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির ভাবনাচিন্তা ঠিক কোন জায়গায়। সদস্যদেরকে বোমা ব্যবহারের রকমসকম ও বন্দুক চালানো শেখাতে প্রশিক্ষণের জন্য বজরং দলকে স্কুল চত্বর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এই বিস্ফোরণকাণ্ড তো বটেই, অন্যান্য বিস্ফোরণের মামলাতেও এর কিছু

প্রশিক্ষক ও শিক্ষনবিশের নাম জড়িয়েছে। এর ওপর স্কুলের প্রশাসক কর্নেল সুরেশ রায়কর পর্যন্ত কর্নেল পুরোহিতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অস্ত্র আমদানিতে সাহায্য করেছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর নাসিকে অভিনব ভারতের অফিসের একটি বৈঠকেও সে যোগ দিয়েছিল। মালেগাঁও বিস্ফোরণের সপ্তাহ দুয়েক আগে ওই বৈঠকেই সমস্ত পরিকল্পনা করা হয়। অথচ তা সত্ত্বেও সংস্থাটির একজন সাধারণ কর্মচারীকে পর্যন্ত অভিযুক্ত করা হলো না। এমনকি স্কুলটির অনুমতি খারিজ করার জন্য সরকারের কাছে কোনো আবেদনও করা হলো না। যদি এরকমটা কোনো উর্দু মাধ্যমের স্কুল বা মাদ্রাসার সঙ্গে হতো, এবং তার সঙ্গে মুসলিম যুবকরা যদি শুধু লাঠি খেলারও প্রশিক্ষণ নিত, তাহলে কী হতো যে কেউই ভাবতে পারেন। শুধু স্কুলই যে বন্ধ করে দেওয়া হতো তাই নয়, স্কুলের বেয়ারা থেকে কর্মী, তার আশেপাশে যতজন চেনা পরিচিত প্রত্যেককেই প্রায় জেলে ভরে ফেলা হতো।

আকাঙ্ক্ষা রিসোর্ট: ২০০৩ সালে পুনেতে এই রিসোর্টেই আরএসএস ও বজরং দলের জঙ্গিরা বোমা তৈরি ও বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। মিঠুন চক্রবর্তী নামে একজন ছিল মূল প্রশিক্ষণদাতা। আইডি, নানান ধরনের বোমা তৈরি ও তা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল সে। সে শুধু প্রশিক্ষণই দেয়নি, শিক্ষানবীশদের হাতে শিবির শেষের পর বিশাল পরিমাণে বিস্ফোরকও তুলে দিয়েছিল। এই মামলায় সেই তথ্য যে উঠে এসেছিল তাই নয়, নাটে, পরনি, পুরনা, জালনা মামলাতেও এই ঘটনার নাম এড়িয়েছিল। যাইহোক, এখন পর্যন্ত রিসোর্টের মালিক ম্যানেজার কাউকেই অভিযুক্ত করা হয়নি। তাদের লাইসেন্সও বাতিল করা হয়নি।

"মিঠুন চক্রবর্তী": এই নামটা ২০০৬-এ নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ড থেকে ছড়ানো শুরু করে। পরে এই মামলা তো বটেই, মারাঠওয়াড়া এলাকায় ২০০৩-০৪ সালের অন্য মামলাতেও এর নাম পাওয়া যায়। অথচ এটিএস-এর হোমরা চোমরারা তার খোঁজও পেল না, গ্রেফতারও করতে পারল না। যেভাবে তার সম্পর্কে কিছু তথ্য বাজারে ছাড়া হচ্ছিল, তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, তারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাকে গ্রেফতার করতে চাইছিল না, তার পরিচয় লুকোতে চাইছিল। নাহলে এটিএস ও আইবি-র মতো শক্তিশালী সংগঠন যদি চাইত, পাতাল থেকে হলেও মিঠুন চক্রবর্তীকে খুঁজে বের করত। রাকেশ ধাওয়াড়ে কিংবা কর্নেল পুরোহিতের মতো কাউকে সাদামাটা ফাস্ট ডিগ্রি দিয়ে জেরা করলেই কাজ হয়ে যেত। তাছাড়া শরদ কুন্তে, প্রফেসর দেও-এর মতো

ষড়যন্ত্রকারীরা সেই ক্যাম্পে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিল। তাছাড়া আকাঙ্ক্ষা রিসোর্টের মালিক, ম্যানেজারও ছিল। তারাই মিঠুন চক্রবর্তীর কাছে তদন্তকারীদের পৌছে দিতে পারত। কিন্তু আইবি-র নির্দেশে এটিএস তার পরিচয় খোলসা করতে রাজি তো ছিলই না, উলটে কোনো ভাবেই যাতে তা ফাঁস না হয়, তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর সহজ যুক্তি হলো, হয় সে ব্যক্তি কোনো সিনিয়র ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতা বা আইবি-র কোনো কেউকেটা। হয় কর্মরত নয় অবসরপ্রাপ্ত। যদি তা হয়, তাহলে অন্তত যতদিন এই সব তদন্তকারী দলের হাতে গোটা বিষয়টি থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার পরিচয় কোনো দিনও খোলসা হবে না।

আইবি অফিসাররা: এই মামলা ও নান্দেড় বিস্ফোরণ মামলায় সবথেকে অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর তথ্য যেটা মিলেছিল, তা হলো কর্মরত বা প্রাক্তন সেনা ও আইবি অফিসারদের সন্দেহজনক ভূমিকা। কিন্তু যখন কয়েকজন সেনা অফিসার গ্রেফতার হলো, এবং পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন তাদের কাছ থেকে বিস্তর তথ্য মিলল, তখনও কিন্তু আইবি অফিসারদের সম্পর্কে একটা কথাও বের হয়নি।

খবরের কাগজে যে সব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, আইবি অফিসারদের বাঁচানোর জন্য এটিএস, সেনা অফিসারদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নয় এরকম বেশ কিছু সেনা অফিসারদের রেহাই দেওয়া হয়েছিল। হয় তাদের সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, হয়তো সেনা সার্ভিস রুলের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

প্রাক্তন আইবি অফিসার এবং সেনা অফিসারদের মধ্যে যারা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে এসেছিল, তাদেরকে এটিএস একই বেঞ্চে বসিয়ে দিল। আসলে সেনাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেরকম একটা সহানুভূতি রয়েছে, সেটাকেই কাজে লাগিয়ে আইবি অফিসারদেরও তারমধ্যে ভিড়িয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু দুটো ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। যে সেনা অফিসারদের ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তারা যেখানে এই ষড়যন্ত্রে সরাসরি ঠিক জড়িত ছিল না, সেখানে আইবি অফিসারদের জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে যে সরাসরি যোগ শুধু ছিল তাই নয়, সংগঠনের জঙ্গিদের তারা প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। যেখানে সেনা, এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত কর্নেল পুরোহিতের মতো অফিসারকে আইনের হাতে তুলে দিতে একটু দ্বিধা করেনি, সেখানে এটিএস-কে প্রাক্তনীদের গা পর্যন্ত ছুঁতে দেয়নি আইবি। সেনা ও আইবি-র এই যে উলটপুরাণ, তা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। সেনারা ভীষণ ভাবে পেশাদার, সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ এবং মন থেকে দেশভক্ত। রাজনীতি আর

সাম্প্রদায়িকতা থেকে তারা শতহস্ত দূরে। গত ছয় দশক ধরে তারা পেশাদারীত্ব, অখণ্ডতা, দক্ষতার প্রমাণ রেখে আসছে। সেনা এমনই এক বাহিনী, যাদের নিয়ে গোটা দেশ গর্বিত। সেই জায়গায় তাদের মধ্যে দুএকজন যদি সন্ত্রাসী কাজকর্মে জড়িয়ে পরে তাহলে সেটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই দেখা উচিত। এর জেরে সেনার ধর্মনিরপেক্ষতা, অখণ্ডতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়।

কিন্তু আইবি-র ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। আইবি-তে যে কীভাবে বড়সড় মাপের আদর্শগত অনুপ্রবেশ ঘটে গেছে, তা তো এই বইতেই দেখানো হয়েছে, অথচ সেনার ক্ষেত্রে সেরকমটা হতে পারেনি। সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ নষ্ট করে ব্রাহ্মণদের হম্বিতম্বি বাড়াতে এভাবেই নিজেদের বিযাক্ত দাঁতনখ ছড়িয়েছে আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

দীর্ঘদিন ধরেই, অর্থাৎ সেই মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার সময় থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে আসছে তারা। আইবি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বার্থেই কাজ করে থাকে। নানান বিস্ফোরণের ঘটনায় কীভাবে তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষা করেছে, তা স্পষ্ট।

এমনকি ষড়যন্ত্রকারীরা যে সাংবিধানিক সরকারকে উৎখাত করে আলাদা হিন্দু (ব্রাহ্মণ্যবাদী) রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র করছে, সেটা আইবি খুব ভালো ভাবেই জানত। কর্ণেল বাপ্পাদিত্য ধরের বয়ানেই তার প্রমাণ ছিল স্পষ্ট (*হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৯)। তার বক্তব্য থেকে বোঝাই যাচ্ছে, ইন্দোরে যে অভিনব ভারতের বৈঠকটি হয়েছিল, সেটা আইবি-র নজরেই ছিল। যদি তাই হয়, তাহলে তারা কেনো সরকারকে ওই সংগঠনটির ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করল না? কেনো তারা সরকারকে ওই সংগঠনটির ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর পক্ষে সওয়াল করল না? বোমা বিস্ফোরণের বিষয়গুলো নিয়ে জানা সত্ত্বেও গত তিন চার বছর ধরে হয়ে চলা ঘটনাগুলোর জন্য কেনো তারা কোনো পাল্টা উদ্যোগ নিল না, যেখানে প্রত্যেকবার অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছে? গত তিন বছর ধরে আইবি-র প্রাক্তন অফিসাররা জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছে, অস্ত্র দিয়ে গেছে। কোনো তদন্তকারী সংস্থাকেই সেই সবের তদন্ত করতে দেওয়া হয়নি। কেনো দেশবিরোধী ওই সব অফিসারদের আড়াল করেছে আইবি? ওইসব অফিসারদের নাম জানার অধিকার রয়েছে দেশের। ভারতের সংবিধানের যারা বিরোধিতা করে, তাদের লেখাপড়া করিয়ে হিন্দু (ব্রাহ্মণ্যবাদী) রাষ্ট্র তৈরিতে উস্কানি দেয় যে সমস্ত আইবি অফিসাররা, তাদের নাম জানার অধিকার রয়েছে গোটা দেশের।

অনেক সন্দেহভাজনের টিকিও ছোঁওয়া হয়নি:
এই মামলায় বেশ কিছু হাই প্রোফাইল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা সহ অনেকের নাম উঠে এসেছিল। কিন্তু চার্জশিটে তাদের কারোরই নাম ছিল না। বিস্তর প্রমাণ হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্ত হিসেবেই হোক বা প্রত্যক্ষদর্শী কোনো ভাবেই তাদের নাম ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে আদৌ কোনো তদন্ত হয়েছিল কিনা, সেটাও জানা যায়নি। এরমধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম রয়েছে, যাদের টিকিটিও ছোঁয়নি আইবি।

১. **হিমানী সাভারকর:** এই মহিলা হলো অভিনব ভারতের জাতীয় সভাপতি। বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে এরা অস্ত্র ও বিস্ফোরক কিনেছিল বলে অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে। তাদের অনেক বৈঠকেই সরকার ফেলে দিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হিমানী সাভারকর সেই কয়েকটা বৈঠকে নিজে উপস্থিতও ছিল (*হিন্দুস্তান টাইমস*, মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারি ২০০৯)। এটিএস নিজেরা জেনেছিল, যে বৈঠকে মালেগাঁও বিস্ফোরণ নিয়ে পরিকল্পনা হয়েছিল, সেখানেও এই মহিলা ছিল। এমনকি একটি ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা গেছে, সে বোমার বদলে বোমার তত্ত্বে বিশ্বাস করে। এত সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাকে অভিযুক্তই বানানো হলো না।

২. **ভিএইচপি নেতা অসীমানন্দ স্বামী:** গুজরাটের দঙ্গসে সাবরি ধাম আশ্রমের প্রধান অসীমানন্দ। কর্নেল পুরোহিত এবং সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং-এর সঙ্গে এর বরাবর যোগাযোগ ছিল। তাদের ও তার আশ্রমের দুই কর্মীকে যখন গ্রেফতার করা হলো, তখন সে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করার জন্য এটিএস সেরকম কোনো চেষ্টা চরিত্র করেনি।

৩. **ভিএইচপি নেতা প্রবীন তোগাড়িয়া :** নার্কো পরীক্ষায় পুরোহিত এই ভদ্রলোকের নাম নিয়েছিল। মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) উপাধ্যায় ও পুরোহিতের মধ্যে টেলিফোনে কথাবার্তাতেও এর নাম উঠে আসে। মুম্বাইয়ের হোটেলে তোগাড়িয়া পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করেছিল, তেমন প্রমাণও রয়েছে। ২০০৬ নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ডেও এর নাম জড়িয়েছিল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুবকদের ক্ষেপিয়ে তুলত তোগাড়িয়া। *আউটলুক ম্যাগাজিনে* প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন (২২ ডিসেম্বর, ২০০৮) অনুযায়ী, দিল্লির খবরের কাগজগুলোতে ২৫ নভেম্বর ২০০৮-এ একটি খবর বেরিয়েছিল, যে মুম্বাই বিস্ফোরণের একদিন আগে মালেগাঁও বিস্ফোরণে তোগাড়িয়ার সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল এটিএস। কিন্তু

মুম্বাই হামলার পর আচমকাই সন্দেহভাজনদের তালিকা থেকে তার নাম উধাও হয়ে যায়। অন্যদিকে তাকে বাঁচানোর জন্য এটিএসের চেষ্টাও ছিল জঘন্য মানের। *পুনে মিরর* (৯ জানুয়ারি ২০০৯)-এ পুরোহিতের নার্কো টেস্ট এটিএস-এর বৃথা পরিশ্রম শীর্ষক শিরোনামে বলা হয়েছিল, তোগাড়িয়া বলে পুরোহিত যার কথা বলেছিল, সে সেই প্রবীণ তোগাড়িয়া নয়। সে অওরঙ্গাবাদের কোনো এক ব্যক্তি। পুলিশ এখনও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ব্যাপারটা এই রকম, ধরুন কোনো রাজনৈতিক তর্কবিতর্কে কেউ আদভানির কথা তুললেন। আপনার মাথায় কিন্তু বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী লালকৃষ্ণ আদভানির কথা এলে হবে না, সে হতেই পারে মুম্বাইয়ের উল্লাসনগরের সিন্ধি কলোনীর আদভানি নামের কোনো ছোট ব্যবসায়ী। এই হাস্যকর দাবির মতো তোগাড়িয়ার ব্যাপারটাও অর্বাচীনের মতো।

৪. গুজরাটের 'তিন ভিএইচপি নেতা': এদের সঙ্গে অভিনব ভারতের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, অভিযুক্ত সমীর কুলকার্নির যোগাযোগ ছিল।

৫. ভিএইচপি-এর দিল্লির এক নেতা: পুনের আকাঙ্ক্ষা রিসোর্টের জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে যে শরদ কুন্তের নাম জড়িয়েছিল, তার সঙ্গে দেখা করতে সেই নেতা ২০০৩ সাল থেকে মাঝেমধ্যেই পুনে যাওয়া আসা করত।

৬. শরদ কুন্তে এবং ৭. প্রফেসর দেও: ২০০৮-এর নভেম্বর জালনা পুলিশ জেরা করে রাকেশ ধাওয়াড়েকে! আকাঙ্ক্ষা রিসোর্টে যারা বিস্ফোরক তৈরি ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে ওই দুই অধ্যাপক ছিল বলে ফাঁস করেছিল ধাওয়াড়ে। কিন্তু চার্জশিটে কোথাও তাদের নাম নেই। এটাও জানা নেই, ওই দুজনের বিরুদ্ধে আদৌ কোনো তদন্ত হয়েছিল কিনা, আর যদি হয়ে থাকে, তাহলে তা দিয়ে কীই বা হলো জানা নেই।

৮. শামরাও আপ্তে: অভিনব ভারতের হয়ে পুনের শিল্পপতিদের কাছ থেকে সে টাকা তুলেছিল। কিন্তু তার গায়েও হাত পড়েনি।

৯. পুনের দুজন খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ: খবরের কাগজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে পুনের দুজন বিখ্যাত ইতিহাসবিদের নাম উঠে আসা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে এটিএস। পরে তাদের নাম জানা যায়। একজন হলো নিনাদ বেড়েকর (মারাঠি দৈনিক *পুধারি*, সোলাপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)। কিন্তু

মুম্বাই জঙ্গি হামলার পর এবং কারকারেকে হত্যার পর তাদের নাম আচমকাই উবে যায়।

১০. মিলিন্দ একবোটে, প্রাক্তন বিজেপি কর্পোরেটর, পুনে এবং জয়ন্ত চিতালে, প্রাক্তন কর্নেল: *সানডে হিন্দুস্তান টাইমস,* ২৩ নভেম্বর ২০০৮ (মুম্বাই হামলার তিন দিন আগে)-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ওই দুই ব্যক্তিকে সামনের কদিনের মধ্যেই জেরা করতে পারে এটিএস। কিন্তু মুম্বাই জঙ্গি হামলার পর ওই তদন্ত ঠাণ্ডা ঘরে চলে যায়।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে ওপরের ঘটনাগুলো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কথা ভাবলে এর মধ্যে আরও রাজনৈতিক নেতা, ধর্মগুরু, ব্যবসায়ীসহ নানান ব্যক্তির নাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে। এ দেশের মানুষের জানা দরকার, তাদের জানার অধিকার আছে, এরা কারা, এদের বিরুদ্ধে ঠিক কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বৃহত্তর নেটওয়ার্ককে পাত্তাই দেওয়া হয়নি

সন্ত্রাসী জাল কতটা ছড়িয়ে তা বোঝা যাবে নীচের তথ্যগুলো থেকে,

১. সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল আলাদা হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। যাতে তাদের নিজেদের সংবিধান থাকবে। (যেরকমটা চার্জশিটে বলা হয়েছে)

২. জঙ্গিরা ফরিদাবাদ, কলকাতা, ভোপাল, জব্বলপুর, ইন্দোর, নাসিক, পুনে, দেওলালি ও জম্মু সহ বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করে।

৩. রাকেশ ধাওয়াড়ে পরভানি ও জালনা বিস্ফোরণে জড়িত ছিল।

৪. পুরোহিত তার নার্কো পরীক্ষায় স্বীকার করে, সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণে তার ভূমিকা ছিল।

৫. আজমির শরীফ ও মক্কা বিস্ফোরণেও জড়িত ছিল পুরোহিত।

৬. মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা নান্দেড়, আজমির এবং সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণেও জড়িত ছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে ১২ নভেম্বর, ২০০৮)

৭. মহন্ত দয়ানন পান্ডে বলেছিল, মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে আমাদের লোকেদের হাত আছে। (*সানডে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,* পুনে, ২৫ জানুয়ারি ২০০৯)

৮. সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং এবং অজয় রাহিরকর তাদের জবানবন্দিতে জানায়, পুরোহিতই ওড়িশা, কর্ণাটক ও আজমির শরীফ বিস্ফোরণের মূল চক্রী। (*হিন্দুস্তান টাইমস,* দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি, ২০০৯)

৯. অভিনব ভারতের সঙ্গে আজমির বিস্ফোরণের যোগ খুঁজে পেয়েছিল রাজস্থান পুলিশ (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া*, পুনে, ১৩ এপ্রিল ২০০৯)

১০. ২০০১ নাগপুর প্রশিক্ষণ শিবিরে যারা অংশ নিয়েছিল, তারাই মালেগাঁও এবং নান্দেড় বিস্ফোরণে জড়িত ছিল বলে সন্দেহ (*সকাল*, পুনে, ১০ নভেম্বর ২০০৮)

১১. নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে উঠে আসে, পুনেতে ২০০০ এবং ২০০৩ সালে প্রশিক্ষণ শিবির করেছিল বজরং দল।

এমনকি ক্রিমিনাল ল নিয়ে পড়ছে সেরকম কোনো ছাত্র কিংবা একজন শিক্ষানবিশ পুলিশ অফিসারও বলে দেবেন, ২০০০ সালে পুনেয় বজরং দলের প্রশিক্ষণ শিবির থেকে শুরু করে মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিনব ভারতের জুড়ে যাওয়াটা একটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ, যার ঠিকমতো তদন্ত হওয়াটা প্রয়োজন। হেমন্ত কারকারে ঠিক সেটাই করছিলেন। কিন্তু তার জায়গায় অস্থায়ী ভাবে যাকে আনা হলো (কে পি রঘুবংশী) সেই ব্যক্তিটি ২০০৮-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখাতে শুরু করল, সেভাবেই তদন্ত চালালো। কমিউনাল কমব্যাট ম্যাগাজিনে একটি সাক্ষাৎকারে সে বলে, এই মামলা একদম নিশ্চিদ্র বিষয়, চার্জশিটও সেভাবেই পেশ করা হয়েছে। কোনো রকম সমালোচনা এড়াতে অবশ্য এটিএস পরভানি মসজিদে বিস্ফোরণ ও জালনার মামলাটিও এর সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছিল।

ফলে রাকেশ ধাওয়াড়ের মতো ছোটখাটো মাছকেই বলির পাঁঠা বানানো হয়েছিল। তাকেই মূল চক্রী বলে চালানো হলো। মিঠুন চক্রবর্তী (একজন সিনিয়র আইবি অফিসার), হিমানী সাভারকর, শরদ কুন্তে, অধ্যাপক দেও, আকাঙ্ক্ষা রিসোর্টের মালিক, পুনের নামকরা দুই ইতিহাসবিদ সহ আরও বেশ কিছু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার মতো বড় মাছগুলোকে রেহাই দিয়ে দিল এটিএস।

যদিও মুম্বাই হামলা পরবর্তী সময়ে মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্ত শেষ করে এটিএস চার্জশিট দিয়ে দেয়। কিন্তু আসল কলকাঠিগুলো নেড়েছিল আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। এটিএস প্রধান রঘুবংশী বরাবরই হিন্দু মৌলবাদী শক্তি ও আইবি-র কথায় ওঠে বসে। চার্জশিট জমা দেওয়ার সময় কিছু অযৌক্তিক কথা রঘুবংশী বলে ফেলেছিল, তাই বিষয়টা আরও প্রকাশ্যে এসে গিয়েছিল। সে বলেছিল, ১১ জনের মধ্যে দুজন মাঝেমধ্যেই নেপালে যেত। তাদের সঙ্গে সেখানকার মাওবাদীদের যোগাযোগ ছিল। রঘুবংশী আরও বলে, তদন্তে জঙ্গিদের সঙ্গে ইজরায়েলের কোনো যোগাযোগ রয়েছে বলে প্রমাণ মেলেনি। (*হিন্দুস্তান টাইমস*, দিল্লি, ২১ জানুয়ারি ২০০৯) চার্জশিটে প্রমাণ হিসেবে যে সব নথিপত্র দেওয়া

হয়েছে, রঘুবংশীর এই দুই কথার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। চার্জশিটে দেখানো হয়েছিল, অভিযুক্তদের সঙ্গে নেপালের রাজার বৈঠক হয়। পুরোহিত এই ঘটনায় ইজরায়েলে যায় এবং সেখানকার সরকারের আশ্বাসবাণী সঙ্গে নিয়ে আসে (*পুনে মিরর*, ২২ জানুয়ারি, ২০০৯)। ফলে রঘুবংশী যেরকম নেপালের মাওবাদীদের কথা বলেছিল, চার্জশিটে সেরকম কিছু ছিলই না।

এই মামলার সঙ্গে আজমির, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসের ঘটনাকে কেনো টানা হলো না, তা নিয়ে চার্জশিটে হাস্যকর দাবি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, স্বামী অসীমানন্দ পলাতক। সে যদি ধরা পড়ে তবেই কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তারপরেই আজমির, মক্কা মসজিদ এবং সমঝোতা এক্সপ্রেসের ঘটনার সঙ্গে একটা যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। বোকার যুক্তি সন্দেহ নেই। কারণ এখন তো অন্তত পরিষ্কার হয়েই গেছে, কারা এই মামলার গভীরে গিয়ে তদন্ত করতে বাধা দিচ্ছিল, কেনই বা বাধা দিয়েছিল। এরমধ্যে কোনো একটা মামলাও যদি যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে শেষ করা যেত, তাহলে দেশজোড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যেতেই পারত। আর সেটাই চায়নি আইবি। সেই কারণেই মামলার বিশদ তদন্ত করা হয়ে ওঠেনি। সমঝোতা বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্ত কীভাবে ঠিকঠাক যায়গায় পৌঁছিয়েও পৌঁছল না, কীভাবে আইবি তা ঘেঁটে দিল, তা তো আগেই বলা হয়েছে। তবুও পাঠকদের আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ওই মামলার গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ আবার তুলে দিলাম।

সরকারি আইনজীবী অরুণ মিশার পুরোহিতের হেফাজতের মেয়াদ আরও বাড়ানোর জন্য নাসিক আদালতে জানিয়েছিল, সে সমঝোতা বিস্ফোরণকাণ্ডের জন্য আরডিএক্স-এর জোগান দিয়েছিল। (*দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৬ নভেম্বর ২০০৮)। এই বক্তব্য অবশ্যই পুরোহিতের নার্কো পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। ওই নার্কো পরীক্ষা হয়েছিল ৯ নভেম্বর ২০০৮-এ। *দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া,* পুনে, ১৮ নভেম্বর ২০০৮-এর প্রতিবেদনে জানায়, নাসিক আদালতে মিশার এই চাঞ্চল্যকর দাবি রাখার পর, তার বক্তব্য নিয়ে কেন্দ্রের কাছে নালিশ করে আইবি। কারণ যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন আইবি-র দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই কেন্দ্র পাকিস্তানের আইএসআই-কে এই জঙ্গি হানার জন্য দোষারোপ করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পরিষ্কার হয়ে যায়, আগে আইবি সমঝোতা নিয়ে যে সব উদ্ভট তত্ত্ব দিয়েছিল, তদন্তে সেই সব যদি ভুল প্রমাণ হয়, সে কারণে তারা এই বিষয়টা নিয়ে বেশি এগোতে দিতে চায়নি।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যে ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্র করে চলেছে, তা যাতে কোনো ভাবেই সামনে না আসে, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় আইবি। এমনকি

প্রয়োজনে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও তারা যে কতটা মরিয়া তা বোঝা যায় কারকারের খুনের পর, তার শরীরের রক্ত শুকোনোর আগেই তড়িঘড়ি রঘুবংশীর মতো একজন পরগাছা ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীকে কারকারের জায়গায় বসানোর ঘটনায়।

রঘুবংশীকে তার ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভুরা আর আইবি কীসের ঠেকা দিয়েছিল, সেটা তার পেশ করা চার্জশিটটা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করলেই বোঝা যায়। তার কাছে সম্ভবত নির্দেশ ছিল,

১. তদন্তের ক্ষেত্রটা ছোট করে এনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেলতে হবে। অন্যান্য বিস্ফোরণের তদন্ত এড়িয়ে যেতে হবে।
২. বিস্ফোরণের ঘটনাগুলো যেখানে পর পর একই সন্ত্রাসী পরিকল্পনার সুতোয় গাঁথা বলে স্পষ্ট, তা নিয়ে তদন্ত চলবে না, তার গভীরে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই।
৩. হেমন্ত কারকারের জন্য যা যা ক্ষতি হয়েছে সেসব কিছু ফের ঠিকঠাক জায়গায় নিয়ে আসা।
৪. গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন ও তাদের নেতাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখতে।
৫. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো কোনো ধারা চার্জশিটে রাখা চলবে না।

প্রয়াত হেমন্ত কারকারে কখনোই এইসব শর্ত বা নির্দেশে রাজি হতেন না।

রঘুবংশীর নিয়োগ নিশ্চিত হলো

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া (পুনে, ১২ জুন, ২০০৯)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি-র পদের উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয় মহারাষ্ট্র এটিএস প্রধানের পদটি। আর তাতে নিয়োগ করা হয় রঘুবংশীকে! পরে যা নিয়ে হাইকোর্ট সমালোচনাও করে। যেহেতু আমার ধারণার মধ্যে থেকেই সবকিছু হয়েছে, তাই আমি এতে খুব একটা অবাক হইনি।

যারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি-র গলাগলি সম্পর্কে জানেন, তারাও এতে অবাক হবেন না। রঘুবংশীকে নিয়োগ করার এত তাড়াহুড়ো নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা হয়। তার গোটাটাই মিথ্যে। আরও বলা হয়, ওই পদটি নাকি ছয় মাস ধরে ফাঁকাই পড়েছিল। এটা সত্যি যে হাইকোর্ট এটিএস-এর শীর্ষপদে নিয়োগ কেনো হচ্ছে না, তা নিয়ে সমালোচনা করেছিল। শূন্যপদ পূরণের জন্য চার সপ্তাহ সময়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশের কালি শুকোনোর আগেই সরকার তড়িঘড়ি শুধুমাত্র সেই পদে নিয়োগই করল না, উল্টে তার পদোন্নতিও ঘটাল।

পদ ছয় মাস ফাঁকা পড়ে থাকার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল, কোনো অফিসার নাকি ওই পদে যোগদান করতে রাজিই হননি। মহারাষ্ট্র কেনো, যে কোনো রাজ্যেই প্রায় ৬০ শতাংশ পদ এমন আছে, যে পদে যোগ দিতে কোনো অফিসারই রাজি হন না। সরকার কি সেই সব পদ ফাঁকা রাখে নাকি? মহারাষ্ট্র সরকার কবে থেকে পদে যোগ দেওয়ার জন্য অফিসারদের মতামতকে এত গুরত্ব দেওয়া শুরু করল?

আসল সত্যিটা হলো আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এটিএস প্রধান হিসেবে একমাত্র রঘুবংশীকেই চাইছিল। আর সেটাও কোনো অজ্ঞাত কারণে খুব তাড়াতাড়িই চাইছিল। যেহেতু ২০০৬-এর মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তের পর মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের মামলায় রঘুবংশীর চরম মুসলিম বিদ্বেষ সরকার দেখে ফেলেছিল, তাই তারাও চাইছিল না ওই লোকটা এটিএস-এর মাথায় বসুক। কিন্তু একইসঙ্গে আইবি-র মতো সুপার পাওয়ারের মুখের ওপর না বলার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। ফলে আদালতের নির্দেশকে সামনে রেখে আইবি-র কথা মতোই কাজটি সেরে ফেলা হলো।

এরপর তো সবকিছু ঠিকঠাক। সরকার তখন শুধু আদালতের নির্দেশের অপেক্ষাতে। এরপর আদালতের তরফে যেটা হলো সেটা অবশ্য আশা করা যায়নি। আদালতের নির্দেশে নির্দিষ্ট বলে কিছু ছিল না। সরকার যে আচমকা আদালতের নির্দেশের দোহাই দিয়ে এটিএস প্রধান হিসেবে রঘুবংশীকে নিয়ে এলো তা নিয়ে আদালত বাধাও দিল না। জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলে বোঝা যাবে এর পেছনে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চক্রান্ত কীরকম ছিল।

এই ঘটনাই প্রমাণ করে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ সব সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের হাতে নেই। চিদাম্বরম-মনমোহন কিংবা রাহুল বা সনিয়া গান্ধির হাতেও তা থাকে না। বরং আইবি-তে থাকা কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই আসলে তা করে।

এবার আসা যাক মালেগাঁও বিস্ফোরণের কথায়। মূল অভিযুক্ত পুরোহিত যেখানে এটিএস-এর অফিসারদেরই প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, যেখানে তাদের সঙ্গে বিস্ফোরণ মামলার তদন্ত করেছিল, সেখানে রঘুবংশীর নতুন নিয়োগ মানে বোঝাই যাচ্ছে। এখানে রঘুবংশীর পরামর্শদাতাই মূল অভিযুক্ত, আর তার কাছ থেকে শেখা বিষয়গুলো নিয়েই নাকি তাকে তদন্ত চালাতে হবে। মামলার যে কী হাল হবে, তা মোটামুটি সবাই বুঝতেই পারছেন।

পুরোহিত অ্যান্ড কোং-এর বিরুদ্ধে MCOCA নয়

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, (পুনে, ১ অগাস্ট ২০০৯)-র প্রতিবেদনে শিরোনাম ছিল, মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের ওপর থেকে MCOCA তুলে নেওয়া হলো। প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার (৩১ জুলাই ২০০৯) বড় ধাক্কা খেল মহারাষ্ট্র পুলিশের এটিএস। মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালত, মালেগাঁও বিস্ফোরণে সন্দেহভাজন পুরোহিত ও সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মকোকা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মকোকা তুলে নেওয়ার কারণ হিসেবে বিচারক ওয়াইডি শিণ্ডে জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা সংগঠিত কোনো অপরাধমূলক সংগঠনের সঙ্গে আদৌ জড়িত ছিল কিনা, তা নিয়ে কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা।

সন্দেহভাজন ষড়যন্ত্রীদের ধৃষ্টতা

কে পি রঘুবংশীর নিয়োগ নিশ্চিত হওয়া, MCOCA তুলে নেওয়ার মতো ঘটনা সামনে আসায় ২০০৮ মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তরা আরও বেশি উৎসাহিত হলো। *টুডে* (*সকাল,* পুনে)-র ৫ অগাস্ট ২০০৯-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, হেমন্ত কারকারে যখন এটিএস প্রধান ছিলেন তখন দেশজোড়া সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে নাম উঠে এসেছিল হিমানী সাভারকর এবং মিলিন্দ একবোটের। অভিযুক্তদের পক্ষে দাঁড়ানো আইনজীবীকে সংবর্ধনা জানায় তারা। সরকারকে উল্টো সমালোচনা করে তারা দাবি করে, নিজেদের সাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি বজায় রাখতে এবং মুসলিম তোষণ করতেই MCOCA-র মতো আইন অভিযুক্তদের ওপর চাপিয়েছিল সরকার। তাদের এতবড় ধৃষ্টতা যে তারা দাবি করে বসল, মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে হিন্দুদের ইচ্ছাকৃত ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। এমনকি তথাকথিত জিহাদিরাই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে দাবি করে বেড়াতে লাগল তারা। তাদের এই ধৃষ্টতা এবং আত্মবিশ্বাসই জানান দিচ্ছিল, তারা কারকারেকে খুনের বিষয়টা পুরোপুরি হজম করে ফেলেছিল।

মালেগাঁও বিস্ফোরণে এরপর কী হলো?

কারকারে যাই করে থাকুন না কেনো, সে সব চালাকি করে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হলো।

১. পুরোহিত আবেদন করেছিল, সে যাই করে থাকুক না কেনো, তা সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানেরই অংশ। সে আবেদন গ্রহণ হলো, তাকে ক্লিনচিট দেওয়া হলো। অন্ততপক্ষে গুরুতর অপরাধগুলো থেকে (পুরোহিত আগেই অবশ্য এই অবস্থান নিয়ে নিয়েছিল। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস,*

পুনে ২২ জানুয়ারি, ২০০৯। প্রতিবেদন- পুরোহিতের গোপন কার্যকলাপ: মালেগাঁও-এর ঘটনা সেনা গোয়েন্দাদের জঙ্গি বিরোধী অভিযান?)

২. অভিনব ভারতের কাজকর্ম ফের পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। পুরোহিত অ্যান্ড কোং-এর গ্রেফতারের ফলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা একদম থেমে গিয়েছিল। সেসব আবার শুরু হলো, সাথে মুসলিমদের ওপর দোষারোপের পালাও। এর ফলে হিন্দু (ব্রাক্ষণ্যবাদী) রাষ্ট্রর স্বপ্ন যেন ক্রমশই কাছে আসতে লাগল।

আমাদের রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে দরকার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। কিন্তু কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, সেই সম্পর্কে ভাবনাচিন্তার আগে ১৮৯৩ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় থেকে মহারাষ্ট্র ব্রাক্ষণদের সম্পর্কে এবং আইবিতে তাদের ভূমিকা নিয়ে একটু জেনে নেওয়াটা প্রয়োজন।

৯. মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সন্দেহজনক ভূমিকা

সেই ১৮১৮ সাল থেকে, যখন ব্রিটিশরা পুনেতে পেশোয়া ব্রাহ্মণদের সীমানা নির্দিষ্ট করে দিল, যা পরে ছত্রপতি শিবাজীর বংশধরদের হটিয়ে দখল করা, এবং যেখানে পেশোয়ারাই কার্যত শাসন চালাতে লাগল, তখন থেকেই গোটা দেশজুড়ে এই পেশোয়ার দখলদারির পরীক্ষা নীরিক্ষা চালানোর চেষ্টা করতে লাগল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তাদের ক্ষমতা দখলের লোভ কতটা গভীর ছিল, কেমন করে তারা বর্তমান গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতেও দাঁড়িয়ে এটা বিশ্বাস করতে লাগল যে তারাই আসল ক্ষমতার অধিকারী, তা সে তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ঠিকঠাক থাকুক বা না থাকুক, এবং ওই জায়গাটা ধরে রাখতে তাদের কতটা তীব্র ইচ্ছে, তা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক স্মিতা গুপ্তার কলামে স্পষ্ট হয়ে যায়।

আউটলুক ম্যাগাজিনে (৩০ মার্চ, ২০০৯)-এ তার লেখাতে তিনি বলেছিলেন, প্রয়াত ভি এন গাডগিলের মৃত্যুতে দুঃখ করে এক ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, তাদের সম্প্রদায়ের লোকজনের একসময় রাজনীতিতে বেশ কর্তৃত্ব ছিল, সেটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছে। এএসই থেকে পড়াশোনা করা এক ব্যরিস্টার, যিনি তিন বারের সাংসদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কংগ্রেসের মুখপাত্রও বটে, হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, মহারাষ্ট্রে আমরা তিন শতক আগে সেই সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছি। ব্রাহ্মণদেরই (পেশেয়া) মারাঠায় শাসন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, আসল ক্ষমতা এখন তাদেরই দখলে।

সে সময়কার একজন বেশ প্রগতিশীল ব্রাহ্মণের যদি এই ধারণা থেকে থাকে, তাহলে কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কীরকম মানসিকতা, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

গত ১১৫ বছরের বড়োসড়ো সাম্প্রদায়িক ঘটনা আর তার ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। তাদের মধ্যে খুঁজে দেখলে একটা অদৃশ্য সুতো খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৮৯৩ সালের পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গা থেকে শুরু করে ২০০৮-এর নভেম্বরের সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের রহস্যজনক ঘটনায় সেই অদৃশ্য সুতো আর কিছুই নয়, মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি।

১. ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রথম পূর্বপরিকল্পিত দাঙ্গা হলো ১৮৯৩ সালে, পুনেতে। ১৯ শতকের শেষে এলাকায় মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং অন্যান্যদের সংস্কারপন্থী আন্দোলন জোরদার ভাবে চলছিল। সেটা থেকে সাধারণ হিন্দুদের দৃষ্টি ঘোরাতেই এই দাঙ্গা করানো হয়েছিল।

২. হিন্দু মহাসভা এবং আরএসএস-এর মতো মুসলিম বিরোধী বিষ ছড়ানো এবং দাঙ্গা বাধানোয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ওস্তাদ সংঠনগুলোর শিকড় এই মহারাষ্ট্রতেই।
৩. হিন্দু মহাসভায় প্রতিষ্ঠাতা বীর সাভারকার একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী। এদের মূল অফিসটি মহারাষ্ট্রের পুনেতে।
৪. আরএসএস এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ড. হেগড়েওয়ারও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী। আরএসএস-র মূল অফিস নাগপুরে। হেগড়েওয়ার পরবর্তী দুই উত্তরাধিকারী গোয়ালকর গুরুজি এবং বালাসাহেব দেওরস, তারা দুজনেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী। বর্তমান আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও মহারাষ্ট্রর বাসিন্দা। দুজন প্রধান (সরসঞ্চালক) রাজেন্দ্র সিংজি এবং সুদর্শন ছাড়া সবাই মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদী। হিন্দুর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট বলছে, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অন্তত ৫৭ শতাংশ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী।
৫. মহারাষ্ট্রে বসেই গান্ধিজীকে খুনের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। নাথুরাম গডসে সমেত গান্ধি হত্যার সব চক্রীই যে মহারাষ্ট্রের তা তো সবাই জানেন।
৬. এমনকি মৃত্যুর পরেও মহাত্মা তাদের হাত থেকে রেহাই পাননি। তার হত্যার ৫০ বছর পর, সেই দিনটির সূবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালনের মতো নক্কারজনক কাজ করা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মি নাথুরাম গডসে বলতো (আমি নাথুরাম গডসে বলছি) নামে একটি নাটক লিখেছিল। সেখানে গান্ধির খুনীকে নায়ক হিসেবে দেখানো হয়েছিল। যে একজন ভঙ্গুর, বৃদ্ধ, শান্তির একজন অরক্ষিত দূত, যিনি দেশের জন্যই দেশভাগে রাজি হয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দিতে ভারত সরকারকে জোর দেওয়ার, সেই গান্ধিজীর খুনীর কাজকে, নাটকে আত্মসম্মান, গর্ব হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

নাটকের মঞ্চের সামনের সারির বেশিরভাগই দখল করেছিল কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। তারা হিরোর হিরোচিত ডায়ালগে জোরে হাততালি দিয়ে উঠেছিল, বাকিরাও তাদের তালিতেই তালি মিলিয়েছিল। এ দেশের সমাজের আদর্শ ছবি। যেখানে এক শতাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কিছু না বুঝেই অন্ধের মতো অনুকরণ, অনুসরণ করে বাকি ৯৯ শতাংশ মানুষ।

মহারাষ্ট্রে এই নাটক নিয়ে খুব একটা প্রতিবাদও দানা বাঁধতে পারেনি। যদিও কিছু ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংস্কারপন্থী মানুষজন টুকটাক এখানে ওখানে কিছু ব্যানার চাঙিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, বাপু আমরা লজ্জিত, আপনার খুনী এখনও বেঁচে আছে, 'বাপু হম শরমিন্দা হ্যায়, আপকি কাতিল অভি জিন্দা হ্যায়'। গুজরাটে গান্ধিজীর কট্টর সমর্থক চুনীভাই বৈদ্য গুজরাটিতে 'সুরজ শামে ধুল' নামে একটি বুকলেট ছাপিয়েছিলেন। নাটকের কিছু অংশ সেই বুকলেটে তিনি তুলে ধরেন, নিন্দা জানান। চুনী ভাইয়ের দাবি, ১৯৩৪ সাল থেকে ছয় বার গান্ধিজীকে খুন করার চেষ্টা করেছিল ব্রাক্ষণ্যবাদীরা। কিন্তু আগের চারবারের খুনের যে চেষ্টা হয়েছিল, সেই সময় দেশভাগের কোনো প্রসঙ্গই তখন ওঠেনি। ফলে পাকিস্তানকে ভারতের ৫৫ কোটি টাকার দেওয়ার বিষয়টিও ছিল না। তাছাড়া ছটির মধ্যে চারটি খুনের চেষ্টাই হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। এরমধ্যে তিনটে ঘটনায় জড়িত ছিল নাথুরাম গডসে। বাকি দুটিতে মহারাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত ছিল।

৭. উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে যে বেশিরভাগ বড়সড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকেই বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা ২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গার বিষয়গুলো আসে। আর এই প্রত্যেকটার পেছনেই মহারাষ্ট্রের ব্রাক্ষণ্যবাদীরা ছিল। সাধারণ হিন্দুদের পূজো ও উৎসবকে কেন্দ্র করে ঝামেলাগুলো লাগানো হতো।

৮. এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ, ব্রাক্ষণ্যবাদীদের হাতে হওয়া ৪৮টি সন্ত্রাসী ঘটনার মধ্যে ৩৫টিই হয়েছে মহারাষ্ট্রে। যদিও কিছু কিছু ঘটনায় সাধারণ হিন্দুও জড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে সব ঘটনার ঠিকমতো তদন্ত হলে দেখা যাবে এর পেছনে রয়েছে কোনো ব্রাক্ষণ্যবাদীর মাথা।

৯. সম্প্রতি মালেগাঁও বিস্ফোরণের তদন্তে যে বিষয়টি দেখা গেছে, সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে নড়বড়ে করে হিন্দু (ব্রাক্ষণ্যবাদী) রাষ্ট্র গড়ার ব্রাক্ষণ্যবাদীদের যে পরিকল্পনা, সেটাও হয়েছিল এই মহারাষ্ট্রে বসেই। কর্ণেল পুরোহিত সহএর বেশিরভাগ অভিযুক্তই মহারাষ্ট্রের ব্রাক্ষণ্যবাদী।

১০. জঙ্গি সংগঠন অভিনব ভারত এই সব চক্রান্তের মূল ঘাঁটি আর উৎসাহদাতা। এর শুরুটাও মহারাষ্ট্রেই। এর জাতীয় সভাপতি হিমানী সাভারকর একজন কট্টরপন্থী ব্রাক্ষণ্যবাদী। বীর সাভারকরের ভাইয়ের পুত্রবধূ। সেও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাক্ষণ্যবাদী।

১১. আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ ও সুরাতের অবিস্ফোরিত বোমার মামলার সঙ্গেও যোগ রয়েছে মহারাষ্ট্রের। বিস্ফোরণের কিছু সময় আগে টিভি চ্যানেলগুলোতে যে মেইল পাঠানো হয়েছিল সেটা নবি মুম্বাই থেকেই। বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়ি চুরি হয়েছিল সেই নবি মুম্বাই থেকে। সেই গাড়ি থানের তালসারি টোলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, যে টোলের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজগুলো নষ্ট করা হয়েছিল। অবিস্ফোরিত বোমাগুলো মারাঠি খবরের কাগজে মোড়া ছিল। সবথেকে বড় কথা আইবি-র হাত ধরে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গোটা বিষয়টায় নয়া মোড় দিয়ে দিতে পেরেছিল।

১২. দিল্লির বাটলা হাউস এনকাউন্টারের সময় জঙ্গিদের কাছ থেকে যে সিম কার্ড পাওয়া গিয়েছিল, তা আসলে মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের। ঔরঙ্গাবাদের কারোর সঙ্গেই জঙ্গিরা যোগাযোগ করেছিল বলে সিম কার্ড থেকে জানা গেছে। এই বিষয়ে লোক দেখানো একটা তদন্ত হয়েছিল। মূল চক্রীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। এই বিষয়ে একটু গভীরে গিয়ে যদি তদন্ত করা যেত তাহলে ঘটনার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যোগাযোগ প্রকাশ হয়ে যেত।

১৩. অগাস্টের ২০০৮-এ কানপুর বিস্ফোরণের সময় মহারাষ্ট্রের যোগাযোগ ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনায় বোমা তৈরি করতে গিয়ে দুই বজরং দল সমর্থক (রাজীব মিশ্র এবং ভূপেন্দর সিং)-এর মৃত্যু হয়। তদন্তে জানা যায়, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ফিরোজাবাদে বড়োসড়ো নাশকতার ছক ছিল তাদের। বিস্ফোরণের আগে দুমাস ধরে মুম্বাইয়ের দুটি মোবাইল ফোন থেকে মাঝেমধ্যেই তাদের কাছে ফোন আসত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আশ্রয়ে থাকা আইবি-র চাপে আসল দোষীকে এখনও চিহ্নিত বা পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি।

১৪. সিএসটি স্টেশনে ২৬/১১ মুম্বাই হামলায় যারা তাণ্ডব চালিয়েছিল, তারা যে মোবাইল ব্যবহার করেছিল, তা মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলা থেকে নেওয়া হয়েছিল, সে যার নামেই নেওয়া হয়ে থাকুক না কেনো। বিষয়টির বিশদভাবে তদন্ত করলেই বোঝা যেত, এখানেও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোর কালো হাত রয়েছে। কিন্তু সঙ্গত কারণেই এই বিষয়টি আইবি ও মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ চেপে গিয়েছিল।

ওপরে যে ঘটনাগুলো বলা হলো, তা কেবল নমুনা মাত্র। এখান থেকেই বোঝা যায় ভারতে সাম্প্রদায়িক ঘটনায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রক্ষণ্যবাদীদের কীরকম ভূমিকা রয়েছে।

মহারাষ্ট্র, হিন্দুত্বের (ব্রাহ্মণ্যবাদের) ল্যাবরেটরি

২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গার পর মিডিয়া গুজরাটকে হিন্দুত্বের (ব্রাহ্মণ্যবাদের) ল্যাবরেটরি বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু একথা মোটেই ঠিক নয়। ১৮৯৩ সাল থেকেই হিন্দুত্বের পরীক্ষাগার হলো এই মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের গবেষণার বিষয় হলো, সমাজে কেমন করে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা যায়, তার নিজেদেরকে বাঁচিয়ে কেমন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যান্য হিন্দুদের ভিড়িয়ে দেওয়া যায়। তাদের গবেষণাগারে এই গবেষণা চলতে থাকে, আর পরীক্ষানিরীক্ষা চলে অন্যান্য রাজ্যে। গুজরাটের গণহত্যা আর বাবরি মসজিদ ধ্বংস হলো তাদের সবথেকে সফল পরীক্ষা, যাতে সব সম্প্রদায়ের মানুষের গায়েই আঁচ পড়েছে, কিন্তু নিশ্চিন্তে নিরাপদেই থেকে গেছে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

এই ঘটনায় গুজরাট দাঙ্গার সাত বছর আগের আরেকটা ঘটনার কথা মনে করা যেতে পারে। ১৯৯৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়, শিবসেনা নেতা মনোহর যোশী মহারাষ্ট্রকে হিন্দু রাজ্য বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই যোশীকে ৬০-এর দশকের শেষে শিবসেনায় কায়দা করে ঢুকিয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই। পরে অন্যান্য সিনিয়র নেতাদের টপকে সে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বনে গিয়েছিল। ধর্মনিরেপক্ষতার নীতিকে বিকিয়ে দিয়ে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অসাংবিধানিক কাজ করেছে যোশী, এই মর্মে বম্বে হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে বম্বে হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট বলে, আদালত মনে করছে, মহারাষ্ট্রে হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি, নেহাতই তার নিজের বক্তব্য মাত্র। এতে ধর্মের নামে ভোট চাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, এটা স্রেফ এই ধরনের যে আশা, সে আশার অভিব্যক্তির প্রকাশমাত্র।

টাইমস অব ইন্ডিয়া (দিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)-র প্রতিবেদনে আইনি ভাষ্যকার মনোজ মিত্তার পর্যবেক্ষণ ছিল, ১৯৯৬-এ হিন্দুত্বের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের এহেন ক্লিনচিট, রাজনৈতিকভাবে বেশ ক্ষতিকর। সঙ্ঘ পরিবার তাদের সংকীর্ণ কাজকর্মকে যুক্তি দিয়ে খাড়া করার চেষ্টা চালাচ্ছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায় তাদের হাতে সেই অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। হিন্দুত্ব নিয়ে ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম

কোর্টের রায়কে রাজনৈতিকভাবে একমত হয়ে আইনি ভাবে বাতিল করার পক্ষে সওয়াল করেন মনোজ মিত্তার।

মিত্তার এই পরামর্শতে রাজনৈতিক দলগুলো আদৌ কতটা গুরুত্ব দেবে তা তো ভবিষ্যতই বলবে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি, সেটা হলো মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই দেশে সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার মূল অপরাধী, এরাই মহারাষ্ট্রকে হিন্দুত্বের ল্যাবরেটরি বানিয়ে ছেড়েছে।

মহারাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত গুজরাটের মতো সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যে তৈরি হয়নি, বা ভবিষ্যতে যদি তৈরি না হয়, তাহলে তার কৃতিত্ব দেওয়া দরকার রাজ্যের সংস্কারপন্থী আন্দোলনকে। যদিও তা বেশ নড়বড়ে ও দুর্বল। আসলে সুফি বা সন্ন্যাসীরা তো ওভাবে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন না, বা সেরকম কোনো ঐতিহ্যও তাদের নেই। কৃতজ্ঞ থাকা দরকার মহারাষ্ট্র পুলিশের কাছেও। নানান সমস্যা ঘাড়ে নিয়েও, তারা অন্তত সাম্প্রদায়িক ইস্যুগুলোতে যথেষ্টই সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুখের ওপর কথা বলার সাহস দেখান না কোনো রাজনৈতিক নেতাই

হাস্যকর ব্যাপার হলো, কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো নেতাই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস পান না। অন্য রাজ্যে যেরকম সরাসরি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়, এখানে ওসবের বালাই নেই। তা সে যত বড়ই রাজনৈতিক নেতা হন না কেনো, তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মারাত্মক ভয় পায়। কারণ তাদের নানা কেচ্ছা কাহিনীর নাড়ি নক্ষত্র জেনে রেখে দেয় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। বেশি বাড়াবাড়ি করলেই, মিডিয়ার সামনে তা ফাঁস হওয়ার ভয় থাকে। আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির নেতাদের ভয়, তাদের হয়তো মিডিয়া থেকেই বয়কট করিয়ে দেওয়া হবে। স্বাভাবিক ভাবেই এ তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের ক্ষতি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়, রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অবাধে দৌরাত্ম্য চালিয়ে যেতে থাকে। কারোর কিছু বলার থাকে না।

১০. আইবি-র বিরুদ্ধে চার্জশিট

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আইবি-র তরফে নানান ভ্রান্তি এবং গোঁজামিল ছিল। এমনকি স্বাধীনতার আগেও খুব একটা কম ছিল না। কী কী ছিল, একবার তাতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

১. আরএসএস-এর সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ নিয়ে সরকারকে অন্ধকারে রাখা

আরএসএস এর মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোর সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম নিয়ে আইবি সরকারকে বরাবরই অন্ধকারে রেখে দিয়েছে। না হলে আরএসএস-এর পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ রকম বিদ্বেষমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না গত ৬০ বছর ধরে ভারত জুড়ে ৪৫ হাজার শাখা সংগঠন খোলার।

২. আরএসএস-কে জাতীয়তাবাদী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খাড়া করা

অন্যদিকে পুলিশ, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারকে পাঠানো আইবি-র বিভিন্ন রিপোর্ট একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, আরএসএস-কে তারা নেহাতই একটি জাতীয়তাবাদী, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে খাড়া করার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। আর এভাবেই আরএসএস-এর বিষাক্ত দাঁত-নখ ছড়িয়ে গেছে গোটা দেশ জুড়ে।

৩. বামপন্থী আর ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর জন্য আলাদা নীতি

বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ ও মুসলিম সংগঠনগুলোর প্রতি কিন্তু আইবি একদম আলাদা নীতি গ্রহণ করেছিল। তাদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজ নিয়ে তারা সরকারকে ভুয়া আর গোঁজামিল দেওয়া তথ্য দিয়েছিল। অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাম্প্রদায়িক ও জাতিবিদ্বেষের বিষয়টি যাতে অবাধে চলতে দেওয়া যায়, লক্ষ্য ছিল সেটাই।

৪. মহাত্মার হত্যাকে উপেক্ষা করা

ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে আইবি, জাতির জনকের হত্যার বিষয়টি ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও তারা জানত, ১৯৩৪ সাল থেকেই তাঁকে খুনের চেষ্টা করে চলেছিল পুনের ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী, এবং মূল চক্রী নাথুরাম গডসেও কয়েকবার এই চক্রান্তে শামিল হয়েছিল।

৫. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সামাল না দেওয়া

স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রাক্ষণ্যবাদী গোষ্ঠীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে দাঙ্গা বাধাত। আর তা স্বাধীনতার পর গত ৬০ বছর ধরে গোটা দেশে ছড়িয়েছে হু হু করে। দেশের গোয়েন্দা দফতরের ভূমিকা এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সন্দেহজনক। যদি আইবি ঠিকঠাক তাদের দায়িত্ব পালন করত তাহলে এভাবে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষ ছড়াতো না, সম্প্রীতির আবহ বহাল থাকত।

৬. মুসলিম সম্প্রদায়কে ইচ্ছাকৃত ভাবে বদনাম করা: মুসলিম যুবকদের ওপর আরডিএক্স চাপিয়ে দেওয়া

টাইমস অব ইন্ডিয়া (দিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭)-এ বলা হয়, সিবিআই-র তদন্ত উঠে এসেছে, আইবি, দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুই মুসলিম যুবকের কাছে আরডিএক্স রেখে দিয়েছে। মুহাম্মদ মোয়ারিক কামার এবং ইরশাদ আলি-কে সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়ার চেষ্টায় ছিল তারা। ব্রাক্ষণ্যবাদীদের কাজকর্ম থেকে নজর ঘোরাতে মুসলিমদের বদনাম করার এটা একটা চলতি পথ।

৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকে 'এনকাউন্টার'বলে সাফাই দেওয়া

১৯৯১ সালের ৩০ ডিসেম্বর তৎকালীন গুজরাটের ডিজিপি কে পি এস গিল-কে চিঠি লিখেছিল তৎকালীন আইবি প্রধান ভিজে বৈদ্য। সেই চিঠিটা ছাপা হয়েছিল *হিন্দুস্তান টাইমস* (মুম্বাই, ৫মে, ২০০৭)-এ। আইনি বৈধতা ছাড়াই যে কতজনকে তারা খুন করেছে, এসব অনেক পুলিশ অফিসার বিদেশি মিডিয়ার কাছে ফাঁস করে দিচ্ছে বলে চিঠিতে উল্লেখ ছিল। বৈদ্য গিলকে পরামর্শ দেয়, তাদের (পুলিশ অফিসাররা) পেশাদারী ব্যাপারস্যাপার জনসমক্ষে নিয়ে আসাটা বাঞ্ছনীয় নয়। আসলে বৈদ্য যেটা বোঝাতে চাইল, যে এনকাউন্টারে আইবি-র অন্তত কোনো না নেই। সেটা মিডিয়ার কাছে ফাঁস না হলেই হলো।

৮. মুসলিমদের খারাপ ভাবে দেখানোর জন্য গোপন তথ্যের নামে গুজব রটানো

গোপন তথ্যের নাম করে আইবি ইচ্ছে করে গুজব রটায়। ভিআইপি, গুরুত্বপূর্ণ ধর্মস্থান ও এলাকায় মুসলিম সন্ত্রাসী হানার আতঙ্ক ছড়ায়। এর মধ্যে দিয়েই গোটা দেশে একটা মুসলিম বিরোধী হাওয়া গরম করার চেষ্টা চলে। আসল লক্ষ্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্যটি ধরে রাখা, এবং সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের লড়াই বাধানো।

৯. ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কাজকর্মকে ইচ্ছাকৃত ভাবে এড়িয়ে যাওয়া

অন্যদিকে যেখানে আসল ব্রাহ্মণ্যবাদী সন্ত্রাসীরা তাদের জঙ্গিদের দেশজোড়া সন্ত্রাস চালানোর জন্য বোমা বন্দুকের ব্যবহার নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, টাকা, অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক জোগাড় করতে থাকে, সেখানে আইবি চোখ বন্ধ করে রাখে। ওই সব জঙ্গিদের কিন্তু অবাধ ছাড়।

১০. অভিনব ভারত ও তার দেশবিরোধী কাজকর্ম নিয়ে সরকারকে অন্ধকারে রাখা

মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তের সময় যখন কর্নেল বাপ্পাদিত্য ধর এটিএস-এর কাছে জবানবন্দি দিয়েছিল, তখন থেকেই কিন্তু আইবি জানত, মৌলবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠন অভিনব ভারত কী কী দেশবিরোধী কাজ করে চলেছে (*হিন্দুস্তান টাইমস*, মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৯)। কিন্তু এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সরকারকে কোনো রকম সতর্কতাই দেয়নি আইবি। তার ওপর এরকমও সন্দেহ করা হয়, তাদের কাজকর্মে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিল খোদ আইবি-ই।

১১. প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বোমা বিস্ফোরণ তদন্তগুলোতে অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ

আইবি অপ্রয়োজনীয় ও জোরজবরদস্তি করে বিস্ফোরণের তদন্তগুলোতে নাক গলায়। মুসলিমদের খারাপ দেখানোর জন্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদী জঙ্গিদের বাঁচানোর জন্য গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াকেই ভুল দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেখানে স্থানীয় পুলিশ তদন্ত প্রায় শেষ করেই এনেছিল, সেই সব জায়গায় তদন্তের বিষয়টিকে ঘেঁটে দেওয়ার জন্য তথ্যপ্রমাণ সাজিয়ে গুছিয়ে মামলাটির চেহারাই বদলে দেয় তারা। আবার কোনো কোনো তদন্তে প্রমাণ যাতে তদন্তকারীদের হাতে না আসে, সেই চেষ্টা চলে। আইবি যেরকমটা চায়, মামলাটিকে সেভাবেই শেষ করানোর জন্য সমস্ত ছক কষা হতে থাকে। পরে দেখা যায়, কোনো না কোনো ভাবে ওই ঘটনায় ব্রাহ্মণ্যবাদী জঙ্গিরা জড়িত।

১২. তথাকথিত সন্দেহজনক সন্ত্রাসী হানার ঘটনায় তদন্ত করতে না দেওয়া

সরকারের ওপর প্রভাব খাটিয়ে, সংসদে হামলা, নাগপুরে আরএসএস-এর সদর দফতরের সামনে হামলা এবং আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের মতো ঘটনাগুলোর ঠিক মতো তদন্ত করতে দেয়নি। অথচ এই ঘটনাগুলোর পেছনে আইবি-র যথেষ্ট সন্দেহজনক ভূমিকা রয়েছে।

- **সংসদে হামলা:** সংসদে হামলা নিয়ে গবেষণাধর্মী অন্তত তিনটি বই অথবা প্রতিবেদন রয়েছে। ১) ১৩ ডিসেম্বর—*অ্যা রিডার: দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অব অ্যাটাক, অন দ্য ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট* (প্রজন্ম পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত *'একটি ফাঁসির জন্য'*)। এটা লিখেছিলেন বেশ কিছু আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও লেখক। বইটির মুখবন্ধ লিখেছিলেন অরুন্ধতী রায়। ২) ডিসেম্বর ১৩-টেরর ওভার ডেমোক্রেসি, নির্মলাংশু মুখার্জী এবং ৩) পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস এর একটি বিশদ প্রতিবেদন। যে প্রতিবেদনে সরকার ও আইবি-র মিথ্যে দাবিকে নস্যাৎ করা হয়েছে হামলার পেছনের আসল ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে।
- **নাগপুরে আরএসএস-এর সদর দফতরে হামলা:** নাগপুরে আরএসএস সদর দফতরে হামলার ব্যাপারটা এত খারাপ ভাবে করানো হয়েছিল, যে গোটা ব্যাপারটাই একটা হাস্যকর জায়গায় চলে যায়। নাগপুরের অন্তত পাঁচজন সিনিয়র অফিসার হামলার অন্তত এক সপ্তাহ আগে জানত যে জঙ্গিদের বদভানী (মধ্যপ্রদেশ) এলাকায় রাখা হয়েছে এবং আইবি নাগপুর বা তার কাছে কোনো একটা অভিযানের পরিকল্পনা করছে। বিস্ফোরণের পর, এমনকি স্কুলের বাচ্চারাও যারা আইবি কী জিনিস জানতই না, তারাও বলতে শুরু করেছিল এটা আইবি-রই কোনো একটা অভিযান। আসল সত্যিটা কী তা জানতে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন হাইকোর্টের এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিজে কোলসে-পাতিলকে নিয়ে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করায়। কমিটি পুলিশের দেওয়া গল্পে বিস্তর ফাঁকফোকর খুঁজে পেয়েছিল এবং এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তোলে তারা।
- **আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ:** এই ব্যাপারটা নিয়ে এ বইয়ের তিন নম্বর অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল, যে বিস্ফোরণটি আইবি-রই সাজানো গোছানো।

ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বিস্তর দাবি থাকা সত্ত্বেও ওপরের মামলাগুলোর কোনোটাতেই বিচারবিভাগীয় তদন্ত হয়নি।

১৩. সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ মামলায় ফাঁকফোকর তৈরি করা

এই বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে অন্তত দুবার ফাঁকফোকর তৈরি করিয়ে দিয়েছিল আইবি। প্রথমত, যখন হরিয়ানা পুলিশ তদন্তের প্রায় শেষে, এবং দ্বিতীয়বার মহারাষ্ট্র এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারের নেতৃত্বে যখন তদন্ত পুরোপুরিই শেষ

হয়ে গিয়েছিল তখন। দেশের সম্মান রক্ষার ছুতো দেখিয়ে আইবি এই কাজ করলেও, আসল লক্ষ্য ছিল ঘটনায় জড়িত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আড়াল করা।

১৪. এটিএস-এর প্রশিক্ষণে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পুরোহিতকে আমন্ত্রণ

আইবি খুব ভালোভাবেই কর্নেল পুরোহিত ও তার অভিনব ভারতের কাজকর্ম নিয়ে ওয়াকিবহাল ছিল। কারণ তাদের বেশ কিছু আলোচনায় আইবি-র লোকজনও ছিল (*হিন্দুস্তান টাইমস,* মুম্বাই, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৯)। তা সত্ত্বেও বিস্ফোরক নিয়ে মহারাষ্ট্র এটিএস-এর প্রশিক্ষণ শিবিরে পুরোহিতের আসা নিয়ে আইবি কোনো আপত্তি তোলেনি। সেই সময়কার এটিএস প্রধান কে পি রঘুবংশী ও আইবি-র ঘনিষ্টতার কথা মাথায় রাখলে সন্দেহ করাই যায়, যে আইবি-র তরফেই পুরোহিতকে প্রশিক্ষণে আনানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

১৫. বিস্ফোরক উদ্ধার মামলায় পুরোহিতের তদন্ত নিয়ে আপত্তি না তোলা

মহারাষ্ট্র এটিএস-এর সঙ্গে কর্নেল পুরোহিত ঔরঙ্গাবাদে ৪৩ কেজি আরডিএক্স উদ্ধারের ঘটনার যে তদন্ত চালিয়েছিল, আইবি তা নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেনি! অথচ পুরোহিত নিজেই সেই ঘটনায় জড়িত ছিল। কারণ সে ছাড়া আর কারোর পক্ষে এত পরিমাণে আরডিএক্স জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের তদন্তে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভাবুন, পুরোহিত নিজেই এর তদন্তে এটিএস-কে রাস্তা দেখাচ্ছিল। মানে অভিযুক্ত নিজেই নিজের মামলার তদন্ত চালাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আইবি-ও চায়নি ব্যাপারটার তদন্ত ঠিক পথে এগোক।

১৬. মার্কিন নাগরিক হেডলিকে দেশ ছাড়তে দেওয়া

আহমেদাবাদ বিস্ফোরণের সময় মার্কিন নাগরিক হেডলির কম্পিউটার থেকে মেইল পাঠানো হয়েছিল! যদি হেডলির নামে নিয়ম মেনে লুক আউট নোটিশ জারি হতো, তাহলে তার দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল না।

১৭. কারকারের জায়গায় লজ্জাজনক দ্রুততার সঙ্গে বিতর্কিত অফিসারকে বসানো

এটিএস প্রধান হেমন্ত কারকারের দুঃখজনক মৃত্যুর ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই বহু বিতর্কিত অফিসার প্রাক্তন এটিএস প্রধান কেপি রঘুবংশীকে, তার জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হলো। সাময়িক এই এটিএস প্রধান মুসলিম বিরোধিতা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতার লোক ছিল। তারপর যা ভাবা হয়েছিল, মাস ছয়েকের

মধ্যেই তার নিয়োগ পাকা করে দেওয়া হলো। যে মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জড়িত ছিল, সেই মামলায় আইবি বেশ আগ্রহ দেখাতে শুরু করে দিল। আইবি আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আঁতাত রঘুবংশীর সঙ্গে তাদের খাতিরের কথা মাথায় রেখে বলা যায়, রঘুবংশীকে এত তড়িঘড়ি কারকারের পদে বসানো, আইবি-র হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভব হতো না।

১৮. মুম্বাই বিস্ফোরণ হামলার ঘটনায় আগেভাগে মেলা তথ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে আটকে রাখা

মুম্বাইতে হামলা নিয়ে যেখানে মুম্বাই পুলিশ, রাজ্য সরকার ও পশ্চিমা নৌ কমান্ডের কাছে আইবি মাঝেমধ্যে ভুলভাল, বকওয়াস সতর্কতাও জারি করে থাকে, সেখানে ২৬/১১ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, কুমতলবের জন্য আইবি তা বেমালুম চেপে গিয়েছিল।

১৯. 'র' তাদের হাতে যে ৩৫টি মোবাইল ফোন নং তুলে দিয়েছিল, তা নিয়ে ইচ্ছাকৃত ভাবে তদন্ত না করা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মাধ্যমে 'র', আইবি-র কাছে ৩৫টি মোবাইল ফোন নম্বর দিয়েছিল। ওই নম্বরগুলো মুম্বাই বিস্ফোরণের দিন পাঁচেক আগে থেকে লশকর জঙ্গিরা ব্যবহার করেছিল। রঙ্গভবনের ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত ওই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো তদন্ত চালানো হয়নি। কিন্তু তা থেকে পাওয়া কিছু তথ্য সন্দেহজনক কাজে ব্যবহার করেছিল তারা।

২০. সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনায় সন্দেহজনক ভূমিকা

সরকারকে নড়বড়ে করে, হিন্দু রাষ্ট্রের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র গড়ার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যে ছক, তা বানচাল হয়ে যাচ্ছিল হেমন্ত কারকারের জন্য। সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনায় সেই কারকারেকে খুন করা হলো। আইবি-র অসৎ উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হয় এতে।

২১. ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলো যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, তা যে দেশজোড়া বৃহত্তর সন্ত্রাসী হামলার ছক, সেটা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে

২০০৮-এ মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ড, সেখানে ২০০৬-এর বিস্ফোরণের ঘটনা, নান্দেড়, সমঝোতা এক্সপ্রেস, আজমির দরগা শরিফ, মক্কা মসজিদ সহ কর্ণাটক ও ওড়িশায় বিস্ফোরণের কিছু ঘটনায় জড়িত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী জঙ্গি সংগঠন অভিনব ভারত। সরকারকে নড়বড়ে করাই ছিল লক্ষ্য। এই বিষয়টি প্রকাশ

হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোনো আইন চার্জশিটে আনতে দেওয়া হয়নি। এইসব মামলার তদন্তে পরোক্ষ ভাবে যে মাথা খাটাচ্ছিল, সেই আইবি-র নির্দেশ ছাড়া এই কাজ হবে, এমনটি ভাবা বোকামো।

২২. আইবি-র সন্দেহজনক ভূমিকা আড়াল করার জন্য বহু তথ্য চেপে রাখা

মুম্বাই হামলার মামলায় বহু ভ্রান্তি ও উদভ্রান্তি চাপতে, কারকারে খুন হয়েছিল যেখানে, সেই সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের ঘটনায় নিজেদের ভূমিকা আড়াল করতে বহু তথ্য বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছিল। মুম্বাই ক্রাইম ব্রাঞ্চকে চাপ দিয়ে বুঝিয়ে তদন্তকে ইচ্ছেমতো পথে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আইবি। হামলা চলাকালীন সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের সিডি-র মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জনসমক্ষে আনা হয়নি। বিশেষ করে হামলার প্রথম চার ঘণ্টায় পুলিশ কন্ট্রোল রুমের লগ বুক, কারকারে সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের মোবাইল ফোনের কথাবার্তার মতো বিষয়গুলো গোপন তথ্যের নাম করে চেপে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি-র আঁতাত ফাঁস হয়ে যাবে, এই ভয়েই এই রকম তথ্যগুলো চেপে যাওয়া হয়েছিল। এছাড়াও সিএসটি, রঙ্গভবন লেন, বধওয়ার পার্কে সন্ত্রাসীদের যারা স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সেই প্রত্যক্ষদর্শীদেরও জনসমক্ষে আসতে দেওয়া হয়নি। যারা জঙ্গিদের বন্দুকের সামনে পড়েছিলেন, তাদেরও প্রত্যক্ষদর্শীদের তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এসবের জলজ্যান্ত উদাহরণ হলো অনিতা উদ্‌য়ার ঘটনাটি। এই নিয়ে মুম্বাই হামলা সংক্রান্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তখন থেকে এখনও পর্যন্ত ১৯২৩-এর সরকারি গোপনীয়তা আইন হলো আইবি-র হাতিয়ার। যে সব অফিসার ও সাধারণ মানুষকে আইবি মনে করে তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদের ঘাড়েই আইবি এই আইন চাপিয়ে দেয়। এমনকি আইবি-র কীর্তিকলাপ নিয়ে তাদের প্রাক্তন কর্তারাও যদি কিছু বইপত্তর লেখালিখি করে থাকেন, তাহলে তাদেরও রেহাই মেলে না। তাদেরকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেওয়া হবে না। এখন সময় এসেছে, পালটা আইবি-র বিরুদ্ধে ময়দানে নামার। ওপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলোর যদি ঠিকমতো নিরপেক্ষ তদন্ত চালানো যায়, তাহলে এই আইনেই অনেক আইবি-র কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও কর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

১১. দেশ ও সমাজ বাঁচাতে খুব শিগগিরই যে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি

হাতে গোনা কয়েকজন ব্রাহ্মণ্যবাদী কোটি কোটি ভারতবাসীকে একশোরও বেশি বছর ধরে নাচিয়ে চলেছে, এটা ভাবতে অবাক লাগে। এটা প্রায় অবিশ্বাস্যও বটে। এটাতে আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়, "আমরা কিছু মানুষের সঙ্গে অথবা সব মানুষের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য প্রতারণা হয়তো করতে পারি, কিন্তু আমরা সব মানুষের সঙ্গে সব সময় প্রতারণা করতে পারি না।" আমরা যদি ভারতীয় সমাজকে ব্রাহ্মণ্যবাদের খপ্পর থেকে বের করে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তাহলে আমাদের জাগতে হবে আগে, আর সরকার, প্রশাসন, আইন, সামাজিক সব স্তরে কিছু তো সংশোধনী আনতেই হবে।

১. সরকারে জরুরি ভিত্তিতে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা আনতে হবে

তদন্তকারী কমিটি

যদি দেশজোড়া ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ সরকারকে খুলতেই হয়, তবে তাদের অনতিবিলম্বে দুটো উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়তে হবে।

- ২০০১ সাল থেকে সমস্ত বিস্ফোরণ ও হামলার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালানোর জন্য।
- মুম্বাই হামলার সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের পর্বটি তদন্ত করে দেখার জন্য।

প্রথম কমিটির মাথায় কোনো সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থাকতে পারেন, সঙ্গে থাকতে পারেন হাইকোর্টের দুজন বিচারপতি, সঙ্গে ১০ জন নামকরা ক্রিমিনাল লইয়ার এবং এদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, পেশাদারী ও পারদর্শী সিনিয়র পুলিশ অফিসার থাকতে হবে। তারা এবার তাদের অধীনে যতজন ইচ্ছে তদন্তকারীদের রাখতে পারবেন। মুম্বাই হামলার সিএসটি-সিএএমএ-রঙ্গভবন লেনের পর্বটি তদন্তের জন্য গঠিত কমিটিতে কর্মরত হাইকোর্টের কোনো বিচারপতি, সঙ্গে দুজন নাম করা আইনজীবী থাকুন। এদের সহযোগিতায় থাকুন সেরকম ভাবনাচিন্তার পুলিশ অফিসারদের একটি টিম। এই কমিটির কেউ, এমনকি বিচারপতিরাও, কোনো রকম ভাবেই কোনো ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী এবং ফ্যাসিস্ট সংগঠন বা তার ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন না। পুলিশ

অফিসার যাঁরা থাকবেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। দুটি কমিটিকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করার কথা বলা হবে।

পিএমও, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, বিদেশমন্ত্রক, এবং রাজ্য সরকার সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রশাসনের সঙ্গে ঠিকঠাক যোগাযোগটা যেন হয়

কেন্দ্রীয় সরকারের থাকা শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা এই যেকোনো কিছুকেই সত্যি বলে ধরে নেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, বিদেশমন্ত্রক ও প্রতিরক্ষামন্ত্রকের মধ্যে বিস্তর যোগাযোগের অভাব, স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। এই কারণেই তাদের আইবি-তে থাকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বছরের পর বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। আইবি-র ডিরেক্টর যেহেতু সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছেই তথ্য দেওয়া নেওয়া করে, এবং কভার অপারেশন, কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন, অ্যান্টি টেরর অপারেশন, গোপন কূটনৈতিক অভিযান, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো শব্দগুলোর অবাধ ব্যবহার করে থাকে, সেহেতু আইবি অন্যান্য সিনিয়র মন্ত্রী বা আমলার কাছ থেকে এই সব ব্যাপার চেপে যায়। তাদেরকে অন্ধকারেই থাকতে হয়। এর পরেই জঙ্গি, মৌলবাদী, গুপ্তচর, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হামলা এই সব নাম দিয়ে এনকাউন্টার কিংবা গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ করতেই থাকে। অথচ সিনিয়র মন্ত্রী-আমলারা জানতেই পারেন না কী হচ্ছে। অন্য কোনো মন্ত্রকের কোনো গোপন অভিযানের বিষয়, কিংবা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের নির্দেশ হতে পারে বলে বিষয়টি হজম করে নেন তারা।

কেমন করে আইবি অফিসাররা তাদের কাজকর্ম সারে, তার জলজ্যান্ত উদাহরণ কর্নেল পুরোহিত। যখন সে বোমা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করছে, ছক কষছে, তখন তার কয়েকজন সহকর্মীর সন্দেহ হওয়ায় এই নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। কাউন্টার মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অপারেশন—এই ভারী কথাটা বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল পুরোহিত (*দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*, পুনে, ২২ জানুয়ারি ২০০৯)। তাকে পাল্টা কোনো প্রশ্নই হয়নি। তাদের অভিযানকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এটা পুরোনো ছক। কখনও কখনও এই সব গোপন অভিযান এতটাই গোপনতম হয়ে পড়ে, যে তা প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও দেখতে পান না।

এভাবেই আইবি, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজমান একটা সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের চ্যালেঞ্জ করে, এরকম কেউ নেই। সিনিয়র নেতা, রাজ্য সরকার, আমলা, রাজ্য পুলিশ এমনকি বিচারবিভাগকেও বোঝানো হয়েছে, আইবি যা করে তা প্রধানমন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়েই। এবং যাই তারা করে থাকুক না কেনো, তা দেশের স্বার্থে, দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানার্থে।

এবং এই কারণেই আইবি-র বক্তব্যকে তারা ধ্রুব সত্য বলে মনে করে। কিন্তু এই ধারণা সবসময় তো ঠিক নাও হতে পারে। অনেক সময়েই আইবি প্রধানমন্ত্রীর দফতর বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে না জানিয়েও অনেক কাজ নিজে করে, বা অন্যকে করাতে বাধ্য করে। দেশের স্বার্থ-সুরক্ষা কোনোটা নিয়েই আইবি ভাবত না। তাদের একমাত্র চিন্তা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধি। মুম্বাই হামলার সময় এই দাবি আরও জোরালো হয়ে উঠেছিল। যেখানে শুধু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাজ হাসিলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্রেফ চেপে গিয়েছিল তারা। কখনও কখনও কোনো ঘটনায় সরকার ও তদন্তকারীদের ভুল রাস্তায় নিয়ে যায় আইবি, আর তার পরে তাদের বোকা বোকা জিনিসপত্রগুলো তাদের ঘাড়ে এমনভাবে চাপায়, যে তারা অন্য কিছু ভাবার অবস্থায় থাকে না। অনেক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এই সত্যিটা উঠে এসেছে, যেখানে আইবি-র কারিকুরিতে অজস্র নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করে জেলে ফেলে রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভুলভাল অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যেহেতু যোগাযোগটা খুব একটা ভালো নয়, সেই সুযোগটা নিয়ে আইবি বছরের পর বছর ধরে নানান গোপন অভিযান চালিয়েছে। বিস্ফোরণের আসল চক্রীদের বেকসুর খালাস করেছে, সেই সঙ্গে বাস্তব অবাস্তব অনেক সন্ত্রাসী সংগঠনকে আমদানি করে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানকে খাটো করে দেখার, এরকম লক্ষ্যটা সবার সামনে আনা হলেও, আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ছোট করা, তাদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উস্কানি দেওয়া। আর এভাবেই নাকি একদিন হিন্দু রাষ্ট্রের ছাতার তলায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

আইবি-র ওপর লাগাম টানা

এই পরিস্থিতি যদি পাল্টাতে হয়, যদি ফ্যাসিস্ট আর সাম্প্রদায়িক শক্তির কালো হাত থেকে এই দেশকে বাঁচাতে হয়, তাহলে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিশেষ ভূমিকা নিতেই হবে। বিভিন্ন মন্ত্রক রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগটা আরও শক্তপোক্ত করা ছাড়াও, আইবি তাদের যে বিষয়টা রোজ বারবার বোঝাতে চায়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক হতে হবে তাদের। স্বাদ ছাড়াই যে তেতো জিনিসগুলো তাদের গেলানো হয়, সেগুলো খাওয়া এবার থেকে বন্ধ করতে হবে। কোনো তথ্য স্বীকার করা বা তা নিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেবার আগে দেখতে হবে তার সত্যতা কতখানি রয়েছে। সেই তথ্য কি বিভিন্ন জায়গা থেকেই আসছে, নাকি কোনো একটা জায়গা থেকেই বারবার তথ্য দেওয়া হচ্ছে। আর যেখান থেকে বার বার

তথ্য আসছে, তারা কিছু লুকোচ্ছে কিনা সেই জিনিসটাও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। ফলে তাদের যোগাযোগের সব রকম জায়গাই খোলা রাখতে হবে। এবং তথ্য আসার একটা সমান্তরাল রাস্তাও তৈরি করতে হবে। সব শেষে প্রশাসন প্রতিদিন না হোক, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সংখ্যালঘু কমিশনের কাছ থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখুক। আইবি-র ওপর লাগাম টানার ক্ষেত্রে সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই পারে,

১. কোনো গোপন অভিযান, কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন যেনো প্রধানমন্ত্রীর দফতর কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদন ছাড়া না হয়। অনুমতি প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা দফতরেরও।
২. যদি ওই ধরনের অভিযানের কোনো রকম অনুমতির প্রয়োজন হয়, তাহলে তার অনুমোদন পেতে হলে বিষয়টা স্পষ্ট করা প্রয়োজন, কোনো অনিশ্চিত শর্ত, ধোঁয়াশা রাখা চলবে না। অভিযানটি ঠিক কীরকম তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রয়োজন। এর লক্ষ্য কী, এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মতলব আছে কিনা, অভিযান কেমন ভাবে হবে, কে কে এর পেছনে থাকবে, সেটা জানা-বোঝা দরকার। আর সব থেকে বড় কথা এই ধরনের অভিযান আদৌ জরুরি কিনা, সেটা পরিষ্কার করতে হবে।
৩. এই সব দেখে বুঝে যদি অভিযানের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রী ও সচিব, যে রাজ্যে অভিযান চলছে তার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিনিয়র আমলারা এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। যে আমলারা এই কাজ করবেন, তাদের এই কাজের জন্যই আলাদা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া জরুরি।
৪. পিএমও বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমতি ছাড়া রাজ্য সরকার বা পুলিশ প্রধানদের কাছে আইবি কোনো নির্দেশ বা সার্কুলার দিতে পারবে না।
৫. একটা বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো ফোনই নজরদারির আওতায় থাকতে পারবে না। টেলিকম মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট মোবাইল সংস্থাকেও এই বিষয়ে কোনো শর্ত ছাড়াই জানাতে হবে।
৬. সন্ত্রাসবাদীদের পরিকল্পনা বা কাজকর্ম, সংবেদনশীল তথ্য কোনো কিছু নিয়েই আইবি-র মিডিয়ার কাছে মুখ খোলার অধিকার থাকা চলবে না। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকলে বা হাতে এলে, সেই মতো দ্রুততার সঙ্গে, গোপনীয়তার সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. যদি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কোনো সংবেদনশীল তথ্য ক্রমাগত প্রকাশ বা দেখানো হতে থাকে, তাহলে সেই ঘটনার যথাযথ তদন্ত করতে হবে, কে দোষী তা খুঁজে বের করতে হবে, আইবি-র কেউ দোষী প্রমাণিত হলে সেই মুহূর্তে তাকে সংস্থা থেকে বদলি করে দিতে হবে।

৮. যখন প্রয়োজন হবে, আইবি-র কয়েকজন বিশেষ সিনিয়র অফিসাররাই মিডিয়ার সামনে মুখ খুলতে পারবেন। এবং জনগণের যতটুকু জানা দরকার, ঠিক ততটুকুই তারা বলতে পারবেন। আইবি-র তরফে যদি কোনো ভাবে কোনো গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়ে তা খবরের কাগজ বা টিভিতে দেখানো শুরু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আইবি-র তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে হবে। আইবি-র খবর নয় বলে চালাতে হবে।

৯. যদি আইবি-র নাম করে কোনো সংবাদপত্র বা টিভি ভুল খবর দিতে থাকে, তাহলে বিষয়টি প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তুলতে হবে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে শাস্তি বা অবমাননার অভিযোগ আনা দরকার।

১০. নিজের সীমা অতিক্রম করা আইবি-কে বন্ধ করতে হবে। বোমা বিস্ফোরণ মামলাগুলোতে অযথা নাক গলানো বন্ধ করাতে হবে। ৩, ৪, ৫ এবং ৬ নং অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছিলাম, যখনই ব্রাহ্মণ্যবাদী কারোর দিকে অভিযোগের আঙুল উঠতে শুরু করেছিল, কীভাবে আইবি সামনে এসে সব ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে, কীভাবে তারা তদন্তকে ভুল পথে নিয়ে গেছে, তাদের মনগড়া গল্পকে কীভাবে সাধারণের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে, যাতে মিডিয়া হাইপের কাছে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে স্থানীয় পুলিশ ও আদালতও। কীভাবে শয়ে শয়ে মুসলিম যুবককে নির্বিচারে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে, কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সরাসরি ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও মামলাগুলো থেকে তাদের আড়াল করা হয়েছে সে সব আমি দেখিয়েছি। ফলে এটা নিশ্চিত করা খুব জরুরি, যে কোনো তদন্তেই প্রয়োজন না হলে আইবি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। আর যদি করেও, তাহলে যেনো ভালো এবং সত্যি কিছু সাহায্য তারা করতে পারে।

১১. সংসদে জঙ্গি হামলা বা আরএসএস-এর নাগপুরের সদর দফতরে হামলার মতো কিছু তথাকথিত সন্ত্রাসী হামলায় যেখানে সব জঙ্গিরাই মারা গিয়েছিল, সেই সব ঘটনা আইবি-রই চক্রান্ত বলে সন্দেহ। সুপ্রিম

কোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি দিয়ে সেই সব ঘটনার তদন্ত চালানো প্রয়োজন। এই কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে আনার দরকার নেই। কিন্তু সরকারের অন্তত জানা উচিৎ আসল ঘটনা কী। এটা সরকারের বোঝা উচিৎ, আইবি, র, আধা সামরিক বাহিনী এবং পুলিশের লাগামহীন কাজকর্মের ওপর আরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকাটা জরুরি। এই ধরনের তদন্ত যদি করা হয়, তাহলে এই সব সংস্থা কিন্তু বেশ আপত্তিই জানাবে। অজুহাত দেবে, এটা হলে কর্মীদের মনোবল নষ্ট হবে। কিন্তু মানবাধিকার আর স্বচ্ছতার দোহাই দিয়ে সরকারের পিছু হঠ উচিত নয়।

১২. গত ৫০ বছর ধরে সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আইবি যে সব ফুটনোট দিয়েছিল, সরকারের উচিত স্বাধীন কোনো সংস্থার মাধ্যমে সেই সব খতিয়ে দেখা। আইবি কোনো রকম ভাবে সাম্প্রদায়িক অথবা জাতি বৈষম্য করত কিনা তাতে বোঝা যেত।

১৩. আইবি-তে যে সব আইপিএস অফিসারকে ডেপুটেশনে পাঠানো হচ্ছে, সরকারকে তাদের পরিচয় জেনে রাখতে হবে। বিশেষ করে যারা ১০ বছরের বেশি সময় ধরে একই জায়গায় পড়ে আছে, তাদের তো বটেই। দেখা দরকার, তাদের সঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর কোনো রকম সম্পর্ক আছে কী নেই ফলে আইবি যদি কোনো অফিসারকে নিয়োগে সওয়াল করে, তাহলে সেটা মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, যদি নিতেও হয় তাহলে ভালো করে যাচাই করা জরুরি। এছাড়াও আইবি-তে বিভিন্ন ধর্ম, জাত, এলাকা ও সম্প্রদায়ের সম পরিমাণে লোক ভাগ করে রাখা উচিৎ।

১৪. আইবি-র স্থায়ী সদস্যের ক্ষেত্রে বলা যায়, সরকারের উচিত আইবি নতুন দফতর করে ঢেলে সাজানো। সংগঠনটিতে সাম্প্রদায়িক বিষ সাফাই করার সময় এসেছে। এরাই দীর্ঘদিন ধরে আইবি-র বিভিন্ন পদ আঁকড়ে রেখেছে।

১৫. সবশেষে আইবি-র প্রাক্তন অফিসারদের মধ্যে যাদের কাজের ক্ষেত্রে সুনাম ছিল, তাদের আলাদা ভাবে নজরে রাখা উচিত। কারণ তাদের মধ্যেই হয়তো বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দাসত্ব করত।

সরকারের ওপর আইবির ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অসত্য নীতির অনধিকার প্রবেশকে দূরে ঠেলা।

জাতির জনককে যারা খুন করেছে, তারা এখন তার নীতি, সত্যকে খুন করার চেষ্টায় আছে। আইবি-তে তাদের তোষামোদকারী দিয়ে সরকারকে অসত্যের পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সন্ত্রাসবাদ ও জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তো বটেই। পাকিস্তানের কাগুজে বাঘকে দেখিয়ে এই সব কীর্তি চালাচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। এটা অবশ্য ঠিক যে জন্মের পর থেকেই কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করেছে পাকিস্তান। ফলে পাকিস্তানকে চাপে ফেলবে এমন যে কোনো কাজ, যে কোনো সরকারি সংস্থা বিশেষ করে গোয়েন্দারা যদি করে থাকে, তাহলে তা এদেশে সাদরে স্বাগত। কিন্তু দিন শেষে সত্যিটা সেখানে আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে, সেখানে আমরা কেনো অসত্যের পেছনে ছুটে মরব?

প্রথমত, ভারতের কাছে কোনো বিষয়েই পাকিস্তান ধারে কাছেও নেই। রাজনৈতিক স্থিরতা, সামরিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক বিচার বা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই এটা প্রয়োজ্য। দ্বিতীয় এবং সবথেকে গুরত্বপূর্ণ হলো, ধর্মনিরেপক্ষতার বিচারে ভারতের ইতিহাস যথেষ্ট ভালো, সেই কারণেই রাজনীতি থেকে ক্রিকেট থেকে হকি বা অন্য আরও খেলা, 'ান, বিজ্ঞান থেকে পরমাণু বিজ্ঞান কিংবা সিনেমা সবক্ষেত্রেই অজস্র মুসলিম ধর্মাবলম্বী কৃতিরা এদেশে রয়েছেন। ভারত যে কোনো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প'াকিস্তানের ষড়যন্ত্রকে থামিয়ে দিতেই পারে, যাতে পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে অন্তত আর কিছু বলার সাহস পাবে না। কিন্তু এই সব করে যতটা কূটনৈতিক সুবিধা আদায় করা যায়, তার থেকে বেশি এসব ভাঙছে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্থাগুলোর কাজে ও কথায়। যারা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে নষ্ট করে, দাঙ্গা বাঁধিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে দুর্বল করে, আন্তর্জাতিক মহলের কাছে ভারতকে ছোট করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির দিকেই বেশি নজর দেয়। সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণে প্রমাণিত, তারা এই সব কাজ করে হিন্দু রাষ্ট্রের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ফলাতে। এই বিষয়টাই মাথায় রেখে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আইবি-র সাহায্য নিয়ে সরকারকে মিথ্যের রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করে। পাকিস্তানের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপানোর ফিকির খোঁজে। কিন্তু আসলে তাদের লক্ষ্য, ভারতীয় মুসলিমদের মনোবল ভাঙা। আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সরকারকে নীচু দেখানোর চেষ্টা করে তারা। সংসদে হামলা-থেকে অক্ষরধামে হামলা, মুম্বাই লোকাল ট্রেন থেকে সমঝোতা বিস্ফোরণ ঠিক এই লক্ষ্যেই। এইসব ঘটনায় আইবি-র কাছ থেকে সব শুনে পাকিস্তানের ওপর দোষ চাপিয়েছিল ভারত, কিন্তু পরে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয় সরকার। আসল বিষয়টা হলো, আমরা এভাবে যদি অসত্যের

পথে চলতে থাকি, যতই কূটনৈতিক ভাবে ফন্দিফিকির করা হোক না কেনো আন্তর্জাতিক মহলের ধারণা পাল্টাবে না। আর বিদেশনীতি, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে সরকারকে অসত্যের নীতি পাল্টাতে হবে, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তোষামুদে আইবি-র খাওয়ানো গল্প হঠিয়ে অসত্যের রাস্তা থেকে সরকারকে সরতে হবে। যে পথ আমরা ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছি, সেই সত্যের পথে ফেরাটা জরুরি।

২. বিচারবিভাগে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা

অভ্যন্তরীণ স্ব সংশোধনীর প্রয়োজন এসেছে

ভারতের বিচারবিভাগ অলঙ্ঘনীয় সংস্থা। তাদের পবিত্রতা রাখার জন্য, নিজে থেকেই যাতে শুদ্ধিকরণ চালানো যায় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। এই বিষয়টা যদি না হয়, তাহলে বিচারবিভাগের ওপর থেকে সাধারণ মানুষের অগাধ বিশ্বাস উঠে যাবে! গত কয়েকবছরে কিছু বিস্ফোরণ মামলা চলাকালীন কিন্তু এই বিষয়টা দেখা গেছে। নিম্ন আদালতের আচরণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন, যে তাতে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বড় আঘাত লেগেছে। বিচার ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাসেই তা ধাক্কা দিয়েছে। কিছু কিছু মামলায় তো তদন্তকারী দল, জামাকাপড়ের মতো তদন্তের তত্ত্বই পাল্টাতে থেকেছে। প্রত্যেকবারই তারা নতুন নতুন মানুষদের গ্রেফতার করে এবং নিম্ন আদালতও অদ্ভুতভাবে প্রমাণ যাচাই না করেই তাদের পুলিশের হেফাজতে পাঠিয়ে দেয়। নিম্নলিখিত অংশ থেকে বোঝা যাবে, এক একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বিচারবিভাগ এক একরকম শর্ত আরোপ করে।

মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণকাণ্ড, ২০০৬ মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ড, মক্কা মসজিদ (হায়দরাবাদ) বিস্ফোরণকাণ্ড, আজমির শরীফ দরগা বিস্ফোরণকাণ্ড, আহমেদাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ডর মতো বিভিন্ন মামলায় শুধুমাত্র সন্দেহের বশে শয়ে শয়ে মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে, আদালত অনায়াসে তাদের পুলিশ হেফাজতও দিয়ে দিয়েছে, যার ফলে বছরের পর বছর জেলে পচতে হয়েছে তাদের। অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদী অভিযুক্তদের মধ্যে যাদের হাতেনাতে ধরা হয়েছে অথবা যাদের বিরুদ্ধে ঠিকঠাক প্রমাণ মিলেছে, যারা সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, যেরকম হয়েছিল ২০০৬ নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ড এবং ২০০৮ মালেগাঁও বিস্ফোরণকাণ্ডের ক্ষেত্রে, সেই ব্রাহ্মণ্যবাদী অভিযুক্তরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরা পড়ার পর পরই তাদের চটজলদি জামিন হয়ে যায়। কাউকে তো আগাম জামিন দেওয়া হয়েছে, আবার কাউকে গ্রেফতারই করা হয়নি। যখন

মানবাধিকার সংগঠন, ধর্মনিরেপক্ষ এবং মুসলিম সংগঠনগুলো নিম্ন আদালতের এই বৈষম্য নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, তখন উচ্চ আদালতেরই উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে খতিয়ে দেখা। কিন্তু সেটা তো হয় না।

এছাড়াও গত ১০ থেকে ১৫ বছরে কিছু কিছু ফৌজদারি ও দেওয়ানি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় ইস্যুতে উচ্চতর আদালতের রায়, সাধারণ মানুষকে উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে।

এটা তো অস্বীকার করে লাভ নেই যে বিচারপতি, বিচারকরাও মানুষ। তারা কেউ কেউ কখনও কখনও মিডিয়া প্রচারে প্রভাবিত হয়ে থাকেন, কেউ কেউ যে যাঁর নিজের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় আদর্শেও প্রভাবিত হন। তবে বিচারকরা যখন রায় দিচ্ছেন, তখন তার মধ্যে এসবের প্রভাব থাকাটা ঠিক নয়। এই বিষয়টা মাথায় রেখে, একটা অন্তরীণ বিচারবিভাগীয় কমিটি তৈরি করা প্রয়োজন। হয় বিচারবিভাগ হাউস কোনো কমিটি গঠন করুক, নয়তো আলাদা একটা কমিটি তৈরি হোক যেখানে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা থাকবেন, থাকবেন আইনজ্ঞরা। তারা নজরদার হিসেবে কাজ করবেন। ওই ধরনের বিচার বা রায়, যার ওপর কোনো ভাবে রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, জাতি বা ধর্মগত অথবা কোনো দুর্নীতির প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে, তার ওপর কমিটি কড়া নজর রাখবে, কড়া ভাবে তা খতিয়ে দেখবে। যদি কেউ রায়ের ওপর জনগণের বিরোধিতা চরমে ওঠে, সেই রায় সংক্রান্ত বিষয়টিও খতিয়ে দেখা উচিত। আসল লক্ষ্য হলো, বিচারবিভাগকে বাইরের শক্তির হাত থেকে রক্ষা করা কারণ বিচারবিভাগই হলো সংবিধান, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার শেষ আশা-ভরসার জায়গা।

৩. সামাজিক পদক্ষেপ

এই ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন আনতে কিন্তু শুধুমাত্র সরকারি ও বিচারবিভাগীয় পদক্ষেপই যথেষ্ট নয়। আরও অনেক বিষয় আছে যা ওভাবে সরাসরি ঠিক বিচারবিভাগ বা প্রশাসনের আওতায় আসে না। যেমন কিছু সামাজিক পদক্ষেপ। যেমন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সংস্কার, ভাবনার পরিবর্তন, ধারণা এই সব।

সংবাদমাধ্যমের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে সংবাদমাধ্যম বা মিডিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। এর মাধ্যমেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রথাকে তারা এগিয়ে নিয়ে যায়, মানুষের মধ্যে ছড়ায়ও বটে। মিডিয়াকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাত থেকে সরালে সামাজিক পরিবর্তনের আশা করাটা বৃথা! এই ক্ষেত্রে অন্তত সরকার বা বিচারবিভাগ খুব একটা কিছু করতে

পারবে না। ওষুধ আছে সমাজ সংস্কারকদের হাতে। ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর হাতে।

যদিও সংবাদপত্র ও টিভি প্রায় পুরোপুরিই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণে। বেশিরভাগ মালিক বা ডিরেক্টর কিন্তু সেই অর্থে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক নয়। বরং অনেকেই উদারমনস্ক, ধর্মনিরপেক্ষ, কেউ কেউ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের কিংবা সংস্থার। কিন্তু যেহেতু তারা নিজেদেরই রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনা-চিন্তা তাদের খবরের কাগজ বা টিভিতে প্রচার করতে চান, এবং অনেকটা ব্যবসার খাতিরেও বটে, সেই কারণে বেশিরভাগ সময়েই তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চালাকির খেলাটা বুঝতে পারেন না। তারা বুঝতেই পারেন না কীভাবে খবরের প্রতিবেদনগুলোকে নির্বাচন করা হবে, দেখানো বা প্রকাশ করা হবে, কিছু তথ্যে মোচড় দিয়ে কীভাবে আসল ঘটনা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা অজান্তেই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আদর্শকে তুলে ধরতে থাকে, ব্রাহ্মণদের মহান বানিয়ে দেন, ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন কিংবা ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজনৈতিক দলকে সাহায্য করে ফেলেন। একইসঙ্গে অন্যান্য জাতিকে ছোট করা হয়, মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের খারাপ ভাবে তুলে ধরা হয়, সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পরিবেশ বিষাক্ত করে তোলা হয়। লক্ষ্যটা একটাই দাঁড়িয়ে যায়, সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আধিপত্য। যদি তাদের খবরের কাগজে বা টিভিতে দেখানো খবরগুলোতে একটু নজরদারি চালিয়ে কোথায় কোথায় ভুলভ্রান্তি হচ্ছে তা নিয়মিত তুলে ধরার একটা ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সংবাদমাধ্যমের কর্ণধাররা সতর্ক হতে পারেন, দরকার মতো। খবরের রঙ পাল্টাতে পারেন, আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সংবাদমাধ্যমের ওপর খবরদারি চালানো ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এটা বুঝে যাবে, তাদের মাথার ওপরেও কেউ নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

এখানেই সংস্কারপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের যা লোকবল আছে, তা দিয়ে তারা আঞ্চলিক কিছু কমিটি গঠন করতে পারে। তাদের রাজ্যে বা এলাকায় যে সব খবরের কাগজের প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে, তাতে তারা নজরদারি চালাতে পারে। কোথায় কোথায় বিষয়টা সাম্প্রদায়িক জায়গায় চলে যাচ্ছে বা গেছে, তা তারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নজরে আনতে পারে। এই কমিটিই টিভির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নজর রেখে বলতে পারে, ঠিক কোন জায়গায় কোন খবর সাম্প্রদায়িক বনে যাচ্ছে, জাতি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে কিংবা সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করার সম্ভাবনা তৈরি করছে। একইভাবে সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলো যে যে কাজকর্ম, সভা বা মিটিং-মিছিল করে, সেই সম্পর্কে তারা সরাসরি সংবাদমাধ্যমে খবর দিতে পারে, কারণ এই ধরনের বিষয়গুলো খবরের পাতায় যাতে না আসে সেই চেষ্টা হয়। সংস্থার কর্ণধাররা

প্রতি মাসে তাদের ভাবনা চিন্তা, পর্যবেক্ষণ সংবাদমাধ্যমের অফিসে পৌঁছে দিতে পারে।

যদি সংবাদ সংস্থার এডিটররা কিংবা কর্ণধাররা ওই পর্যবেক্ষণগুলোতে ঠিকমতো নজর দিতে শুরু করে, তাহলে তার ফল বেশ ভালো হতে পারে। অন্যান্য জাতির বা সম্প্রদায়ের সাংবাদিকরা নিজেদের কথা বলার একটু জায়গা ফিরে পাবেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে থাকা সংবাদমাধ্যমে সেই সুযোগ নেই, কারণ ওই ধরনের সাংবাদিকরা সংখ্যায় কম। তারা যদি রাজনৈতিক, সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার সুযোগ পান, তাহলে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যবাদের খপ্পর থেকে মিডিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। কিন্তু এর জন্য সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলোর অধ্যবসায় থাকাটা জরুরি।

এটা ছাড়াও সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলো তাদের এলাকার বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, সমাজ কর্মীদের একাট্টা করতে পারেন। হতে পারে তারা হয়তো জনসংখ্যার ১ শতাংশ। ব্রাহ্মণ্যবাদীর কর্তৃত্বাধীন সংবাদমাধ্যম যে যে খবরগুলো ইচ্ছাকৃত ভাবে চেপে রাখে, তাদের হাত দিয়ে সেই সব খবর যে কোনো ভাবে, ব্লগে হোক, এসএমএস-এ হোক, ইমেল বা চিঠিপত্রে হোক, সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এভাবে একদিন ব্রাহ্মণ্যবাদে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদমাধ্যমগুলোর মুখোশ খুলে পড়তে বাধ্য। তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে আসবে। তাদের দেখা বা পড়ার বিষয়টিও কমবে।

সামাজিক-সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলোর ভূমিকা

সংবাদমাধ্যমের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ছাড়াও, সামাজিক সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলোর নেতাদের আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

সাধারণ হিন্দুদের বোঝাতে হবে, হিন্দু-মুসলিম বিবাদ শুধু মুসলিমদের বিষয় নয়

বছরের পর বছর ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটাই অস্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বাধীন সমাজ বদলের জন্য হিন্দু সংস্কারপন্থী আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়া। সন্ত্রাসবাদের ছায়ায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া। যেখানে সাধারণ হিন্দু-মুসলিমরা লাঠালাঠি করে মরবে, আর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সমাজের ওপর তাদের খবরদারি দেখিয়ে যাবে। একটা বিষয় লক্ষ করা গেছে, যেখানেই সংস্কারপন্থী আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করেছে, সেখানেই সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলোকে উস্কানি দেওয়া হয়েছে, যা জোর ধাক্কা দিয়েছে আন্দোলনকে। বহুজন (সাধারণ হিন্দু) যুবকরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পেছনে ছোটে আর শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের মতো নিজেরাও ফাঁদে পড়ে যায়। ফলে সাধারণ হিন্দুকে এটা বুঝতেই হবে, কোনো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা

শুধুমাত্র মুসলিমদের একার সমস্যা নয়। এটা সামাল দেওয়ার জন্য শুধু মুসলিমদেরই এগিয়ে দিয়ে লাভ নেই। এই বিষয়টাতে সংস্কারপন্থী নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। তারা সাধারণ হিন্দু যুবকদের বোঝাতে পারেন, যে এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটানো হয়। যাতে সাধারণ হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পায়ের তলায় থাকে এবং মুসলিমদের যখন তখন দাবিয়ে রাখা যায়।

তবে এটা করার থেকে বলা অনেক সহজ। সংস্কারপন্থী নেতারা নিজেরা এই বিষয়টা জানেন, তারা নিজেদের ঘরোয়া মিটিং, মিছিলে এই সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে থাকেন, কিন্তু জনসভায় জনসমক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খপ্পরে না পড়া নিয়ে সাধারণ হিন্দুদের সতর্ক করার ক্ষেত্রে অনেকটাই তারা সতর্ক হয়ে যান, সমঝে কথা বলেন। তারা হয়তো ভাবেন যে সাধারণ কোনো একজন হিন্দুর মধ্যে যেভাবে বছরের পর বছর ধরে মুসলিম বিদ্বেষের বিষ ঢালা হয়েছে, তা এত সহজে যাওয়া নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বাধানো সাম্প্রদায়িক লক্ষ্য যে মুসলিম নয়, সাধারণ হিন্দু, তা হজম করা বোধহয় এত সহজ হবে না। তাদের আশঙ্কা নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়া নয়, কিন্ত তার মানে এই নয় যে তারা নির্লিপ্ত হয়ে সব কিছু দেখতে থাকবে। আগের মতো ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তরুণদের ঘাড়ে চেপে কুকীর্তি করবে আর তারা দর্শক বনে থাকবে, সেটা পারে না। ধীরে ধীরে তরুণদের বোঝাতে হবে, তাদেরকে মধ্যযুগীয় সঠিক ইতিহাস পড়াতে হবে। ওই সময়কর ইতিহাসটাই হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বিকৃত করেছে। গত ৫০ বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনাগুলো বোঝাতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। তথ্য দিয়ে ঠিকঠাক উদাহরণ সামনে আনতে হবে। কীভাবে সাধারণ হিন্দু ও মুসলিম এতে পুড়েছে, কী করে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এর থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও পরিষেবা ক্ষেত্রে ফায়দা তুলেছে আস্তে আস্তে তা বোঝাতে হবে। দাঙ্গা বাধানোর ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই অপচেষ্টার বিষয়টি সাধারণ হিন্দুরা যতক্ষণ না বুঝতে পারবে, যতক্ষণ না বুঝতে পারবেন, পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বাধীন সমাজের রদবদল অসম্ভব।

কুসংস্কার থেকে সাধারণ হিন্দুদের মুক্ত করতে হবে

সাধারণ হিন্দুদের ধর্মীয় গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে বের করে আনাটা সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ এই বিষয়টাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দশকের পর দশক ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সাধারণ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। এক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে, তারা যদি আচমকা এই সব নিয়ে ভয়ানক ভাবে সমালোচনা শুরু করে দেয় তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত

হবে। এখানেও ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আধুনিকতার আলোকে ধর্মীয় শাস্ত্রের পাঠ দিতে হবে তাদের। বিভিন্ন ধর্মীয় রীতিনীতির গুরুত্ব বোঝাতে হবে বিজ্ঞানের আলোয়, বোঝাতে হবে কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব বিষয় দিয়ে তাদের ব্যবহার করে আসছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ব্রাহ্মণদের একই সারিতে রাখা চলবে না

কোনো কোনো সংস্কারপন্থী নেতা ব্রাহ্মণ্যবাদী আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোনো ফারাক করতে রাজি হন না, তাদেরকে একই সারিতে ফেলে দেন। কেউ কেউ জাতিগত ভাবে ব্রাহ্মণদের নিয়ে এতটাই বিদ্বেষী হয়ে পড়েন, যে ব্রাহ্মণদের ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখতে চান না, এমনকি কথাও বলার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু তাদেরকে একটা ব্যাপার বুঝতে হবে, বেশিরভাগ ব্রাহ্মণই কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মতো এই ধরনের জাতিবিদ্বেষ বা দাদাগিরি সুলভ মানসিকতার না। বরং ওই ধরনের মানসিকতা থেকে তারা যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে। আমি যখন কর্মরত ছিলাম, অনেক ব্রাহ্মণ আমার সহকর্মী ছিলেন। কয়েকজন ছাড়া তাদের কারও মধ্যে ওই ব্রাহ্মণসুলভ আচরণ ছিল না। বর্তমানে আমি বহু ব্রাহ্মণ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কাজ করি। আমি যে বিল্ডিংটায় থাকি, তার ৫০ শতাংশ শুধু ব্রাহ্মণ। আমার অনেক ব্রাহ্মণ বন্ধু রয়েছে, এমনকি আমার জামাইও একজন ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমি তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের কণামাত্র দেখিনি। আর তারা যদি কোনো ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খোলাখুলি সমালোচনা নাই করে থাকে, তবে সেটা জাতপাত বা বর্ণবিদ্বেষের কোনো জায়গা থেকে নয়, নেহাতই সামাজিক সমালোচনার ভয় থেকে। এই পরিস্থিতিতে, আমরা যদি তাদেরকেও সঙ্গে না নিতে পারি, তাহলে উলটো পরিস্থিতি তৈরি হবে, এবং তারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খপ্পরে পড়তে শুরু করবে। আর এর ফলে সংস্কারপন্থী আন্দোলনের যে মূল নীতি, জন্মগত ভাবে কারোর জাত থাকে না, তাকে আঘাত করবে। সংস্কারপন্থী নেতাদের এটা বুঝাতে হবে। সাধারণ হিন্দু মানে যে সাধারণ ব্রাহ্মণরাও তার মধ্যে পড়েন, সেটা বুঝতে হবে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজকে পাল্টাতে তাদেরকেও তাই সঙ্গে নেওয়াটা খুব জরুরি।

৪. ধর্মনিরপেক্ষ এবং বুদ্ধিজীবীরা

ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি যে মিডিয়াতে হইচই ফেলে বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তাতে প্রভাবিত না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও বুদ্ধিজীবীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন।

সংবাদমাধ্যমের খবরে প্রভাবিত না হওয়া

এ দেশে এরকম অনেক সংগঠন ও ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে নিজেদের উৎসর্গ করতে তৈরি। যখনই কোথাও ধর্ম-জাত পাতের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের ওপর বৈষম্য বা অবিচারের খবর আসে, তখনই তারা এই নিয়ে সুর চড়ান। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে, এমনকি উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হন তারা। তাদের দায়বদ্ধতা, সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো জায়গাই নেই। কিন্তু তারাও মুসলিম 'সন্ত্রাস' নিয়ে কোথাও গিয়ে সংবাদমাধ্যমের হইচইতে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আইবি-র ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চাপে স্থানীয় পুলিশ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত, বিস্ফোরণের ভুলভাল মনগড়া গল্প শুনে মুসলমানদের সম্পর্কে তৈরি খারাপ ধারণা তৈরি করে ফেলেন। তারা ভাবেন ভারতীয় মুসলিমদের একাংশ হয়তো জিহাদি গোষ্ঠীদের সমর্থন করেন। বিশেষ করে ২৬/১১ মুম্বাই হামলার পর তারা এতটাই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তাদের সংবেদনশীলতায় এতটাই আঘাত লেগেছিল যে, তারা এই হামলাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে খুঁটিয়ে দেখা, এবং তার সন্দেহজনক তদন্তের বিষয়টি নিয়ে ভাবা ছেড়েই দিয়েছেন। এখন তারা অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তাই শ্রেয় বলে মনে করেন। কেউ কেউ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হইচই আর আইবি-র মুসলিম বিরোধী আচরণে এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন যে, তারাও দাবি করেছেন, মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে এই সন্ত্রাসবাদের প্রতিবাদের আওয়াজ উঠুক। যাঁরা ওপথে গেছে, তারা যেন আবার মূলস্রোতে ফিরে আসে। ধর্মনিরপেক্ষদের এই ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন বেশ বিপজ্জনক ও উদ্বেগজনক। যা চলছে তাতে আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাজকর্মকেই ইন্ধন যোগাবে। যার জেরে আবার কিছু মিথ্যে জনসমক্ষে আনা হবে। অসত্য তত্ত্ব গেলানো হবে সবাইকে।

ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর সমান্তরাল তদন্ত

সংবাদমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আইবি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ভুয়া প্রচারে গা না ভাসিয়ে, বুদ্ধিজীবী ও ধর্মনিরপেক্ষরা প্রতিটা মামলা নিজেরাই নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে দেখতে পারে। তদন্ত এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, সেসবের একটা যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। তারা বিস্ফোরণস্থলে যেতে পারেন, প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে নিয়ে খোঁজখবর চালাতে পারেন। ঘটনার পর পর সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। তারপর পুলিশের বক্তব্য সামনে আসার পর যে প্রতিবেদনগুলো প্রকাশ হতে শুরু করবে,

তার সঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারেন। পুলিশের বক্তব্যের সঙ্গে নিজের যুক্তিকে মিলিয়ে দেখবেন। নিজেরা যা বুঝেছেন, সেটা তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে সকলকে জানাতে পারেন। এটা ঠিক, ব্রাহ্মণ্যবাদী সংবাদমাধ্যমগুলো কখনই ঠিকঠাক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে না, বা দেখাবে না। দেখালেও 'যদি', 'কিন্তু'-র মতো কিছু ব্যাপার রেখে দেবে। কারণ তাদের আগের প্রতিবেদনগুলোর সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই তো? কিন্তু সেই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনগুলোর বোঝা শোনায় প্রভাব ফেলবে না। কারণ তারা নিজেরা ঘটনাস্থল থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

এই ধরনের কাজ তারা আগে করেননি তা নয়, অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন, কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই রিপোর্ট তৈরি করে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু প্রশাসন ও তদন্তকারী সংস্থার ওপর সেই সবের কোনো প্রভাব সেরকমভাবে ছিল না। কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হবে না, আসলে হয় রিপোর্ট তৈরিতে যতটা অধ্যবসায়ের দরকার ছিল, সেটা ছিল না। নয়তো রিপোর্টগুলো কোনো যুক্তিগ্রাহ্য জায়গায় পৌঁছতে পারেনি। যদি রিপোর্ট নিয়ে হইচই ফেলে দিতেই হয়, তাহলে এভাবে পর পর অনেকগুলো মামলাকে খুঁটিয়ে দেখে রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে। ঠিকঠাক প্রমাণ জোগাড় করে জনসমক্ষে আনতে হবে। এরকম চলতে থাকলে তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে তা চিন্তায় ফেলতে বাধ্য। ফলে আইবি-তে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চাপে তাহলে আর মিথ্যে তথ্যপ্রমাণ সাজিয়ে নির্দোষীদের গ্রেফতার করতে পারবে না তদন্তকারী সংস্থাগুলো। একইসঙ্গে নিরপেক্ষ রিপোর্টগুলো প্রকাশ হবে, সাধারণ মানুষও অন্যভাবে ভাবতে শিখবে, আর ব্রাহ্মণ্যবাদী ও আইবি যেভাবে মানুষকে বোকা বানায়, সেই বিষয়টি ধাক্কা খাবে।

আগ্রাসী ধর্মনিরপেক্ষতা

সবথেকে বড় কথা হলো দেশের ধর্মনিরপেক্ষ, হিন্দু সংস্কারপন্থী ও বুদ্ধিজীবীদের আরও একরোখা আর আগ্রাসী হয়ে ওঠাটা জরুরি। যদি তারা চায় সরকার ও কর্তৃপক্ষ তাদের দেখানো পথেই চলবে, তাহলে এটা করা দরকার। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে সঙ্ঘ পরিবার আর তার সঙ্গোপাঙ্গরা অনেক বেশি আগ্রাসী। তা সে তাদের কাজকর্ম ঠিক হোক বা ভুল, আইনি হোক বা বেআইনি। ফলে কখনও কখনও আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হলেও, সরকার ও পুলিশ তাদের কাছে মাথা নীচু করতে বাধ্য হয়। এই জায়গায় ধর্মনিরপেক্ষ আর বুদ্ধিজীবীরা তাদের তুলনায় অনেক বেশি সুর নরম করে ফেলে। সরাসরি কথা বলতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই কর্তৃপক্ষ তাদের খুব একটা পাত্তাও দেয় না।

ধর্মনিরপেক্ষ ও সংস্কারপন্থীরা যদি আগ্রাসী হয়ে ওঠে, তাহলে কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ হতে পারে। এই রকমই ভাবনাচিন্তা কর্ণাটকের সংস্কারপন্থী সংগঠন কর্ণাটকা কমু সৌহার্দা ভেদিকা (কর্ণাটক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংগঠন) নামে সংগঠনটির। বাবা বুদানগিরির দরগা বিতর্কে বেশ আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়েছিল তারা। ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই ইস্যুতে সঙ্ঘের লেজে তারা পা দিয়েছিল। দরগায় দত্ত জয়ন্তী পালনের অনুমতি দেওয়ার জন্য সরকারকে প্রভাবিত করতে ১৯৯৯ সাল থেকে প্রচুর মিটিং মিছিল করে আসছিল সঙ্ঘ পরিবার, তার পাল্টা হিসেবে ভেদিকা জনগণকে একাট্টা করেছিল। মুসলিমদের পাশে রেখে, তারা হিন্দুদের বুঝিয়েছিল এটা কোনো মুসলমানদের বিষয় নয়। বরং অশান্তি তৈরি করতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটা চাল মাত্র। যাতে তারা সাধারণ মানুষকে এই সব ঝামেলায় ব্যস্ত রেখে, নিজেরা রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে পারে। ভেদিকে তাই পাল্টা মিটিং মিছিল শুরু করে দিল।

শুরুর দিকে সেরকমভাবে মানুষ সাড়া দেয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা যখন বুঝতে পারল, যে এই ইস্যুটি বিজেপি আর সঙ্ঘ পরিবারের অশান্তি বাধানোর ছুতো, তখন থেকে ভেদিকার ভিড় বাড়তে লাগল। ২০০৩ সালে কমপক্ষে ২০ হাজার মানুষ ভেদিকার মিছিলে পা মিলিয়েছিল। অন্যদিকে আরএসএস-এর শোভাযাত্রা ঠেকেছিল কয়েকশো জনে। ফলে বিজেপির নেতৃত্বে থাকা জোট সরকারকে আদালতের নির্দেশই মানতে হয়েছিল। ওই জায়গায় স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সঙ্ঘ পরিবারের অন্যায় ধর্মাচারণ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। এর থেকে আমরা শিক্ষা নিতেই পারি যে, যতক্ষণ না আমরা আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ ও সরকার কোনো ব্যবস্থা নেবে না। যদি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আসল কারচুপি ও সাম্প্রদায়িক উস্কানির পর্দা ফাঁস করতে হয়, তাহলে ভেদিকার ঘটনা গোটা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও সংস্কারপন্থী সংগঠনগুলোর কাছে একটা ভালো উদাহরণ।

সাম্প্রদায়িক বিষয়ে মুসলিম শব্দটি যেমন ব্যবহার করা চলবে না, তেমনি হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। বলতে হবে ব্রাহ্মণ্যবাদী।

এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে উনিশ শতকের শেষের দশক থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত যত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তা সব ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মস্তিষ্কপ্রসূত। তাদের এই ঘৃণার প্রচারের বলি হয়েছে সাধারণ হিন্দুরাই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পর্দার আড়ালেই থেকে গেছে। আড়াল থেকেই তারা কলকাঠি নেড়েছে, আর সামনে দাঁড় করানো হয়েছে সাধারণ ও গরীব হিন্দুদের। ফলে যেটা হয়েছে, সেটা হলো প্রত্যেকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর

পরই ধর্মনিরপেক্ষ, বুদ্ধিজীবী এবং মুসলিম নেতারা, হিন্দু, হিন্দুত্ব, হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, হিন্দু বড়, হিন্দু বোমা-র মতো কিছু শব্দের অপপ্রয়োগ করেছে। মনে করা হয়েছে এরাই মুসলিমদের বিরোধী শক্তি। ফলে খামোকা সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গে একটা বিদ্বেষমূলক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এইসব শব্দ শুনে বেশ মজা পায়, কারণ এই শব্দগুলোই তাদের পরিকল্পনাকে, হিন্দুত্বের নাম করে একদম ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছে দেয়। এরপর ব্রাহ্মণ্যবাদী ও তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সংবাদমাধ্যম এই শব্দগুলোকে বেশ ভালোভাবে ছড়াতে থাকে। এই আজগুবি শব্দগুলোর মধ্যে দিয়েই সাধারণ আরও হিন্দুদের এক সারিতে আনার চেষ্টা চলে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ, বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম নেতারা, সাধারণ হিন্দুদের থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তৈরি ফাঁদে তাদেরকে পড়তে হয়। এতে তাদের কাজটাই আরও সহজ হয়। ফলে হিন্দু শব্দটি বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী শব্দটি আরও বেশি ঠিকঠাক।

সরকার ও পুলিশের তাঁবেদারি মনোভাব দেখে তাদের সমালোচনা করে লাভ নেই, কারণ তারাও একই পরিস্থিতির শিকার

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জঙ্গি হানা বা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায়, ধর্মনিরপেক্ষ ও মুসলিম নেতারা সরকার ও পুলিশকে দোষারোপ করতে শুরু করে দেন। তাদের তাঁবেদার সুলভ আচরণ নিয়ে কথা ওঠে। কিন্তু তারা এটা বোঝেন না সরকার ও পুলিশও এই একই খপ্পরে পড়ে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুসলিম বিরোধী প্রচারে সাধারণ মানুষের মতো তারাও বলির পাঁঠা। প্রতিটি সাম্প্রদায়িক ঘটনার পর, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খপ্পরে থাকা স্থানীয় সংবাদমাধ্যম পুলিশকে এই ঘটনা নিয়ে চাপ দিতে শুরু করে দেয়। তাদের প্রশ্ন পাল্টা প্রশ্ন করে, পরোক্ষ ভাবে কী করা দরকার তা নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হতে থাকে। যদি পুলিশ তাদের পক্ষে ভালো ভালো খবর চায়, তাহলে তাদের কোনো মামলায় পদক্ষেপ করা না করা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে থাকতে হবে। সিনিয়র ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংবাদিকরা একই কাজ সরকারকে চাপ দেওয়ার জন্য করে থাকে রাজ্যস্তরে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আইবি জোর জবরদস্তি নাক গলাতে শুরু করে দেয়। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই যা করার করছে, এমন একটা হাবভাব দেখিয়ে তারা তদন্তের মোড়টাকেই ঘুরিয়ে দেয়। তদন্তকারী সংস্থার উপর অসঙ্গত ও অন্যায় হস্তক্ষেপ ফলায়। ফলে রাজ্য সরকার বা পুলিশ সংবাদমাধ্যমে তাদের সুনাম করার জন্য স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের কাছে মাথা নীচু করে ফেলে। আইবি তখন মাঠে নামে, ব্যবস্থা নেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই ব্যবস্থা চূড়ান্ত অবিচারের নিদর্শন, বৈষম্যমূলক। অন্য দল ক্ষমতায় আসুক বা না আসুক, সরকার বা

পুলিশের প্রতিক্রিয়া আইবি-র কথা মাথায় রেখেই। কেউ যদি কোনো ক্ষমতার শীর্ষে থাকেন, এমনকি তিনি যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হন তাতেও, ফল একই হবে। সাম্প্রদায়িক ইস্যুতে অন্তত সরকার বা পুলিশের ওপর দোষ চাপিয়ে কোনো লাভ নেই। আসল সমাধান হলো প্রথমে গোয়েন্দা দফতর ও সংবাদমাধ্যমকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এর থেকে মুক্ত করতে হবে। গত কয়েক দশক ধরে ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে যে একটা মুসলিম বিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তা পাল্টাতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ, হিন্দু সংস্কারমূলক আন্দোলনকারী এবং মুসলিম নেতা সহ সরকারকেও বিশেষ করে উদ্যোগী হতে হবে।

মুসলিমদের মৌলবাদী মানসিকতা ছাড়তে হবে, হীনমন্যতা বন্ধ করতে হবে

মৌলবাদ: দেশের মুসলিম সমাজ দুটো সমস্যায় জর্জরিত—মৌলবাদ ও হীনম্মন্যতা। মুসলিম, এমনকি শিক্ষিত মুসলিমরাও আধুনিকতার মোড়কে ধর্মগ্রন্থকে বুঝতে রাজি নয়। এটা যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক। ধর্মের যে ভালো, তার থেকেও কাগুজে জিনিসপত্রের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেশি ফলে নতুন ভাবনা চিন্তাকে সাদরে গ্রহণ করাটা তাদের আর হয় না। কিছু কিছু ইমাম তো আবার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষারও বিরুদ্ধে গেছেন। পাছে নতুন কিছু আবিষ্কার করার মধ্যে দিয়ে সর্বশক্তিমানের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা না বাড়ে। কিন্ত এই তর্ক খুব একটা ঠিক নয়। কারণ কোনো গবেষণাই আলাদা করে কিছু বানিয়ে ফেলে না। যা ইতিমধ্যেই আছে, তাকেই খুঁজে বের করা হয়। এই সব বিষয় শিক্ষিত মুসলিমরা একটু এগিয়ে এসে বোঝালে ভালো হয়। যদি বাকিরা এই নিয়ে ক্ষেপেও ওঠে, তা সত্ত্বেও এই কাজটা করতেই হবে। কিছু কিছু মৌলবাদী সংগঠন তরুণ যুবকদের ধরে ধরে ধর্ম উপদেশ দিতে থাকে, যে তারা ইসলামে মধ্যযুগীয় কোনো পণ্ডিত মানুষ তাদের সময়ের প্রেক্ষিতে যা যা লিখে গেছেন, তা অন্ধের মতো মানতে শুরু কর, যা বোঝানো হয় তাই বুঝে। যদি তোমাকে শেখানো মতের বিরুদ্ধে তুমি যাও, তাহলে বিচারের দিনে কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে না। ফলে যা হয়, সম্প্রদায়ের বিশাল অংশের মানুষ মৃত্যুর পর জান্নাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। আসলে তারা এ পৃথিবীতেই নিজেদের বানানো নরকে বাস করতে শুরু করে দেয়। যত তাড়াতাড়ি মুসলিম, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিমরা উগ্র ধর্ম আবেগকে দূরে ঠেলতে না পারছে, যতদিন না শাস্ত্রের ঠিকঠাক মানে তারা বুঝতে না পারছে, তা কাগজে কলমে না রেখে ভাবের ঘরে আনতে পারছে, আধুনিক যুগের সঙ্গে না মানাতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত তাদের ভালো হওয়া মুশকিল।

হীনম্মন্যতা: ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তৈরি ঘর ঘন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সবথেকে বেশি ক্ষতি যা হয়েছে, তা হলো হীনম্মন্যতা। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের শুরুতে যে দাঙ্গাগুলো হয়েছিল, তার কারণ সম্পর্কে ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেননি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ আলি জওহর, শওকত আলি, হসরত মোহানি, হাকিম আজমল খানের মতো নামজাদা রাজনৈতিক ও মুসলিম নেতারাও। তারা ভেবেছিলেন কোনো ঐতিহাসিক বা অন্যান্য কোনো কারণে হয়তো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হচ্ছে। এখান থেকেই তাদের মধ্যে মারাত্মক হীনম্মন্যতা তৈরি হয়েছিল, যা পরে গোটা সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ শতকে, বিশেষ করে স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর যখন ঘন ঘন বড়সড় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে শুরু করে দিল, মুসলিমদের মধ্যে, বিশেষ করে তাদের নেতাদের মধ্যে এই হীনম্মন্যতা আরও বাড়তে লাগল। পাছে সাম্প্রদায়িক তকমা লেগে যায়, সেই ভয়ে মুসলিমদের নিয়ে কেউ হইচই করার সাহস দেখাতে পারলেন না। সাচার কমিটি সম্প্রতি দেখাতে পেরেছে, এই ভাবেই সমাজে উচু নীচুর একটা স্তর নতুন করে তৈরি হয়ে গেল। পরিস্থিতি কিন্তু এখনও ততটা পাল্টায়নি। ভারতে কোনো মুসলিম পুরুষ বা মহিলা যতই কোনো উচ্চপদে থাকুক না কেনো, ভেতরে ভেতরে কোথাও গিয়ে তাদের মধ্যে একটা জটিলতা চলে আসে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী এ আর আন্তলের কথা বলা যেতে পারে। মুম্বাই হামলার সময় হেমন্ত কারকারের খুন নিয়ে তিনি একটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং ঠিকঠাক ভাবনা সবার সামনে রেখেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁকেও তার কথা গিলতে বাধ্য করা হয়েছিল।

এটা যদি দেশের একজন সাহসী, নামজাদা ও বুদ্ধিমান মুসলিম নেতার সঙ্গেও হতে পারে, তাহলে সাধারণ মুসলিমদের মানসিকতা ও পরিস্থিতি কী হবে তা ভাবাই যায়। যখন কণা মাত্র প্রমাণ ছাড়াই কোনো বিস্ফোরণকাণ্ডে শয়ে শয়ে মুসলিম যুবককে গ্রেফতার করে বছরের পর বছর জেলে ফেলে রাখা হয়, তখন কোনো নেতা, কোনো সমাজ কর্মী, কোনো প্রতিবেশী, কোনো ধর্মনিরপেক্ষ, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো আইনজীবীও তাদের পাশে দাঁড়াতে চান না। পুলিশ-প্রশাসনও, সরকার বা আদালতের কাছে এসব নিয়ে সুর ছড়াতে চান না। একমাত্র তাদের পরিবার ও আত্মীয়রা দোরে দোরে ঘুরে মরেন, যার শেষে থাকে একমাত্র হতাশা। বাকিরা তাদের পরিবারের থেকে দূরত্ব তৈরি করে ফেলেন, গ্রেফতার হওয়া ছেলেটি নিরাপরাধ জানা সত্ত্বেও, তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবনা কাজ করে। যে তারা নিজেরা যদি তথাকথিত কোনো 'সন্ত্রাসবাদী'-কে নিয়ে হইচই করেন তাদের পুলিশের হাতে হয় হেনস্থা হতে হবে, নয়তো তাদেরও কোনো মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। কারণ যে কোনো বোমা

বিস্ফোরণের মামলায় আইবি আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রশ্রয়ে, পুলিশি সন্ত্রাসের সীমা পরিসীমা থাকে না।

আইবি ও তাদের নির্দেশে স্থানীয় পুলিশ, দেশে সন্ত্রাসী কাজকর্ম ও মুসলিম জঙ্গিগোষ্ঠীদের যোগাযোগ নিয়ে সংবাদপত্র ও টিভিকে যে খবর খাইয়ে জনসমক্ষে আনায়, তার প্রভাব এতটাই মারাত্মক যে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরাও বিশ্বাস করতে শুরু করে দেয় যে তাদেরই একটা অংশ এইসব পাপ কাজে দিগভ্রান্ত হয়ে গেছে। এই ধারণা এবং সকলের একইরকম হীনম্মন্যতার জেরে মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থাগুলোর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে আগে সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করবে, কে আগে ঢাড়া পেটাবে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না।

১. ডিসেম্বর ২০০৭-এ দেশের সমস্ত সুফি সম্প্রদায়ের মানুষ, খাজা গরীব নওয়াজ কাউন্সিল নামে একটি সংগঠনের ছাতার তলায় দিল্লিতে জড়ো হন। সংসদের উদ্দেশ্য তারা শান্তি মিছিল করেন।
২. ওই একই মাসে দারুল উলম দেওবন্দে সারা দেশের কয়েক হাজার উলেমাদের একটি সম্মেলন হয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জারি করা হয় ফতোয়া।
৩. উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। কেরলের একটি সংস্কারপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীও একই পথে হেঁটেছিল।
৪. ২০০৮ ফেব্রুয়ারিতে দারুল উলম দেওবন্দ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে।
৫. ২০০৮ মে মাসে দিল্লির রামলীলা ময়দানে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বিশাল মিছিল হয়।
৬. একই মাসে, মহারাষ্ট্রের পাঁচ থেকে ছয়শো জন ইমাম পুনেতে জড়ো হয়ে, সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানান।
৭. নভেম্বর ২০০৮-এ দুহাজার ইমাদের নিয়ে হায়দরাবাদ থেকে পিস ট্রেন, বা শান্তি ট্রেনের যাত্রা শুরু হয়। হায়দরাবাদে নিজাম কলেজের মাঠে জামিয়াত উলেমা এ হিন্দের সাধারণ সভা থেকে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানানো হয়।

আসলে সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা জানানোর মধ্যে কিন্তু কোনো ভুল নেই। বরং এটা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলো শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদকেই নিন্দা জানচ্ছিল না, তারা প্রস্তাব রাখছিল, বারবার এই নিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল, যে ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোনো জায়গা নেই, সন্ত্রাসবাদকে ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম বলে, একজন নিরাপরাধের হত্যা

মানে পুরো মানবতার হত্যা, ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ মানে জলের মধ্যে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে না চাইতেও বিষয়টা এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেল, যে দেশের মুসলমানদের একটা অংশ এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা থেকে তৈরি হওয়া নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও বিভিন্ন বিস্ফোরণের সঙ্গে মুসলিমদের জড়িত থাকার বিষয়টি নিয়ে খবরের কাগজ আর টিভি দেখে তারা বেশ প্রভাবিতই হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এটা নিয়ে একদম নিশ্চিত ছিল, তেমনটা মোটেই নয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত মালেগাঁও ও নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ডে আসল সত্যিটা বেরিয়ে না এলো, ততদিন পর্যন্ত তারা দ্বিধাগ্রস্তই ছিল।

এখন সন্ত্রাসবাদের আসল কর্তা কে, কেই বা জঙ্গি, তা দেশের কাছে পরিষ্কার। মুসলিমদের হীনম্মন্যতা ঝেড়ে ফেলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার সময় এসেছে। ভবিষ্যতে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই সন্ত্রাসবাদী মামলায় যদি কোনো মুসলিম যুবককে জোর জবরদস্তি গ্রেফতার করা হয়, তারা পুলিশকে প্রশ্ন তুলতেই পারে। আগের বিস্ফোরণ মামলাগুলোতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে, তা সত্ত্বেও অজস্র নিরাপরাধ মুসলিম যুবককে মাসের পর মাস অত্যাচার সইতে হয়েছে, অথচ দিনের শেষে দেখা গেছে তারা এর সঙ্গে জড়িতই নয়। পুলিশের কাছে এই বিষয়গুলো পাল্টা তুলে ধরতে শিখুক মুসলমানরা। নান্দেড় ও মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় উঠে আসা তথ্য-প্রমাণ, ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাসের নতুন মোড় হোক।

ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের থেকে দূরত্ব রাখুন, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মোহ ত্যাগ করুন

যদিও দেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সংখ্যা খুবই কম, অবশ্যই মোট ব্রাহ্মণ জনসংখ্যার ১০ শতাংশও হবে না। কিন্তু এটাও ঠিক, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিকৃত আদর্শ আর সেই আদর্শকে বাস্তবসম্মত করতে তাদের যে অপচেষ্টা, তার প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে কিন্তু হাতে গোনা ব্রাহ্মণরাই এগিয়ে আসেন। তবে এটা নিশ্চয়ই বলছি না, বাকি ৯০ শতাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মানসিকতা নিয়েই চলেন কিংবা তাদের ভাবনাকেই মন থেকে সমর্থন করেন। তাদের জাতটিই সবসময় ভারতে রাজত্ব চালিয়ে যাবে, এই ধরনের মোহ মায়া থেকে তারা নিস্তার চান, অন্তত এই পাল্টে যাওয়া সময়ের প্রেক্ষিতে তো বটেই। কিন্তু উগ্রবাদীদের বিরোধিতা করার মতো সাহস, শক্তি কোনোটাই তাদের নেই। তারা আসলে পাল্টা আঘাতের ভয়টি পান। কারণ অতীতে এরকম বহু উদাহরণ আছে, যেখানে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাদেরকে নির্দয়ভাবে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো হেমন্ত কারকারে। এই ভয়ে

ভয়ে যারা থাকেন, তারাই হলেন ব্রাহ্মণদের প্রায় ৫০ শতাংশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের মধ্যেই ৪০ শতাংশ এমন রয়েছে, যারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাজেকর্মে না থাকলেও, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা ভাবে, ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যা করছে তা তাদের জাতের ভালোর জন্য, উন্নয়নের জন্য, ক্ষমতায়নের জন্য, খ্যাতির জন্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যদি সফল হয়, তারাও লাভবান হবে। নিজেদের সম্প্রদায়ের ভালো বা উন্নতি চাওয়ার এবং তার জন্য কিছু করার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই ঠিক, কিন্তু সেটা অন্য সম্প্রদায়ের মাথায় পা রেখে নিশ্চয়ই নয়। তারাও যদি একই লক্ষ্যের পেছনে ছোটে, সেটাও নিশ্চয়ই তাপরাধ নয়। এই সুযোগ সবারই পাওয়া উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা উল্টোটাই ভাবে! মালেগাঁও এবং নান্দেড় বিস্ফোরণকাণ্ডে তাদের আসল মুখটা বের হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, তাদের আসল লক্ষ্যটা হলো বিস্ফোরণ আর দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে দেশজুড়ে একটা অশান্তি তৈরি করা, হিন্দুরাষ্ট্রের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র তৈরি করা। এবং এটা সাংবিধানিক ভাবে নির্বাচিত একটা সরকারকে ফেলে দিয়ে। এখন বাকি ব্রাহ্মণদের আওয়াজ তোলার সময় এসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খারাপ ভাবনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখাই শুধু নয়, তাদেরকে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার মতো সাহসটিও দেখানোর সময় এসেছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এখন চুপচাপ বসে নিজেদেরকে নিয়ে ভাবা উচিত। আধুনিক যুগে তাদের এই ধ্যানধারণা কি আদৌ চলে? বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দৌলতে যেভাবে যোগাযোগের মাধ্যম গত কয়েক দশকে বেড়ে চলেছে, তাতে গোটা বিশ্বই গ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। দেশের ৭০ শতাংশ বাড়িতে টিভি রয়েছে, ১০ শতাংশ পরিবারে রয়েছে ইন্টারনেট, প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে ইন্টারনেট পরিষেবা। ফলে আগের মতো ভুল খবর আর তথ্য দিয়ে গোটা সমাজকে দিগভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া খুব একটা সহজ, এমনটা মনে করা বোকামো হবে। আরএসএস-এর শাখার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে যদি না তাদের ছোটবেলাটি তৈরি হয়, তাহলে কুড়ি-তিরিশ বছরের ব্রাহ্মণ যুবকরাও আজকাল এই সব জিনিসে আর বিশ্বাস করবেন না। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটা জিনিস বোঝার এটা একদম ঠিকঠাক সময় এসেছে যে, সাধারণ মানুষ তাদের আসল উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলেছে। সাধারণ মানুষকে যেভাবে বোকা বানানো হয়েছে, এবং তার জন্য যেসব চমক আমদানি করা হয়েছে, তা বুঝে ফেলেছে সবাই। ভারতীয় সমাজে অনন্তকাল কর্তৃত্ব ফলানোর বেকার স্বপ্ন আর কেউ দেখেন না। আসল যে ভারতীয় সমাজের ধারা, তাতেই তারা মিশে যেতে চান, তাতেই বাঁচতে চান। এটাই তাদের স্বার্থ, দেশের স্বার্থও এটাই।

৫. শেষের কথা

আমি খুব আশাবাদী একজন মানুষ। আদর্শবাদী হিসেবে, আমি একটু বেশিই আশাবাদী। সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন দেখি আমি। আমি বিশ্বাস করি, একদিন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের ভুল বুঝতে পারবে, বিকৃত জাতি আদর্শ ও মধ্যযুগীয় কাজকর্ম ছাড়তে বাধ্য হবে তারা। তাই যদি হয়, তাহলে সাধারণ হিন্দুরা ধর্মের ক্রীতদাসত্ব ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাবেন। হিন্দু সংস্কারপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং দলিত নেতারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই অপকর্মকে ভুলে যাবেন, ক্ষমা করতে শিখবেন। মুসলিমরা উগ্রপন্থা ছেড়ে বেড়িয়ে আসবেন, সমাজের সব স্তরের মানুষ তাদের হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি পাবেন, মূল ও এক জাতিসত্তায় মিশে যাবেন তারা। একসঙ্গে ভারতকে শক্তিশালী ও উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে কারোর সঙ্গে বৈষম্য করা হবে না। আমি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে ধর্ম শুধুমাত্র বাড়ি ও ধর্মাচারণের জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। ধর্মাচারণ থাকবে কমিউনিটি হলের মধ্যে, বাকি জায়গায় থাকুক পেশাদারিত্ব, দেশের স্বার্থে কাজ করবেন শুধুমাত্র ভারতীয় এবং একজন মানুষ।

৬. হেমন্ত কারকারের অসামান্য অবদান

আমি জানি আমি একটু বেশি আশা করছি। কিন্তু এটাও তো ঠিক, কারণ ছাড়া কেউ স্বপ্ন দেখেন না। আমি অলীক স্বপ্ন মোটেই দেখছি না। আমি আচমকা অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি, কে এই আলোর রেখা আনলেন? ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পর্দা ফাঁস করে, প্যান্ডোরার বাক্স খুলে সেই আলোর রেখা এনেছেন হেমন্ত কারকারে। শতাব্দী প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বও যে শেষ হতে পারে, সেই আশা জাগিয়েছেন কারকারে। তিনি যদি এই সাহসটি না দেখাতে পারতেন, তাহলে এই গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশটি শেষ হয়ে যেত। জঙ্গিরা যেরকম ভেবেছিল, সেভাবে সন্ত্রাসী সংগঠন অভিনব ভারতকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না, ২০১৫ সালের মধ্যেই হিন্দু রাষ্ট্র (পড়ুন ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র) আলাদা সংবিধান আর জাতীয় পতাকা নিয়ে তার অস্তিত্ব জানান দিতেই পারত। দেশ ও দেশের সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য হেমন্ত কারকারের কাছে দেশের মানুষের চিরঋণী থাকা প্রয়োজন। নিদেনপক্ষে ভারতরত্ন দিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো উচিত।

৭. বিড়ালের গলায় ঘন্টা

এই বই লেখার আমার একটা মূল উদ্দেশ্য হলো আগামী প্রজন্ম জানুক, কীভাবে হেমন্ত কারকারের অসামান্য অবদান সমাজকে আলো দেখিয়েছে, তথাকথিত দেশভক্ত আর জাতীয়তাবাদীদের নারকীয় চক্রান্তের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে। কীভাবে একের পর এক ঘটনা দেশকে বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছিল, আমি সেই সব দেখিয়েছি। দেখিয়েছি, সময়মতো হেমন্ত কারকারে কঠিন পদক্ষেপ না নিলে, সে বিপর্যয় ঘটতেই পারত। এই গোটা ঘটনা কে ঘটিয়েছে, কারা চক্রান্ত করেছে, তা আমি স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছি। দেশ ও দেশের সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য, কাউকে তো বিড়ালের গলায় ঘন্টাটি বাঁধতেই হতো। আমি সেটা করেছি। আমি জানি বিড়ালটি বেশ বিপজ্জনক, প্রতিহিংসা নেওয়ার ক্ষেত্রে ওস্তাদ, নির্মম, হৃদয়হীন, বিবেকহীন এবং সর্বশক্তিশালী। আমি জানি এর পরিণতি কী হতে পারে। সেই পরিণতির মুখোমুখি হতে আমি প্রস্তুত।

পরিশিষ্ট 'ক'

মুম্বাই-এর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদগুলোর অংশবিশেষ যা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, পুনে, ১ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. এটা খুবই জরুরি হিসাবে উঠে এসেছে যে ভারতীয় নৌবাহিনী ও সমুদ্রতীর রক্ষীরা, 'র'-এর দেওয়া পরামর্শ উপেক্ষা করেছে। 'র' লশকর-ই-তাইয়েবা'র জিহাদিদের সম্পর্কে আগেই সাবধান করেছিল।

২. ১লা নভেম্বর লস্করের পরিচালিত একটা জাহাজ করাচি থেকে রওনা দিয়ে ভারতীয় জলসীমানার মধ্যে বিপজ্জনক ভাবে ঘোরাফেরা করছে সেটাও জানানো হয়েছিল।

৩. নৌবাহিনী খুবই অসন্তোষের সঙ্গে জানিয়েছে যে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ "তাদের এ ধরনের কোনো পরামর্শ দেয়নি"।

৪. 'র' এরপর চুপ করে থাকে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পুনে, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৪

ভারতের নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল সুরেশ মেহতা বলেন যে, সন্ত্রাসবাদীরা সমুদ্র পথ ব্যবহার করে এবং এটা একটা পদ্ধতিগত ভুল। নৌবাহিনীর কাছে কোনো কার্যকরী তথ্য ছিল না। ভারত জঙ্গিদের দ্বারা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে এটা কোনো কার্যকরী তথ্য নয়।

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, পুনে, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. মুম্বাই পুলিশের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা ২০০৭ সালের মার্চ মাসের আগেই স্বীকার করে নেয় যে, ইনটেলিজেন্স ব্যুরো আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় ঢেলে সাজানো হয়, যেটা সমুদ্রের দিক দিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তথ্যে বলা হয়েছিল যে, কাশ্মীর-ফিদাইনদের একটি দল সমুদ্র পথে মুম্বাই পৌঁছে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে।

২. পাশাপাশি মার্চ ২০০৭ থেকে ২২ নভেম্বর ২০০৮, পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচটি সতর্কবাণী মুম্বাই পুলিশ ও মহারাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো হয় যাতে বলা হয় যে, তাজ হোটেলের মতো বিশিষ্ট হোটেল আক্রান্ত হবে এবং তা ক্রমাগত বাড়ছে।

৩. কবে আক্রান্ত হতে পারে সে সম্পর্কে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, তবে বিষয়টি যে ঘটতে পারে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়।

৪. এমন কি আমেরিকার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সতর্কবার্তা পাঠান যে সমুদ্রের দিক দিয়ে হোটেল এবং অন্যান্য মুম্বাই-এর বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলো আক্রান্ত হতে পারে।

৫. এই সমস্ত সংবাদ ও তথ্য পাওয়ার পর পুলিশ এই সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দেয়, হোটেল মালিকদের সঙ্গে এবং মৎস্যজীবী সংগঠনের সঙ্গে অনেকগুলো মিটিং করে। পোর্ট ট্রাষ্ট, নৌ সেনা ও সমুদ্রসীমা বাহিনীর সঙ্গে মিটিং হয়। একটা নৌকা ভাড়া করা হয় যেখান থেকে হোটেল তাজ ও ওবেরয় এর মধ্যে নজারদারি করা হবে।

৬. নভেম্বরের মাঝামাঝি সংবাদ পাওয়া যায় যে একটা জলযান বিপজ্জনক জিনিসপত্র নিয়ে করাচি থেকে রওনা হয়েছে। যাই হোক এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, নজরদারিতে বেশ ঢিলেমি আসে।

সকাল, পুনে, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. আমেরিকার গোয়েন্দা দপ্তরগুলো সেপ্টেম্বর মাসে অন্তত দুবার তাজ হোটেল ও অন্যান্য সংস্থায় হামলার ব্যাপারে ভারতকে সর্তক করে।

২. আক্রমণের পর আমেরিকার সংস্থাগুলো সন্ত্রাসবাদীদের ফোনে ফাঁদ পাতে। কিছু কথাবার্তা পাওয়া যায় যা আগে থেকেই জানা গিয়েছিল এবং সিমকার্ড কেনা হয়েছিল কলকাতা থেকে এবং একটা কেনা হয় আমেরিকায়। আমেরিকার সংস্থাটি সমস্ত কথাবার্তা পুরো রেকর্ড করে ওই সেই বিশেষ সিম কার্ড থেকে।

৩. 'র' এবং নিরাপত্তা সংস্থাকে ১২ ও ১৮ নভেম্বর যে সমস্ত তথ্য দেওয়া হয় সেগুলোকে অ্যাডমিরাল সুরেশ মেহতা বলেন এসব তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না।

৪. কুবের নামের যে নৌকাটি, যা ছিল অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ, সেটাকে ছেড়ে দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে নৌকাটিকে থামানো হয় এবং তার কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুস্তান টাইমস্, মুম্বাই, ১১ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে যে, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ব্যাপারে সমস্ত সতর্কবার্তা নৌ-বাহিনী বা সমুদ্র তীরবর্তী বাহিনী উপেক্ষা

করেছে। পাকিস্তানি জাহাজ আল হুসেনি, যখন লশকর জঙ্গিদের বহন করছে তখন বিমান বাহিনী গুজরাট রক্ষার জন্য আকাশে মহড়া দিচ্ছে।

২. সমুদ্রতীর বাহিনীর জাখাউ (ভূজ) স্টেশনে একটি বার্তা পৌঁছায়, তার ২৫ মিনিটের মধ্যে নীলকান্ত এম, এঙ্গলে সেটা ফ্যাক্স করে বি এস এফের ভূজ কম্যান্ডান্ট এবং কম্যান্ডার, কোস্ট গার্ড, গুজরাট, দমন, দিউ এবং পোরবন্দর-এর কাছে পাঠান। তিনি একটা হোভার ক্রাফট এইচ-১৮৫ এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে বলেন। এটি হামলার মাত্র ৬ দিনের আগের ঘটনা।

৩. 'র' থেকে সমুদ্র সীমান্ত বাহিনীকে জাখাউ স্টেশনে অনুরোধ করে একটা জাহাজ নিরাপত্তার জন্য পাঠাতে, ডরনিয়ার বিমান পাঠিয়ে পুরো বিষয়টিকে মোকাবিলা করার কথা বলা হয়েছে।

৪. জানা যায় যে, সমুদ্রতীর বাহিনী লশকর অধ্যুষিত জাহাজটিকে নজরদারিতে রাখার জন্য পাঠানো হয় সেটা সন্ধ্যা ৬ টায় কান্দলা বন্দরে পৌঁছায় ২১ নভেম্বর। আর একটা জাহাজ সেখানেই রাত্রে নজরদারি করার জন্য ছিল।

৫. সন্ত্রাসবাদীরা একটা জলযানে করে মুম্বাই পৌঁছে যায় সমস্ত বাহিনী প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও—এটাই বাস্তব।

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মুম্বাই, ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান থেকে এটা প্রমাণিত যে সমুদ্রতীর বাহিনীর প্রচুর দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাদের নির্দোষ বলে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বাহিনীরও অনেক দুর্বলতা ছিল-যাদের প্রাপ্ত সংবাদ যথেষ্ট ছিল না।

২. বিভিন্ন তথ্য নিম্নোক্ত দুর্বলতাগুলো প্রমাণ করছে।

- লশকরদের জলযান যখন মুম্বাই-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন নৌ বাহিনীর বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ ও বোঝাপড়ার অভাব ছিল।
- দুর্বলতা বোঝা যায় যখন কোনো উপকূলের পশ্চিম বাহিনীর কাছে অনুরোধ পাঠায়—মহারাষ্ট্রের মুখ্যসচিবকেও ২৬-২৭ নভেম্বর এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়।
- সমুদ্রতীর বাহিনী একটা জাহাজ, একটা হোভারক্রাফ্ট ও একটা ড্রনিয়ার লশকরদের জলজাহাজ খোঁজার কাজে যুক্ত করা হয়!

- প্রাথমিক সতর্কতা পাওয়ার পর ২০ নভেম্বর সমুদ্র তীরবর্তী বাহিনী তৎপরতা দেখালেও বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা গড়ে তুলতে অকৃতকার্য হয়।
- গোয়েন্দাসূত্র থেকে জানা যায়, লশকরদের ৩০-৪০টি জলজাহাজ করাচির দক্ষিণ ২০-৩০ নটিক্যাল মাইল দূরে রাখা হয়েছিল যা ভারতের সীমানার মধ্যে। করাচির অনুমতি ছাড়া এটা হতে পারে।

হিন্দুস্তান টাইমস, মুম্বাই, ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. মুম্বাই পুলিশের সমুদ্র রক্ষীরা, টহল দেবার সময় বধওয়ার পার্কের কাছে কাফে পারাডে ১০ জন সন্ত্রাসবাদীকে ঘোরাফেরা করতে দেখেও ছেড়ে দেয় ২৬ নভেম্বর।

২. এ্যাডিশনাল কমিশনার অব পুলিশ (দক্ষিণ) ড. ভেঙ্কটেশম পুরো বিষয়টিকে প্রশাসনিক বিষয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি অবশ্য কেন এটা বলেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করেন।

৩. সমুদ্রতীর বাহিনী যখন সমুদ্রতীর পাহারা দেবার জন্য তৈরি কিন্তু শহরের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মুম্বাই, ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৮

১. একটা উচ্চ পর্যায়ের সভা হয়, জাতীয় নিরাপত্তার আধিকারিক ডি জি পি মহারাষ্ট্র, আই বি প্রধান উপস্থিত ছিলেন। সভাটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের ঘরে হয়। সমুদ্র তীরবর্তী বাহিনীর পক্ষ থেকে মুম্বাই পুলিশকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা হলে মুম্বাই পুলিশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে গভীর সমুদ্রে তাদের কিছু করার দরকার নেই।

২. ২০০৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, ইসলামাবাদের ম্যারিয়ট হোটেলে আক্রমণের ৪ দিন পরে আইবি-র পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্রের ডি জি-কে সতর্ক করা হয়। বলা হয় সন্ত্রাসবাদীরা তাজ আক্রমণ করতে পারে। সেই সঙ্গে বল্লভ ভাই প্যাটেল স্টেডিয়াম, জুহু বিমান ক্ষেত্রের নামও বলা হয়।

৩. ২০০৮ সালে ১৮ নভেম্বর আমেরিকা 'র'-কে সাবধান বার্তা পাঠায়, যখন সন্ত্রাসবাদীদের জাহাজ ভারত সীমায় ঢুকতে চাইছে।

৪. আইবি-র যুগ্ম আধিকারিক অলোক-কে ২১ নভেম্বর বার বার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাবধান করা হয় এবং তাদের সংবাদ বিভিন্ন জায়গায়

পাঠানোর কথা বলা হয়। তিনি বলেন যে অবিলম্বে সেটা করা হবে। কিন্তু মোটেই তা করা হয়নি।

হিন্দুস্থান টাইমস্, মুম্বাই, ১০ জানুয়ারী, ২০০৯

১. দিল্লির প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে *তেহেলকা*-কে বলা হয় যে সন্ত্রাসবাদীরা যে টেলিফোনে যে কথা বলেছেন তার খবর আইবি'র আধিকারিকরা ২৬/১১-এর ৫ দিন আগে থাকতে জানতেন। যে ৩৫টি মোবাইল ফোন সন্ত্রাসীরা ব্যবহার করেছে তার মধ্যে ৩২টি কেনা হয়েছে কলকাতায় এবং বাকি ৩টি দিল্লীতে।

২. যে নোটটি পাওয়া যায় তার বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। এই নম্বরগুলো থেকে যে আলোচনা বা কথাবার্তা হয় তা ভালোভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। তা করলে আরও তথ্য পাওয়া যাবে।

৩. এই সংবাদও পাওয়া যায় যে, হামলার ৫দিন আগে আইবি এই সংবাদ পায় যে আজমল কাশভ এবং তার ৯জন সঙ্গী একটা দেশি ডিঙ্গি করে ঘোরাফেরা করছে।

৪. ৪ দিন প্রত্যেকটা নম্বর বেঁচেছিল। কিন্তু নম্বরগুলো পর্যালোচনা করা হয়নি। এটাও জানা যায়নি যে পাকিস্তান থেকে তাদের নম্বরগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

৫. প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেই বলা হয় কাশভ এবং তার সঙ্গী ইসমাইল খান ৫৮ জন ছত্রপতি শিবাজী বাসস্ট্যান্ড যাত্রীকে খুন করে। অন্য দুজন সঙ্গী সহ হেমন্ত কারকারে খুন হওয়ার পর অন্য সন্ত্রাসবাদীরা নরিম্যান হাউস, তাজও ওবেরয় হোটেল আক্রমণ করে। আইবি একগুচ্ছ ফোন নং পায়। তাড়াতাড়ি সেটাতে ফোন করে দেখা যায় সেটা কলকাতার।

৬. এ সব করা হয় মুম্বাই পুলিশকে সতর্ক করার পর।

৭. ভারতীয় সেনারা একটা দুর্ধর্ষ অভিযান করেছিল। লশকর বাহিনী এবং তাদের জাল ছিন্ন করে দেয়। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে লশকরদের সব কুকীর্তিকে অকার্যকরী করে দেয় ও সিম কার্ডগুলোকেও অকার্যকরী করে দেয়।

পরিশিষ্ট 'খ'

২৬ ডিসেম্বর ২০০৮ বেলা ১০.৪৫ মিনিট থেকে ১১.৩০ এরমধ্যে পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ডিসিপি জোনাল-১ এসিপি গিরগাম ডিভিশন এবং অন্যান্যদের মধ্যে টেলিফোন মারফৎ যে কথাবার্তা হয় তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হলো। এই কথাগুলো *এনডিটিভি ইন্ডিয়া, আইটিএন ৭* এবং *আজতক টিভি*-তে ৭ ডিসেম্বর ২০০৮ প্রকাশিত হয়।

(১)

(সন্ত্রাসবাদী হামলার অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা)

(২)

বোমা উদ্ধার ও নিষ্ক্রিয়করণ স্কোয়াড (BDDS), জোন ২: লোকেশন?

(৩)

(অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা)

(৪)

BDDS-এর উপর নিয়ন্ত্রণ	তুমি কি চৌপাথি যাচ্ছ? (মারাঠি ভাষায়)
BDDS নিয়ন্ত্রন	চৌপাথি যাও। সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর পিটার ডি বি মার্গ ডেকেছে।

(৫)

(অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা)

(৬)

কিং (সি পি) থেকে ক্রাইম	
যুগ্ম সি পি (ক্রাইম)	সহকর্মী চৌপাথিতে ধরা পড়ে গেছে। অবিলম্বে হস্তক্ষেপ দরকার।
ক্রাইম থেকে কিং	ঠিক স্যার। দুজন বোধ হয় ধরা পড়ে গেছে। এটাই আমরা বলছি। দলকে বলে দিয়েছি।

আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চ-এ ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।

কিং
রজার। ভিক্টর কোথায় আছে? এটিএস প্রধান (হেমন্ত কারকারে), পূর্ব দিকের অতিরিক্ত সি পি অশোক কামাতে এবং কেন্দ্রীয় ভাগের (সদানন্দ দুবের) অবস্থান কি?

ক্রাইম
কেন্দ্রীয় অঞ্চল (দাত্যে) এখন কামা হাসপাতালে। পূর্বাঞ্চল (আশোক কামাতে) এসবি-১ অফিসে আসছে।

কিং
ভিক্টরের (হেমন্ত কারকারের) খবর কি?

ক্রাইম
সে...হেমন্ত সি এস টি রেলষ্টেশনে ছিল। আমি তার অবস্থান দেখেছি এবং এখনই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলছি।

কিং
কারকারে ও কামাতে আহত অথবা তারা ঠিক আছে? কেন্দ্রীয় অঞ্চল কোনো মেডিকেল সাহায্য পেয়েছে কি? প্রত্যেক আহত ব্যক্তি কি মেডিকেল সাহায্য পেয়েছে?

ক্রাইম
আমি চেষ্টা করছি। কারকারের জায়গায় গোলাগুলির খবর পেয়েছি। সেন্ট্রালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। পেলেই জানাচ্ছি।

কিং
অবিলম্বে উদ্ধারকারী দল পাঠিয়ে তাদের উদ্ধার করুন।

ক্রাইম
পাঠানো হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চের তিনটি শাখা এসব করছে।

(৭)
(কথাবার্তার অন্যান্য দিক)

(৮)

অ্যাবল জিরগাম (এসিপি জিরগাম ডিভিশন) থেকে সাউথ কন্ট্রোল এবং যুক্ত সবাই:

উভয়, মানুষ আহত এবং মৃতকে সাউথ কন্টোল ও অন্যান্যদের নায়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সাউথ কন্ট্রোল
অ্যাবল জিরগাম

(মারাঠীতে) তারা কি সন্ত্রাসবাদী?
তারা আমাদের আদেশ মানছে না। তার সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। একজন আমাদের পুলিশের দিকে গুলি করছে। তারা সন্ত্রাসবাদী।

(৯)
(অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা)

(১০)

ক্রাইম কলিং কিং

ডি বি মার্গ, চৌপাটি, তারা দুজনেই মৃত। ডি সি পি এই রিপোর্ট করেছে। দুজনকেই গুলি করে মারা হয়েছে। একটা স্কোডা গাড়ি করে তারা এসেছিল গুলি করেছি, আমাদের লোকেরা আক্রমণ করেছে। দুজনেই মারা গেছে।

লেখকের কথা

পুলিশ অফিসার হিসাবে কর্মজীবনের শুরু থেকেই আমি বিশেষভাবে নজর দিয়েছি ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও জাতিগত দাঙ্গার পিছনে মূল কারণগুলাকে অনুসন্ধান করতে। মধ্যযুগীয় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকেও নিহিত কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাইনি। তদন্ত করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি হিন্দু-মুসলমানের এই যে দাঙ্গা তা নির্দিষ্ট কোনো ভুল বাঝোবুঝির পরিণতি নয়। আবার হঠাৎ কোনো উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে গেল তাও নয়। এই মানুষ মারার দাঙ্গার পিছনে অন্য শক্তি কাজ করছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি সমাজে সামম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায় হিন্দু সংগঠনের ছদ্মবেশে থাকা কিছু ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনের পরিকল্পিত প্ররোচনা।

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখলাম এর শুরু ১৮৯৩ সালে প্রথম পূর্বপরিকল্পিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা থেকে। আর গোটা বিশ শতক জুড়ে এই সাম্প্রদায়িক হিংসা ও প্ররোচনা ক্রমবর্ধমান। তারই ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়েছে ১৯৯২-এ ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার ঘটনা।
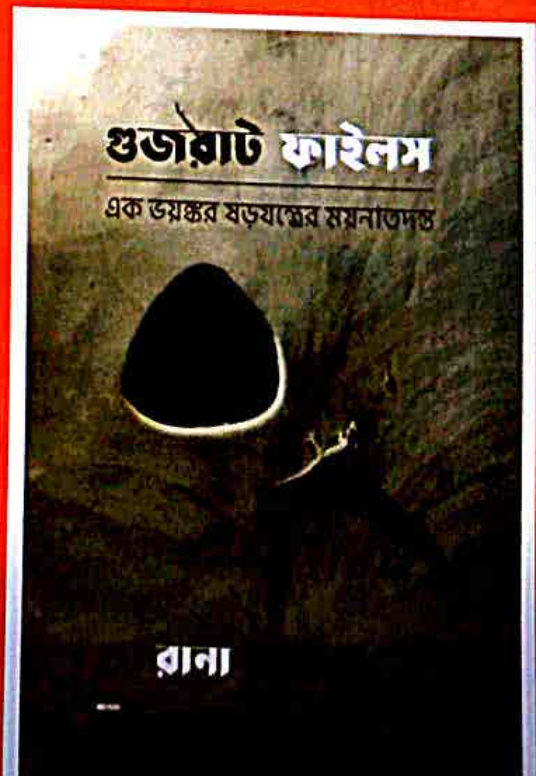
রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র বহির্ভূত কোনো সংস্থা বা ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ ভারতে বহুদিন যাবৎ একটি বহুল চর্চিত বিষয়। উনিশ শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি থেকে হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থান এবং কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষমতা বৃদ্ধির পর থেকে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় এদেশে সন্ত্রাসবাদে মদত দিচ্ছে বলে মিথ্যা দোষারোপ করা হচ্ছে। একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে এরকম একটি মিথ্যা ও কাল্পনিক চিন্তাভাবনা মাটোমুটিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এস. এম. মুশরিফ একজন বিশিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা যিনি বিখ্যাত করিম তেলগি কেলেঙ্কারি উন্মোচন করেছিলেন। 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' আসলে কী এবং তার পিছনে কারা আছে সেটা তিনি তথ্য প্রমাণসহ এই বইতে সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে মুম্বাই পুলিশের এটিএস প্রধান শহীদ হেমন্ত কারকারের নাম। যিনি মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী হামলার সময় নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে কারা ছিলেন সেটাও দেখানো হয়েছে।

বইটিতে প্রমাণ করা হয়েছে সন্ত্রাসী হামলা হওয়া মাত্র প্রশাসন ও মিডিয়া সেটাকে 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে রূপায়ন করলেও অধিকাংশ হামলার পিছনে দায়ী আরেকটি গোষ্ঠী। এ বইটি সেই গোষ্ঠীর সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবে এবং 'ইসলামি সন্ত্রাসবাদ' জুজুর ব্যবচ্ছেদ করবে।

BDT ৳ 500
USD $ 29

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-94393-6-3